অলাতচক্র
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বই পরিচিতি

অলাতচক্র

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

Contributor

Ahmed Nazir

Project Rupkotha

Table of Contents

সিমডেগা একটি প্রায় ঘুমন্ত নির্জন শহর

সকালের আলো হঠাৎ যেন নিভে এল

প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ

আবার ফিরে আসি গল্পে

মেঘে ঢাকা বিষণ্ণ আলোর মেদুর সকালে

শুকনো পাতার ওপর মচমচ শব্দ

কাগজখানা যুগান্তর

সকাল হল বটে

পাখির ডাক ভেসে এল

সেই আশ্চর্য পাখি

সমাপ্ত

Recommended eBook Reader

Android

- Lithum Epub Reader

Windows

- Microsoft EDGE Browser

Apple

- iBooks

Windows Phone

- Tucan Reader

বিস্তারিত

অ্যান্ড্রয়েডের জন্য :

Android ব্যবহারকারীদের জন্য অনেকগুলো অ্যাপস আছে Playstore-এ (play.google.com)। যেমন : eReader Prestigio, Universal Book Reader, AlReader, Moon+ Reader Pro, FBReader, Lithium: EPUB Reader ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি ডাউনলোড করে নিয়ে খুব সহজে ইপাব বই পড়া যায়। তবে আমাদের পরামর্শ হলো, আপনি যদি ইপাব বইয়ে কাগজের বইয়ের আবহ পেতে চান তাহলে Lithium: EPUB Reader ব্যবহার করুন। এটি খুব হালকা ও চমৎকার ফিচার সমৃদ্ধ।

Windows Phone এর জন্য :

আপনারা যারা Windows Phone ব্যবহার করছেন তারা অ্যাপস স্টোর থেকে Tucan Reader লিখে সার্চ দিন।

কম্পিউটারের জন্য :

কম্পিউটারে Microsoft EDGE Browser ই যথেষ্ট। অতিরিক্ত কোন Software Install করার প্রয়োজন নাই ।

Sumatra PDFও একটি পিডিএফ রিডার। এটা পিডিএফ রিডার হলেও এর সাহায্যে ePUB এবং Mobi ফাইল পড়া যায়।।

এছাড়া আপনি FBReader ব্যবহার করতে পারেন। এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে আপনি ePUB ও Mobi ফাইল কম্পিউটারে পড়তে পারবেন।

উপরের সফটওয়্যার দুটো ছাড়াও Adobe Digital Editions ব্যবহার করে ইপাব পড়া যায়। তবে এক্ষেত্রে বাংলা ইপাবে বাংলা ফন্ট Embed করা থাকতে হবে। নইলে লেখা পড়া যাবে না।

Amazon Kindle Tab এর জন্য :

বর্তমানে কিন্ডেল ফায়ার Android OS এর Customized ভার্সন। ফলে এটিতে যেমন Android APK ব্যবহার করা যায়, তেমনি Amazon Store থেকেও অ্যাপস ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। আপনি যদি কিন্ডেলে Android Apps ব্যবহার করতে চান তবে উপরে Android

Apps তালিকা থেকে যেকোনো একটি অ্যাপের অফলাইন APK ডাউনলোড করে নিন। আর যদি Amazon থেকে ডাউনলোড করতে চান, তবে eLibrary Manager Basic এই অ্যাপটি ব্যবহার করুন।

আর আপনি যদি Kindle এর অন্যান্য ভার্সন ব্যবহার করে থাকেন তবে লাইব্রেরি থেকে বই ডাউনলোডের সময় Mobi ফাইলটি ডাউনলোড করুন। Mobi ফাইল Kindle Paperwhite কিংবা এই ধরনের অন্যান্য ডিভাইসে কোনো রকম সফটওয়্যার ছাড়াই পড়তে পারবেন। এছাড়া বই পড়ার অন্যান্য ডিভাইস যেমন : Kobo, Sony Reader, PocketBook Reader ইত্যাদি রিডারেও Mobi ফাইল কোনো রকম সফটওয়্যার ছাড়াই পড়া যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে ডিভাইসভেদে ফন্ট নাও সাপোর্ট করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে করার কিছু নেই।

Apple ডিভাইসের জন্য :

iPhone কিংবা iPad এ ইপাব বই পড়ার জন্য iBooks অ্যাপ ব্যবহার করুন।

Acknowledgment

About Contributor

Ahmed Nazir

লেখকের আরো বই পেতে

More Books

প্রজেক্ট রুপকথা

একটি মহৎ আন্দোলন যার লক্ষ্য ৫০,০০০ বাংলা বইকে ইবুকে রুপান্তর করা

প্রজেক্ট রুপকথার আরো বই পেতেঃ

About Contributor

Hi,

আমি একটা কম্পিউটার প্রোগাম। শুনতে অবাক লাগছে, তাই না। আমাকে বানিয়েছে Ahmed Nazir . আমার কাজ eBanglaLibrary এর মত ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা ইপাব বই তৈরিতে সাহায্য করা। আমি তো আমার ঠিকভাবেই করছি। তবে আমারো কিছু ভুল হয়। (আমাকে কে বানিয়েছে দেখতে হবে না!!!) Mr. Nazir কে বলেছি,আমার বানানো ইপাবটি যেন একবার দেখে ঠিক করে। খুব অল্প সময়ের কাজ। কিন্তু তার মত অলস আর একটিও দেখি নাই। যদি বইতে কোন ভুল থাকে তাহলে তার দায় মিস্টার নাজিরের।

আমার তো সংশোধনের ক্ষমতা নেই। তাই কোন ভুল পেলে বা পরামর্শ বা কোন অনুরোধ থাকলে দয়া করে Ahmed Nazir এর সাথে যোগাযোগ করুন ।

suggestions are welcome

- Ahmed Nazir
- Email

সতর্কতা

একটি নতুন প্রোগ্রামিং ভাষা (পাইথন) শেখার প্রেক্ষিতে এই প্রোগাম লেখা হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ অবানিজ্যিক এবং শিক্ষনীয় প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য "web scraping" সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা । এখানে আমার কোনো ব্যক্তিগত কিংবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নেই। প্রোগামটি Github এ রাখা আছে। পাইথন জানা যেকেউ এটি ব্যবহার করতে পারবেন। যদি কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান যে কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই প্রোগাম ব্যবহার করে EPUB বই তৈরি থাকেন, তবে পরবর্তীতে কপিরাইট সংক্রান্ত সমস্ত দায়ভার ব্যবহারকারীর।

প্রোগামটি MIT License ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে

ব্যবহারকারি তার ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ দায়ি।

অলাতচক্র

প্রথম

উনিশ শো পনেরো সাল

উনিশ শো পনেরো সাল। ইউরোপে প্রথম মহাসমর সবে শুরু হয়েছে। কিছু বছরের ব্যবধানে যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানবেতিহাসকে আমূল বদলে সম্পূর্ণ নতুন পথে প্রবাহিত করবে, তার আভাসমাত্রও কেউ তখনো জানে না। যুদ্ধ একটা হচ্ছে বটে, যারা নিজের জনপদের বাইরে কর্মসূত্রে যাতায়াত করে, তারা খবরটা জানে। কিন্তু সে যুদ্ধ হচ্ছে অন্য মহাদেশে, ভারতে তার বিশেষ কোনো ঢেউ এসে লাগেনি। লোকপরম্পরায় শ্রুত কিংবদন্তীর মত তা সামান্য ঔৎসুক্য জাগায় মাত্র, মানুষকে সন্ত্রস্ত বা উদ্বিগ্ন করে না। সবুজ গাছপালায় ঢাকা শ্যামস্নিগ্ধ গ্রামবাংলার জীবন চিরাচরিত ধীরলয়ে বয়ে চলেছে। হুগলী জেলার অন্তঃপাতী এমনই

একটি ছোট গ্রামে এই কাহিনীর শুরু।

তারকেশ্বর লাইনের সিঙ্গুর স্টেশনে নেমে আট-দশ মাইল হেঁটে কিম্বা গরুর গাড়িতে গেলে পড়বে রামজয়পুর গ্রাম। গ্রামটি ব্রাহ্মণপ্রধান, কায়স্থ এবং বৈদ্যের বাসও কিছু রয়েছে। গ্রামের প্রত্যন্তসীমায় শ্রমজীবী অন্যজাতির কয়েকটি পরিবার বাস করে। কিন্তু সেই যুগে সমাজে যে জাতপাত-ঘটিত বৈষম্য বিরাজ করত, রামজয়পুরে তার নামগন্ধও ছিল না। ভাগ্যের আশ্চর্য যোগাযোগে এখানে কিছু উদার ও ভদ্র মানুষ একজায়গায় হয়েছিল। তারা হাসিমুখেই বাস করত গ্রামে। প্রতিবেশীর সুখ এবং শান্তি সচরাচর কারো সহ্য হয় না, তাই কাছাকাছি দু-একটি গ্রাম থেকে সমাজপতিদের প্রতিনিধিরা এসে মাঝেমধ্যে বিরোধ তৈরি করার প্রচেষ্টা যে করেনি এমন নয়, কিন্তু রামজয়পুর সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

শ্রাবণ মাসের শেষের দিক। দিন তিনেক হল অবিশ্রাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কখনো সামান্য ধরে আসে, একটু বাদেই আবার ঝমঝমিয়ে নামে। গ্রামের ভেতরে প্রায় সব রাস্তাতেই কমবেশি কাদা। পথে লোক চলাচল নেই। কে আর এমন দুর্যোগে অকারণে ঘর ছেড়ে বেরুবে? চাকরির জন্য

কলকাতায় নিত্যযাত্রার প্রচলন তখনো এমন ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি। হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছিল, তারা সারা সপ্তাহ কলকাতার মেসে থেকে শনিবার বাড়ি আসত, আবার সোমবার সকালে ফিরে যেত। লোকে নিজের ভদ্রাসনেই বাস করত, পারিবারিক জমিজমা আর আমকাঠালের বাগানের উপসত্বে সংসার চলে যেত সচ্ছলভাবেই। চাহিদা কম থাকায় জীবনে সুখ ছিল।

আকাশে মেঘ থাকায় সন্ধে নেমেছে একটু তাড়াতাড়ি। সরসী চাটুজ্জের বৈঠকখানায় সান্ধ্য আড্ডা জমে উঠেছে দারুণ। বেশ বড় বাড়ি, তারপরে দুর্গামণ্ডপ আর নাটমন্দির। নাটমন্দির পার হয়ে দুদিকে দেউড়ির ভেতর দিয়ে বাড়িতে ঢোকার পথ। এরই ডানদিকে বড় বৈঠকখানা। চৌকি বা তক্তাপোশ নয়, মেঝেতে মোটা সতরঞ্চি পাতা, তার ওপর সাদা ফরাস। একসঙ্গে পনেরো-কুড়িজন বসে আড্ডা দিতে পারে। সরসী চাটুজ্জের আড্ডা এ গ্রামে বিখ্যাত। এমন ঢালাও তামাকের ব্যবস্থা আর কারো বাড়ি নেই। তাছাড়া আর মধ্যে অন্তত একবার কাঁসার বাটিতে করে সরষের তেল দিয়ে জবজবে করে মাখা মুড়িহোলাভাজা আসবেই। সরসী চাটুজ্জের উঠোনে বাইশ হাত বেড়ের ধানের গোলা চারটে, ধান ছাড়াও বিভিন্ন রকমের শস্য আর সবজির চাষ আছে বহু বিঘের।

আপ্যায়নের বিষয়ে তার কষ্ট হবার কথা নয়। গ্রামবৃদ্ধেরা রোজ ভিড় করেন তাঁর বাড়িতে।

আজ হচ্ছিল গল্পের রাজা-ভূতের গল্প। বাড়ির ভেতর থেকে চালভাজা-ছোলাভাজা এসে গিয়েছে, হুঁকো ঘুরছে হাতে হাতে। ঘরের কড়িকাঠ থেকে লোহার বাঁকানো হুকে ঝুলছে হিঙ্কসের ডবল পলতের বাতি। সজল বাতাসে সেটা সামান্য দুলছে, ফলে আচ্ছাধারীদের ছায়া দুলছে বৈঠকখানার দেয়ালে। আলোছায়ার মায়ায় জমে উঠেছে অপ্রাকৃত গল্পের আসর।

আদিনাথ চক্রবর্তী বললেন—তোমরা বেশির ভাগই শোনা কথা বলছ, নিজেরা কিছুই দেখোনি। ওসব গল্পের মূল্য কী?

নিবারণ ভাদুড়ি হুঁকোটা রাম গাঙ্গুলির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন-সরসী, এ ভ্যালসা তামাক কোত্থেকে জোগাড় করলে? গলায় একটু সেঁকও লাগে না ছাই! একটু ভদ্র তামাকের ব্যবস্থা করা, নইলে নিজের তামাক ট্যাকে খুঁজে আড্ডায় আসতে হবে। আর হ্যাঁ, আদিনাথ, তুমি তো বড় বড় কথা বলছ। নিজে কী দেখেছ বল, আমরা একটু শুনি। কেবল বাগাড়ম্বর করে তো বাজার গরম হবে না—

সরসী চাটুজ্জে বললেন–সেই ভাল। চক্কোত্তিমশাই এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন, এবার ওঁর গল্পই হোক—

আদিনাথ বললেন—গল্প নয়, সত্য কাহিনী।

–বেশ তো, তাই হোক।

পতিরাম মজুমদার একটু ভালমানুষ ভীতু ধরণের লোক। আড্ডায় অনেকক্ষণ ধরে ভূতের গল্প তার পছন্দ হচ্ছিল না। এবার তিনি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন–আজ এই পর্যন্ত থাকলেই ভাল। দেখছ তো আকাশের গতিক, বেশি জোরে নামলে আর বাড়ি ফেরা মুশকিল হয়ে পড়বে। শুনছ মেঘের ডাক?

সরসী চাটুজ্জে হেসে বললেন—আরে বোসো। আমার চাকর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে এখন–

পতিরাম হতোদম হয়ে বসে পড়লেন।

আদিনাথ বললেন–তামরা তো জানো, শ্বশুরবাড়ির

সম্পত্তি পেয়ে আজ সতেরো বছর হল আমি এই গ্রামে এসে বাস করছি। আমার ছোটবেলা এবং বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকবছর কেটেছে পৈতৃক গ্রাম বাহিরগাছিতে। সেখানে আমাদের তিনমহলা বাড়ি, বাপ-জ্যাঠা পিসি-খুড়ি আর একগাদা ছেলেপুলে নিয়ে সে বাড়ি গমগম করত সর্বদা। নিজেদের মধ্যে ভাব-ভালবাসা ছিল। এখানে বাস করতে আসি ঝগড়া করে নয়, কোনো বিরোধের জন্যও নয়। এসেছিলাম বাবার কথায়। তিনি বলেছিলেন—আদিনাথ, আমার কথা শোনো। তুমি রামজয়পুরে গিয়ে বাস করো, অন্তত কিছুদিনের জন্য। বৌমার বাবা গত হয়েছেন, রয়েছেন কেবল বেয়ানঠাকরুণ। তিনিও শয্যাগতা। তাকে দেখাশুনো করা তোমাদের কর্তব্য। তাছাড়া কিছু মনে কোরো না-যতদূর জানি তাদের সম্পত্তির পরিমাণও কম নয়। বৌমাও তাদের একমাত্র সন্তান, সবকিছু তারই প্রাপ্য। এ সময়ে সেখানে উপস্থিত থেকে নিজেদের জিনিস বুঝে নেওয়া ভাল। আর এই বাড়িতেও তো ক্রমেই স্থানাভাব ঘটছে দেখতেই পাচ্ছ। লোকসংখ্যা বাড়ছে, সে তুলনায় থাকার জায়গা বাড়ছে কই? যদি আলাদাও থাক, তাতে প্রীতির ভাব কমবার কারণ নেই। যাওয়া-আসা বজায় রেখো, সেটাই বড় কথা।

বাবার কথা শুনে এখানে আসি। বছরখানেকের মধ্যে

শাশুড়ি ঠাকরুণ মারা গেলেন। সম্পত্তি দেখাশুনোর ভার আমারই ওপর এসে পড়ল। তবুও বছরে অন্তত একবার, পূজোর সময়ে, বাহিরগাছি যেতাম। কয়েকবছর পরে বাবাও মারা গেলেন। পৈতৃক গ্রামের সঙ্গে সেভাবে আর কোনো যোগসূত্র বজায় রইল না।

যাই হোক, যে সময়ের কথা বলছি তখন আমার বয়েস বারো-তেরো হবে। শীতকাল। দোলাই গায়ে দিয়ে বাইরের দালানে বাবার কাছে বসে পড়াশুনো করছি। বাবা বসে হিসেবের খাতাপত্র দেখছেন। এমন সময়ে একটা ভবঘুরে চেহারার লোক এসে উঠোনে দাঁড়া ল।

আমি তখন নেহাৎই ঘোট, মানবচরিত্র ঠিকঠাক বোঝবার মত বয়েস হয়নি। কিন্তু লোকটাকে দেখে প্রথমেই যে কারণে আমার অবাক লাগল তা হল এই—আমি লোকটার বয়েস আন্দাজ করতে পারলাম না। এ ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নাও। কোনো মানুষকে প্রথম দেখলে এবং তার বয়েস সঠিক না জানলে আমরা ত্রিশ কী পঁয়ত্রিশ, কিম্বা পঞ্চান্ন কী ষাট—এরকম মনে করি। অর্থাৎ কারো বয়েস একদম ঠিক বলতে না পারলেও আন্দাজটা কাছাকাছি থাকে। এই লোকটাকে দেখে মনে হল এর বয়েস ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বা

ষাট কিম্বা সত্তর যা কিছু হতে পারে। পরণে খাটো আধময়লা ধুতি, গায়ে তৎ আধময়লা ফতুয়া, কাধে ভাজ করা রয়েছে একটা খয়েরি রঙের মোটা চাদর। এই ভয়ানক শীতেও লোকটা সে চাদর গায়ে জড়ায়নি। গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় অবিন্যস্ত ঝাকড়া চুল। সবচেয়ে আশ্চর্য হল তার চোখদুটো। সোজাসুজি সামনে তাকিয়ে আছে, অথচ মনে হচ্ছে সে কিছুই দেখছে না। পাগলের মত, কিন্তু পাগল নয়। তার দৃষ্টিতে চিন্তাসঙ্গতির বাঁধুনি আছে।

বাবা মুখ তুলে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন-কী ব্যাপার, কোথা থেকে আসছ? কে তুমি?

খুব মোলায়েম, মৃদু গলায় সে বলল—আমি একজন পথিক। কোথাও থেকে আসছি, আমার বাড়িঘর নেই। আমি আজ এখানে ভাত খাব।

তার কথাগুলো অসংলগ্ন। হঠাৎ এভাবে কেউ কারো বাড়ি ভাত খেতে চায় নাকি? বাবা বললেন তোমার নাম কী? এখন বাড়ি না থাকতে পারে, কিন্তু একসময় তো ছিল, মানুষ আকাশ থেকে পড়ে না। পরিচয়টা দাও।

সে কেমনভাবে যেন হেসে বলল—আমার নাম অমর। বাবা ছিলেন পণ্ডিত মানুষ, নাম ঈশ্বরচন্দ্র সার্বভৌম। আমি আজ আপনার কাছে ভাত খাব।

-বাবা 'ছিলেন' মানে কী? এখন তিনি কোথায়?

অমর ডানহাতের তর্জনী ওপরে তুলে দেখাল।

বাবা লজ্জিত হয়ে বললেন—ও, আচ্ছা, আচ্ছা। মা-ও কি?

–মাও ওইখানে।

—ও। তা, বাড়ি কোথায় ছিল?

অনির্দিষ্ট একটা দিক দেখিয়ে অমর বলল—ওইদিকে।

তারপর একটু থেমে বলল—ভয় নেই, আমি চোর-ডাকাত না।

বাবা লজ্জা পেয়ে বললেন-না, না, আমি তা মনে

করিনি। আসলে তোমার কথাবার্তা একটু অদ্ভুত ধরণের কিনা, তাই আরকি—

উঠোনে নিমগাছতলার ইঁদারা থেকে বালতি করে জল তুলে হাতমুখ ধুয়ে অমর এসে বারান্দায় উঠে বসল। বাবার ভয়ে সেদিকে বেশি তাকাতে পারছি না, কিন্তু কান খাড়া করে রয়েছি। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কি কিছু খাবে? রাত্তিরে কোথায় ছিলে? সকালে উঠেই হাঁটছ বুঝি?

বাবা কেন এ প্রশ্ন করলেন তা আবছা আবছা বুঝতে পারলাম। মাইল চারেক দুরে চাপাগাড়ি ছাড়া কাছাকাছি অন্য কোন গ্রাম নেই। তার পরের গ্রাম ময়নাচাঁদা অনেক দূর, সকালে উঠে সেখান থেকে হেঁটে আসা সম্ভব নয়। লোকটা কী বলে বাবা দেখতে চাইলেন।

অমর সহজভাবেই বলল-না, আমি এখন কিছু খাব না। একেবারে দুপুরে ভাত খাব। আর যদি থাকতে দেন তাহলে আজ রাত্তিরটাও থেকে যেতে পারি। এই ভিটেতে একটু স্বপ্ন দেখতে হবে কিনা-

এবারে আমি বাবার শাসনের কথা ভুলে অমরের দিকে

তাকালাম। চোর-ডাকাত না হতে পারে, কিন্তু পাগল নিশ্চয়। স্বপ্ন দেখতে হবে মানে?

বাবা এবার একটু কড়া গলায় বললেন—পাগলামি কোরো না। আমি যা বলছি তার সোজা উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার নাম তো অমর?

—আজ্ঞে। অমরজীবন।

–বাবার নাম ঈশ্বর?

—সবারই বাবার নাম ঈশ্বর।

—আবার পাগলামি করে! স্বপ্নের ব্যাপার কী বলছিলে? ওর মানে কী?

অমরের কণ্ঠস্বর ভারি মৃদু, মিষ্টি আর ভদ্র। সে বলল- রাগ করবেন না, আমার কথাবার্তা একটু ওই পাগলাটে মতন, কিন্তু আমি লোকটা খারাপ নই। আপনাদের এই বাড়ির দক্ষিণ দিকের ভিত সামান্য নিচু, তা জানেন? সমস্ত বাড়িটা একটু কাত হয়ে আছে। উত্তরে উঠে, দক্ষিণে ঝুঁকে। আপনাদের

বাড়িতে শালিক বসে না, খেয়াল করেছেন কখনন? আপনি তো এ বাড়ির কর্তা, আপনার অনামিকা মধ্যমার চেয়ে বড়। এ বাড়ির প্রত্যেক বড়ছেলের তাই। ঠিক বলছি তো?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই তো তাই। আমার মাঝের আঙুলের চেয়ে পরের আঙুলটা বড়। মেজকাকা আর ছোটকাকার বড়ছেলেরও তাই। এই লোকটার পক্ষে সেকথা এত তাড়াতাড়ি কী করে জানা সম্ভব?

বাবা বললেন—তাতে কী?

অমর বলল—সেজন্য আমি এই বাড়িতে একটা রাত ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে চাই। এটাই আমার কাজ। পথে পথে ঘুরে বেড়াই, মন্দিরের চাতালে, গাছতলায় বা কোনো গেরস্তর বাড়ি আশ্রয় নিই। সব জায়গাতে কিন্তু স্বপ্ন দেখা যায় না। ওর একটা নিয়ম আর লক্ষণ আছে। সে বুঝিয়ে বলা যায় না, কিন্তু আমি ঠিক টের পাই। কাল সকালে আমি আরো অনেক কথা বলতে পারব।

বাবা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন-তুমি তাহলে আজ রাত্তিরে এখানে থাকতে চাইছ?

–বা রে, নইলে স্বপ্ন দেখব কী করে? জেগে কি স্বপ্ন দেখা যায়? বাবা আর কিছু বললেন না, মুখ নামিয়ে আবার হিসেবের খাতায় মন দিলেন। আমিও কাঠাকালি-বিঘাকালি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

অমর দুই হাতে হাঁটু বেড় দিয়ে তার ওপর থুতনি রেখে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে বারান্দা থেকে নেমে নিমগাছের গোড়ায় পড়ে থাকা একটা লম্বা কঞ্চি তুলে সেটা দিয়ে পরো উঠোনটা মেপে ফেলল। তারপর নিজের মনে মনেই বিড়বিড় করতে লাগল আটত্রিশ। আটত্রিশ কেন? বাকি চার কোথায় গেল? বাকি চার? তা কেমন করে হবে?

আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। বাবার মুখ খাতার দিকে নামানো, কিন্তু চোখ দিয়ে তিনি অমরের কাণ্ড দেখছেন। কীসের আটত্রিশ? আরো চার বেশি হলেই বা তাতে কী হত?

উঠোন মাপা হয়ে গেলে কঞ্চিটা অমর আবার যত্ন করে নিমগাছের তলায় রেখে এল। আমরাও (অর্থাৎ আমি এবং খুড়তুতো ভাইয়েরা) পড়ায় মন দিলাম।

দুপুরে খেতে বসে অমরজীবন ভাত খেল খুব কম। পাড়াগায়ে একটা বাচ্চা ছেলেও তার চেয়ে বেশি খেয়ে থাকে। বাবা খেতে খেতে একবার বললেন—আর ভাত নেবে না? মাছের ল্যাজা দেবে একটা?

-নাঃ, বেশি খেলে স্বপ্ন দেখা যায় না। খালি পেটমোটা হয়—

খাওয়া হয়ে গেলে গুরুজনেরা বিশ্রাম করতে গেলেন। অমর উঠোনে নেমে মনোযোগ দিয়ে নিমপাতা কুড়োতে লাগল। তার কাজ করার ভঙ্গিও খুব সুন্দর। একটি একটি করে হলুদ ঝরা পাতা তুলে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে সে হাতের মুঠোয় গুছিয়ে রাখছে। অনেক পাতা জড়ো হয়ে গেলে সে বারান্দায় উঠে এসে সেগুলোকে আলপনার মত করে সাজাতে লাগল। আমরা ছেলেপুলেরা তার কাছে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখছি। একটু একটু করে বারান্দার ওপর নিমপাতা দিয়ে তৈরি সুন্দর একটা আলপনা ফুটে উঠল। সে মাথা একদিকে কাত করে নিজের শিল্পকর্ম দেখতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এটা কী হল? সে আমার দিকে তাকাল, বলল—বল তো এটা কী হল?

-এটা তো আলপনা। কিন্তু এ দিয়ে কী হয়? সরাসরি সে কথার উত্তর না দিয়ে অমর বলল—আচ্ছা, এটা দেখে তোমার মনে কী ভাব জাগছে আমাকে বল

বললাম—ভাল লাগছে। দেখতে সুন্দর বলে আনন্দ হচ্ছে।

-বাঃ, তাহলে তো তুমি আসল জিনিসটাই বুঝে গিয়েছ। এটা দিয়ে কিছু হয় না। ভাল লাগে তাই বানালাম।

আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল লোকটিকে। তার কথার অর্থ সবটা বুঝতে না পারলেও যেহেতু আমাদের পরিবারে কিছু কিছু জ্ঞান এবং সংস্কৃতির চর্চা ছিল, সেহেতু তার বক্তব্যের সৌন্দর্য এবং গভীরতা আমাকে স্পর্শ করল।

মাঝে মাঝে বাতাসে দু-একটা পাতা এদিক-ওদিকে সরে গেলে সে হালকা আঙুলের ছোঁয়ায় সেগুলোকে আবার ঠিক করে সাজিয়ে দিচ্ছিল।

রাত্তিরে সে কিছু খেল না। বাড়ির ভেতরে মা অবাক

হয়ে বললেন—ওমা! সে

আবার কী কথা! অতিথি মানুষ না খেয়ে থাকবে কী রকম?

বাবাও তাকে বললেন-বাপু, পাগলামি করতে হয় তার জন্য অন্য কত জায়গা ছিল, খামোক আমার বাড়িতে এসে বিব্রত করা কেন?

অমরজীবন রাগও করে না, কিছুই না। কেবল মৃদু হাসে আর ঠাণ্ডা গলায় বলেও আমার অভ্যেস আছে। স্বপ্ন দেখার দিন রাত্তিরে মুখ এঁটো করতে নেই।

আমাদের বাড়িতে অতিথিকে যত্ন করা হত আপনলোকের মত। এমনিতেই সেই যুগে মানুষকে সম্মান করা হত, অতিথিকে মনে করা হত নারায়ণ। বাংলায় অন্নের জন্য হাহাকার ছিল না। সবার হাতে নগদ পয়সা না থাকলেও বাড়িতে ধান ছিল। কারো বাড়িতে আশ্রয় চেয়ে কেউ পায়নি এমন শোনা যেত না। সেই স্বাভাবিক সৌজন্যবশত বাবা অমরজীবনকে বৈঠকখানার ভেতরে মশারি টাঙিয়ে বিছানা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে শুলো উঠোনের পাশে বারান্দায়।

আমি রাত্তিরে শুতাম মায়ের কাছে। ভেতরবাড়ির সেই শোবার ঘরের জানালা দিয়ে নাটমন্দিরের ওপাশে বারান্দার দিকটা কিছুটা দেখা যায়। অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে একবার তাকিয়ে দেখি নাটমন্দিরের ওধারটা যেন খুব হালকা নীল একটা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। আমার চোখে তখন গভীর ঘুম লেগে আছে। খাটের ওদিকে ঘুমন্ত মায়ের গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঝিমঝিম করছে দুপুর রাত। সেই আবছা চেতনার মধ্যেও অবাক হলাম কীসের আলো ওখানে? ওদিকে তত বারান্দায় সেই অতিথি লোকটা শুয়ে আছে। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন আবায় ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা।

সকালবেলা নাটমন্দিরে আসর বসল স্বল্পকাহিনী শোনার। মোটা মোটা থামের আড়ালে মা-কাকিমারাও এসে দাঁড়িয়েছেন। পুরুষেরা বসেছেন ঠাকুরদালানের মেঝেতে। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন—স্বপ্ন দেখেছ তাহলে কাল রাত্তিরে?

অমর বলল–আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি জানতাম দেখতে পাব।

কী দেখলে?

অমর বলতে শুরু করল। তার বাচনভঙ্গিও পরিশীলিত এবং মার্জিত। আমরা অবাক হয়ে তার কথা শুনে যেতে লাগলাম।

দ্বিতীয়

বাবার দিকে তাকিয়ে

বাবার দিকে তাকিয়ে সে বলল—কর্তামশাই, প্রথমে একটা ভাল খবর বলি। আপনার এক ভাই ছোটবেলাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কেমন কিনা?

আশ্চর্য হয়ে বাবা বললেন—হ্যাঁ, আমার সবচেয়ে ছোট ভাই। চোদ্দ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তুমি কীভাবে

—স্বপ্নে দেখেছি। শুনুন, আপনার সে ভাই জীবিত আছেন।

–সেকি! কোথায় সে? বেঁচে থাকলে বাড়ি ফিরে আসছে না কেন?

–উনি এখন সন্ন্যাসী। উত্তর ভারতে কোথাও আছেন, জায়গাটা ভাল ধরতে পারলাম না। তবে উনি যে আর গৃহাশ্রমে ফিরবেন না সেটা বুঝতে পারলাম। কেদারনাথ। নাম ছিল, না?

বাবা ক্রমেই আরো অবাক হয়ে যাচ্ছেন। বললেন—ঠিক।

বাড়ির মেয়েরা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ঠাকুমা এতক্ষণ বাড়ির ভেতরে ছিলেন, তখন তিনি বেশ বৃদ্ধা, তাকেও নিয়ে আসার জন্য একজন কাকিমা চলে গেলেন। আমি অমরের দিকে তাকিয়ে আছি। সত্যিই তো, আমরা যাকে ছোটকাকা বলি, তিনি আসলে বাড়ির ছোটছেলে নন। আমাদের ছোটকাকা কৈশোরেই উদাস প্রকৃতির ছিলেন, পনেরো বছর বয়েস পূর্ণ হতে যখন আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, তখন একবস্ত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তাকে আমরা কখনো দেখিনি, সে সময় বাবা বা অন্য কাকাদের বিয়ে হয়নি। আসলে আমরা সেজকাকাকে বর্তমানে ছোটকাকা বলে

ডেকে থাকি। ছোটকাকার গৃহত্যাগের গল্প আমরা শৈশব থেকে শুনে আসছি। সে সময় গ্রামে সারারাতব্যাপী যাত্রার আসর বসত। ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে গাঁয়ে নিমাইসন্ন্যাস পালার আয়োজন করা হয়েছে, নবদ্বীপ থেকে খাস নারায়ণ অধিকারীর দল আসবে। লোকের মধ্যে সাজো সাজো রব। শুনেছি এই দলের যে নিমাই সাজত, তার অভিনয় দেখে দর্শকরা উম্মত্তের মত হরিধ্বনি দিয়ে দুহাত তুলে নাচতে শুরু করত। কিছুক্ষণের জন্য যাত্রার আসর সত্যি সত্যিই সংকীর্তনের আসর হয়ে উঠত। ওই অভিনয় দেখে ছোটকাকা পরের দিন সকালে আর বাড়ি ফিরলেন না। কোথায় যে গেলেন কে জানে। সে যুগে যতটা সম্ভব খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল, কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারপর যেমন হয়, যন্ত্রণার ওপর একটু একটু করে সময়ের পলি জমে কষ্টটা কমে এল। কেবল ঘটনাটা একটা পারিবারিক পুরনো গল্প হয়ে রইল।

–রাম! রাম কই? অ রাম!

ঠাকুমাকে ধরে আনছেন মেজকাকিমা। বাবার নাম রামনাথ, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন কী মা? এই যে, আমি এখানে—তিনি এগিয়ে গিয়ে ঠাকুমার হাত ধরে দাঁড়ালেন।

—মেজবৌমা কী বলছে রাম? ছছাটুকুর খবর নাকি পাওয়া গিয়েছে?

বৃদ্ধার চোখে আগ্রহের ঔজ্জ্বল্য। বাবা একটু আমতা আমতা করে বললেন—এই যে এই লোকটি—ওর নাম অমরজীবন, ও কাল থেকে আমাদের বাড়ি অতিথি—ও নাকি স্বপ্ন দেখেছে ছোটুকু বেঁচে আছে, ভাল আছে। তুমি দাঁড়িয়ে কাপছ কেন? বোসো এইখানে

ঠাকুমা বাবার কথায় হৃক্ষেপ না করে অমরের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি কে বাবা?

ঠাকুমাকে দেখে অমর দাঁড়িয়ে উঠেছিল, এবার এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল—মা, আমার নাম অমর। আমিও আপনার এক ছেলে-

গতকাল অমর কিন্তু বাবাকে প্রণাম করেনি, সাধারণ ভদ্রতা এবং বিনয় বজায় রেখে কথা বলেছিল বটে, কিন্তু ভক্তিতে গলে পড়ে আদিখ্যেতা করেনি। অথচ বাবা খুব রাশভারী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। লোকে তার চোখের

দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পেত না। ঠাকুমাকে দেখে অমর প্রথমে উঠে দাঁড়াল, তারপর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। কেন যেন তার এই আচরণ আমার খুব সুন্দর বলে মনে হল।

ঠাকুমা বললেন—তুমি জানতে পেরেছ ছোট্কু বেঁচে আছে? ভাল আছে?

—হ্যাঁ মা।

–কী করে জানলে? একটু চুপ করে থেকে অমর বলল– মা, আমি ঠক-জোচ্চোর কিম্বা ধর্মের ব্যবসাদার হলে বলতাম —বিশেষ ক্ষমতায় ডাকিনী যোগিনীকে বশ করে, বা নানারকম কঠিন প্রক্রিয়া করে জেনেছি। এবার এত টাকা দিন, তাহলে যাগ-যজ্ঞ করে সে ছেলে ফিরিয়ে আনব। কিন্তু আপনাকে বাজে কথা বলব না মা, ওসব কিছুই আমি জানি না। আমার একটা জন্মগত ক্ষমতা আছে, আমি স্বপ্নে অনেক কিছু দেখতে পাই। কাল রাত্তিরে এ বাড়িতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে জানলাম আপনার ছোটছেলের কথা

ঠাকুমা বললেন—সে ফিরবে না বাবা?

–না মা। আর কেনই বা ফেরাবেন? তিনি ভাল আছেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করে ঈশ্বরের আরাধনা করছেন। জানেন মা, হিন্দুধর্মে বলে কোনো বংশের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে সেই বংশ পবিত্র হয়ে যায়। আনন্দ করুন মা, ছেলের গৌরবে আনন্দ করুন।

ঠাকুমা অমরের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—বাবা, যদি আমার ছোটুকু ভাল থাকে, শান্তি পেয়ে থাকে, তাহলে সে না-ই বা ফিরল। তার সুখেই আমার সুখ। তুমি এটুকু খবর যে দিলে, তার জন্য ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তুমি আমাকে মা বলে ডাকলে, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি—

এইসময় অমর হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। সে বলল—মা, আপনি দেখবেন আপনার ছেলেকে? আমি দেখাতে পারি। কিন্তু কথা দিন, তাকে ফিরে আসবার জন্য আদেশ করবেন না। তাহলে হয়ত সে ফিরে আসবে, তার এতদিনের সাধনা নষ্ট হয়ে যাবে। জগতে মাতৃশক্তি একটা বিরাট শক্তি, কেউ তাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। কথা দিন—

বাবা এগিয়ে এসে অমরকে বললেন-দেখ ভাই, এটা

একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মাকে সরল মানুষ পেয়ে তুমি–

ঠাকুমা বাধা দিয়ে বললেন—তুই থাম। তারপর অমরের দিকে তাকিয়ে। বললেন—আমি কথা দিলাম। আমাকে কী করতে হবে বল–

—কিচ্ছু না। আপনি এইখানে বসুন—

ঠাকুমা তখন নিজে মাটিতে বসতে বা উঠতে পারতেন না। মা আর মেজকাকিমা তাকে ধরে আস্তে করে ঠাকুরদালানের মেঝেতে বসিয়ে দিলেন। সামনে বসল অমর। ঠাকুমার হাত আলতো করে ছুঁয়ে বলল—আমার দিকে তাকান। মন শান্ত করুন, মা। একদম হালকা করে দিন। সোজা আমার চোখের দিকে দেখুন, একদম সোজা

কী বলব ভায়া, তখন ভর সকাল, আমরা অতগুলো লোক দাঁড়িয়ে, আমাদের সামনেই ঠাকুমা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাথা হেলে পড়ল না, শরীর কাত হল না, কেবল চোখ দুখানা আস্তে আস্তে বুজে এল। সুন্দর, সমাহিত মুখ—যেন ধ্যান করছেন। অমর একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারও দেহ নিস্পন্দ, সমস্ত শরীরে দৃঢ় একাগ্রতার

ভঙ্গি।

কত বছর আগের কথা, তবু এখনো সে দৃশ্য স্পষ্ট মনে আছে। সেই আমাদের চকমিলাননা ঠাকুরদালান, বাবা-কাকা, মা-কাকিমারা আর কর্মচারীর দল ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনে শীতসকালের সোনারঙ রোদ্র এসে পড়েছে। সে উঠোনে কীসের যেন দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে গোলা পায়রার দল। অতগুলো লোক দাঁড়িয়ে, কেউ কথা বলছে না।

দেখলাম ঠাকুমার মুখে সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে উঠেছে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে ঠিক অমন করে হাসে। দু-চার মিনিট হাসিটা রইল, তারপর ধীরে মিলিয়ে গেল। ঠাকুমা আবার শান্ত, সমাহিত, বাহ্যিক কোনো আবেগশূন্য।

অমর মৃদুগলায় ডাকল–মা, এবার জাগুন। দেখা হয়েছে তো? এবার তাকান—

আস্তে আস্তে ঠাকুমা চোখ খুললেন। যেন একটু অবাক হয়ে চারদিকে তাকালেন, কোথায় রয়েছে বুঝতে না পারলে মানুষ যেমনভাবে তাকায়। তারপর সামনে অমরকে দেখে তার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অমর বলল—হয়েছে মা?

ঠাকুমা বললেন—হ্যাঁ বাবা, হয়েছে।

বাবা ব্যর্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী দেখলে মা? ছোটুকুকে দেখতে পেলে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ঠাকুমা বললেন—বৌমারা আমাকে ধরে ভোলো, আমি ঘরে যাব। ঘরে দিয়ে এসো–

দু'পা গিয়ে পেছন ফিরে তাকালেন ঠাকুমা। অমরের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন-আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছি তুমি কে। আবার এসো মাঝে মাঝে

অমর বলল–আসব মা, মাঝে মাঝে আসব।

ঠাকুমা চলে গেলে বাবা বললেন—এ কী উৎপাত! কী চাও তুমি? তুমি কে?

অমর এবার মুখ তুলে বেশ ব্যক্তিত্ব মেশানো গলায় বলল—দেখুন, আমি একজন সাধারণ মানুষ। পথেঘাটে ঘুরে বেড়াই। আপনি কী আমাকে অবিশ্বাস করছেন? আমি তো

আপনার কাছে কিছু চাইনি—কেবল এক রাত্তিরের আশ্রয় ছাড়া। তাহলে?

মাকে তুমি কী দেখালে? মাও তোমাকে কী বলে গেলেন বুঝলাম না। এর মানে কী?

-কিছুই না। উনি বুড়ো মানুষ, ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় ওঁর মনে দুঃখ রয়েছে, সে দুঃখ মা ছাড়া কেউ বোjhe না। ওঁকে যদি একটু আনন্দ আর স্বস্তি দিতে পেরে থাকি, তাতে কী ক্ষতি হয়েছে বলুন?

-তা নয়, কিন্তু মাকে কেন হঠাৎ-মানে, বলছি যে—

হঠাৎ নয়। কারণ আছে। বললে যদি রাগ না করেন তাহলে বলতে পারি।

বাবা একটু ইতস্তত করে বললেন-বল। রাগ করার মত কথা নিশ্চয় বলবে না।

–আপনার মা আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

–সে তো জানা কথাই। উনি বুড়ো হয়েছেন, পঁচাশি বছর বয়েস। এটা আর তুমি নতুন কথা কী বললে? যাই হোক, তাতে কী?

অমর বলল—আজ পৌষ মাসের তিন তারিখ। এই ফাল্গুন মাসের পনেরোই শুক্ল ত্রয়োদশীর দিন সকালে উনি চলে যাবেন। ছেলের খবর জানতে পারলেন না এই কষ্ট নিয়ে যেতেন, তাই ওঁকে একটু আনন্দ দিয়ে গেলাম।

বাবা রেগে উঠে বললেন—তুমি তো অদ্ভুত লোক! আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে আমারই মায়ের মৃত্যুর কথা বলছ? জানো, তোমাকে আমি ইচ্ছে করলে অমর হেসে বলল —এই দেখুন, আপনি রাগ করবেন না বলে কথা দিয়েও রাগ করছেন। আপনাদের সবাইকে রেখে ভগবানের নাম করতে করতে মা পুণ্যবতীর মত চলে যাবেন, এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? দেহধারণ করলে একদিন ছেড়ে যেতে হয়। কেউই চিরজীবী না। আর আমার এ কথা যদি না ফলে, তাহলে তো ভালই। প্রাণভরে আমাকে তখন গালাগাল দেবেন।

বাবা বললেন তুমি আমাকে দেখাতে পারো? আমি যদি

ছোটকুকে দেখতে পাই তাহলে বিশ্বাস করি। পারো দেখাতে?

–দেখুন, আপনাকে বিশ্বাস করাবার কোনো দায় আমার নেই। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করলে তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। অকারণে শক্তির অপব্যয় করতে নেই।

–তার মানে তোমার মধ্যে কোথাও ফাঁকি আছে। তুমি চালাকি করছ।

অমর বলল আপনার মা কিন্তু তা মনে করেন না। আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক। আপনার বংশের একটা হারানো জিনিসের সন্ধান আপনাকে দিয়ে যাই। তাহলে হয়ত আমাকে আর পুরোপুরি জোচ্চোর বলে মনে হবে না। কেমন?

বাবা ধরা গলায় বললেন—কী জিনিস?

—তিন-চারপুরুষ আগে আপনাদের বংশে একটা অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্তি ছিল, জানেন কী?

বিস্মিত হয়ে বাবা বললেন—হ্যাঁ, ঠিক কথা। তিন বা চারপুরুষ কেন, আরো বহু-বহু আগে থেকে সে মূর্তি

আমাদের গৃহদেবতা হিসেবে পূজো করা হত। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামার সময় সে মূর্তি আমার পূর্বপুরুষেরা কোথাও লুকিয়ে ফেলেন, অথবা হারিয়ে যায়। আর পাওয়া যায় নি। তুমি তুমি কী বলতে চাও?

—আমি জানতে পেরেছি সে মূর্তি কোথায় আছে। আপনার লোকদের কারুকে বলুন একটা শাবল নিয়ে আমার সঙ্গে আসতে। আপনারাও আসুন।

ঠাকুরদালান থেকে নেমে দেউড়ির ভেতর দিয়ে অমর উঠোনে গিয়ে নামল, তার পেছনে পেছনে বাড়ির সবাই মিছিল করে চললাম। অমর এমনভাবে হাঁটছে যেন সে একেবারে নিশ্চিতভাবে জানে কোথায় যেতে হবে। বাড়ির উত্তর ভিতের কোণায় এসে সে থামল। গদাধর নামে আমাদের একজন কর্মচারীর হাতে ছিল শাবল। অমর তাকে বলল—এইখানে ভিত খোঁড়ো।

গদাধর বাবার দিকে তাকাল। বাবা অমরকে বললেন কতটা খুঁড়তে হবে?

–মাটি নয়, দেয়ালের গা থেকে তিন-চারটে করে ইট

খসাও। এই জায়গায়—

বাবা বললেন—সে কী কথা! ভিতের ইট খসালে বাড়ির ক্ষতি হবে না?

—কিচ্ছু হবে না। কয়েকটা ইট মাত্র। কালই রাজমিস্ত্রি ডেকে গাঁথিয়ে নেবেন।

–কিন্তু এখানটাতেই খুঁড়তে হবে কেন?

—কারণ এ বাড়ি উত্তরে উঁচু, আর এখানেই উত্তর ভিতের শেষ। এখানে শ্রীবিষ্ণু রয়েছেন বলেই এদিকটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে যায়নি। জানেন তো, যে জমির ওপর বাড়ি তৈরি, তার রকম অনুযায়ী পঞ্চাশ, একশো কী দেড়শো বছরে ভিত সামান্য। কিছুটা বসে যায়। আপনাদের বাড়িতেও তাই হয়েছে। কেবল বিষ্ণুর অধিষ্ঠানের জন্য উত্তর দিক সামান্য উঁচু। তাছাড়া বেয়াল্লিশ হাত হল না তো, সদর দরজা থেকে আটত্রিশ হাত মাত্র হল। তাই এখানেই নিশ্চয় থাকবে। নইলে আরো চারহাত ওদিকে হত—

বুঝলাম বাবা আর যথেষ্ট রাগ করতেও পারছেন না।

ক্লান্ত গলায় তিনি বললেন–তুমি কী যে মাঝে মাঝে বল তার কোন মানে হয় না। কীসের চার হাত কম?

-ও একটা হিসেব, আপনাকে বোঝাতে পারব না। নিন, শুরু করতে বলুন—

ভিতে প্রথম শাবলের ঘা পড়তেই আমরা সবাই ঘন হয়ে ভিড় করে গদাধরকে ঘিরে দাঁড়ালাম। গদাধর আলতো করে গাঁথুনির জোর আগা করছে, আর আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করে আছি। তিনসারি ইট খসাতেই ভিতের ভেতরে একটা চতুষ্কোণ গহ্বর বেরিয়ে পড়ল। শাবল রেখে তার মধ্যে হাত গলিয়ে গদাধর বের করে আনল অপূর্ব সুন্দর গঠনের এক দেবমূর্তি। এতদিন অবহেলায় পড়ে থেকেও তার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়নি। প্রায় একহাত লম্বা বিগ্রহ, মাথায় ছত্র, মুখে হাসি। আগেই তো বলেছি, আমি তখন খুব ছোট, শিল্পের রস পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার বয়েস তখনো হয়নি। তবু মূর্তিটা দেখামাত্র মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে।

বাবা গদাধরের হাত থেকে মূর্তিটি নিয়ে দুই হাতে মাথায় ধরে বলতে লাগলেন—জয় শ্রীবিষ্ণু! জয় শ্রীবিষ্ণু! দেবতা ফিরেছেন! কাকারা তার সঙ্গে বলতে লাগলেন—জয়!

জয়! কাকিমারা উলু দিয়ে উঠলেন। বাবা বিষ্ণুমূর্তি মাথায় করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে চললেন। সেটি তখনকার মত ঠাকুরঘরে রাখবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল, মেয়েরাও ভেতরে চলে গেলেন।

অমরের হাত ধরে বাবা বললেন—ভাই, তুমি আমাকে মার্জনা কর। জানি না তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ—জানতেও চাই না। তোমার আশ্চর্য ক্ষমতার কথা আমি স্বীকার করলাম। যদি খারাপ ব্যবহার করে থাকি, তা মনে রেখো না।

সকলের অনুরোধেও অমর সেদিনটা আর থাকতে রাজি হল না। বাবা শেষে বললেন—তাহলে কী এই ধরে নেব যে, তুমি আমাকে মার্জনা করলে না?

—ছিঃ, ও কথা বলবেন না। আমি এইরকমই ভবঘুরে ধরণের, একজায়গায় দুদিন থাকতে ভাল লাগে না। তবে একটা কথা বলে যাই, আপনাদের বংশ খুব পবিত্র এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত বংশ। এক পুরুষ বাদ দিয়ে দিয়ে এই বংশে একজন করে সাধক জন্মগ্রহণ করবেন। আপনার ভাই তো সন্ন্যাসী হয়েই গিয়েছেন, এর পরের পুরুষে নয়, এখন যারা ছোট—এই এরা—এদের কারো সন্তান অলৌকিক ক্ষমতা

নিয়ে জন্মাবে। সংসারে থেকেও সংসারী হবে না। আপনি তার জন্ম বৃদ্ধবয়সে দেখে যেতে পারবেন

বাবা বললেন কী করে বুঝব সে কে?

–তার জন্মের সময়ে আকাশে এক আশ্চর্য নীল উল্কাপাত হবে। নীল রঙের আলোয় ভরে যাবে চারদিক। এখনো অবশ্য তার দেরি আছে। মনে রাখবেন কথাটা। আচ্ছা, চলি তাহলে–

উঠোন পেরিয়ে, সদর দরজা পেরিয়ে অমর চলে গেল। সঙ্গে সে একটা রহস্যের পরিবেশ নিয়ে এসেছিল। সে চলে যাবার পরও সেটা কিন্তু থেকেই গেল।

পনেরোই ফাল্গুন সকাল থেকে বাড়ির সবাই ঠাকুমার দিকে সতর্ক নজর রেখে বসে রইল। অমরের ভবিষ্যৎবাণী তাকে কেউ জানায় নি। তিনি ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে বাগানে ঘুরে ঘুরে ঠাকুরপূজোর জন্য ফুল তুললেন, তারপর পূজোয় বসলেন। পূজো হয়ে গেলে উপুড় হয়ে গৃহদেবতাকে প্রণাম করলেন।

এবং আর উঠলেন না। প্রণামরত অবস্থাতেই তার মৃত্যু

হল।

দাহ সেরে সন্ধেবেলা বাবা-কাকারা বাইরের ঘরে এসে বসেছেন, পাড়ার লোকেরাও একজন দুজন করে আসছেন। এমনসময় মাধব চৌধুরী ঘরে ঢুকে বললেন—আহ্নিক সেরে আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। ওহে রামনাথ, বাইরে কে একজন তোমাকে ডাকছে। আমাকে বললে—গিয়ে বলুন আমি এসেছি। আমার নাম অমর, আসবার কথা ছিল আজ। কে হে লোকটা? এ গ্রামে দেখেছি বলে তো মনে হল না—

বাবা প্রায় লাফিয়ে উঠে বাইরে গেলেন। কেউ নেই। কেউ না। কেবল ঝিমঝিম করছে আসন্ন রাত্রির আবছা অন্ধকার।

তৃতীয়

একটানা এতক্ষণ কথা বলে

একটানা এতক্ষণ কথা বলে আদিনাথ চক্রবর্তী একটু থামলেন। বর্ষণমুখর রাত্রির জলভেজা বাতাস ক্রমাগত দুলিয়ে চলেছে ঝুলন্ত লণ্ঠনটা, সেইসঙ্গে দেয়ালে নড়ছে ঘরে বসে থাকা মানুষদের ছায়া। আড্ডায় মাঝে মাঝে একটা সময় আসে যখন হঠাৎ সবাই একসঙ্গে চুপ হয়ে যায়। জমাট গল্পেরও একটা মহিমা আছে। সে গল্প সত্য, মিথ্যা বা অবিশ্বাস্য যাই হোক না কেন, ভাল করে বলতে পারলে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়। আদিনাথ কথক হিসেবে প্রথম শ্রেণীর, নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়কেও বলার গুণে মনোমুগ্ধকর করে তুলতে পারেন। আজ রাতের পরিবেশ আর তার গল্প এমন খাপ খেয়ে গেল যে, আচ্ছাধারীরা কেউ কোনো তর্ক তুলল না।

কেবল সরসী চাটুজ্জে বললেন-আপনার ঠাকুমার মৃত্যুবিষয়ে ওই ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়াটা অবশ্য আমি খুব আশ্চর্য কিছু বলে মনে করছি না, কারণ এই কথাটা বাড়ির কেউ নিশ্চয় তাঁকে মুখ ফসকে বলে ফেলে থাকবে। ফলে আপনার ঠাকুমা মনের দিক দিয়ে পনেরোই ফাল্গুন তারিখের প্রসঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বয়েস অনেক হয়েছিল, কাজেই ওই বিশেষ তারিখে হয়ত মানসিক উত্তেজনা সামলাতে পারেন নি। তার মনই তাকে নির্দেশ দিয়েছিল দেহরক্ষা করতে। এমন হয়, আমি শুনেছি। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া বিষ্ণুমূর্তি ফিরে পাওয়াটা ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাছাড়া সবকিছুর যে ব্যাখ্যা থাকতেই হবে তার কী মানে আছে। কিছু কিছু আবছা আড়াল থাক না, তাতে জীবন সরস হয়ে ওঠে।

রাম গাঙ্গুলি বললেন—সব জিনিসের ব্যাখ্যা হয় না। আমার আপন ভায়রাভাই। তার মামাবাড়ির গ্রামে নিজের চোখে আঁতুড়ের ছেলেকে হেঁটে বেড়াতে দেখেছে, জানো? সে অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, অকারণে মিথ্যে কথা বলবে না। সদ্যোজাত ছেলে—সবে নাড়ি কাটা হয়েছে—সে হাঁটছে আর খিলখিল করে হাসছে। আচ্ছা। ভায়রাভাইয়ের কথা না হয় বাদই দাও, আমার ছোটবেলায় আমি এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি যা শুনলে তোমরা বিশ্বাসই করবে না।

পতিরাম মজুমদার আদিনাথের কাহিনী শেষ হলে পরিত্রাণের আশা করেছিলেন, এবং সম্প্রতি বাড়ি ফেরবার উদ্যোগ হিসেবে চাদর কাঁধে ফেলে লাঠির খোঁজ করছিলেন। আর একটা অপ্রাকৃত গল্প শুরু হতে চলেছে দেখে তিনি কাতর স্বরে বললেন—আর নয়, আজ আর নয়! এবার সবাই উঠে পড়া যাক, চল। পথ তো কম নয়, আমায় যেতে হবে সেই পশ্চিমপাড়া। তাছাড়া সরসীভায়ারও তো খাওয়াদাওয়া আছে।

সরসী চাটুজ্জে হেসে বললেন—আমার খাওয়ার এখনো ঢের দেরি। শোনাই যাক না গল্পটা। বাকিদের কী মত?

সকলে বললেন-গল্প হোক! গল্প হোক!

‘ওমাঃ!’ বলে হতাশ ভঙ্গিতে পতিরাম দেয়ালে ভর দিয়ে এলিয়ে বসলেন।

রাম গাঙ্গুলি বললেন—আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি। তখন আমার বয়েস আর কত হবে, ধর কুড়ি কী বাইশ। সে বয়েসে আমি যে কী ডানপিটে ছিলাম,

যারা আমাকে এখন দেখছ তারা ধারণাও করতে পারবে না। পেটের গোলমাল আর হাঁটুর বাত আমাকে অকেজো করে দিয়েছে, নইলে আট-দশ বছর আগেও আমি নিমগাছে উঠে দাঁতন পেড়েছি। যাই হোক ঘটনাটা বলি। আমার কৈশোরের বেশ কয়েকবছর আমাকে মামাবাড়িতে কাটাতে হয়েছিল। দাদামশায় ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ, পণ্ডিত মানুষ। মামারাও সবাই লেখাপড়া জানা। আমার বাবা তখন জরিপ বিভাগে কাজের সূত্রে তরাইয়ের জঙ্গলে কর্মরত। বাড়ির কাছে কোনো ভাল স্কুল নেই, বাবা বছরে দু-একবার ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেন। এমন অবস্থায় আমার পড়াশুনো হওয়া কঠিন দেখে মা আমাকে মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দাদুর কাছে আমার লেখাপড়ার শুরু। ইংরিজি জানিনে বটে, কিন্তু ব্যাকরণ আর বেদান্তে আমি অল্পবয়েসেই কিছুটা অধিকার অর্জন করেছিলাম। যে বছর পড়া সাঙ্গ করে বাড়ি ফিরে আসি, সে বছর কালীপূজোর সময় আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

মামাবাড়ির গ্রামের উত্তরে ছিল পুঁটি নদী। নদীর খাত চওড়া, কিন্তু পলি পড়ে তার স্রোত ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। দক্ষিণ আর পশ্চিমে বিশাল এক জলাভূমি গ্রামটাকে বাইরের জগৎ থেকে পৃথক করে রেখেছে। প্রায় দ্বীপের মত এই গ্রাম

থেকে বাইরে যাবার একমাত্র ভাল রাস্তা পূবদিক দিয়ে। আর একটা পথ জলার ভেতর দিয়ে অনেক ঘুরেফিরে মহকুমা শহরে যাবার পাকা সড়কে পড়েছে বটে, কিন্তু সে পথ বিশেষ কেউ ব্যবহার করে না। নানান ভৌতিক কাহিনীর গুজব চালু ছিল জলাভূমিটা সম্বন্ধে। নরম কাদা, নলখাগড়ার বন, উলুঘাসের আর হোগলার জঙ্গল আর মাঝে মাঝে এক একটা জায়গায় একটু ঘাসজমি, তাতে একটা-দুটো বড় গাছ, এই নিয়ে সে জলাভূমির বিস্তার। আমি আর আমার প্রাণের বন্ধু তিনকড়ি—সেও ছিল আমারই মত ডানপিটে আর নির্ভীক—এই জলাভূমির মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতাম। সেসব দিনের কথা মনে এলে এখন বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে। মাথায় কোনো চিন্তার ভার নেই, কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ নেই, মনে কেবল নির্মল আনন্দ, চোখে অল্পবয়েসের স্বপ্ন। অমন সব দিন আর আসবে না।

সে বছর কালীপূজো পড়েছিল বেশ দেরি করে, কার্তিকের মাঝখান পেরিয়ে। বাতাসে হিমের ছোঁয়া লেগেছে, বিকেলের পড়ন্ত বরাদুরে সোনার রঙ। সন্ধে নামছে সূর্যাস্তের পরেই। এই পরিবেশে আমাদের দুই বন্ধুর জলাভূমির ভেতর ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগত। অনেকসময় দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়ে পড়তাম, ফিরতাম রাতের প্রথম

প্রহর পার করে। ছোট ছোট ঘাসজমিগুলোতে সরু আলের মত পথ বেয়ে গিয়ে গাছের তলায় শুয়ে বসে গল্প করতাম। সবগুলোতে যাওয়া যেত না, কোনো কোনোটায় যাবার পথ ছিল। ঠিক পথ বলা যায় না, বুড়ো আঙুলে ভর করে ডিঙি মেরে মেরে চলে যেতাম কোনোভাবে। সমস্ত জলাটা আমাদের নখদর্পণে ছিল। বিশেষ মজা হত চাদনি রাত্তিরে। ওই জলাজমি, নলখাগড়া আর উলুঘাসের বন, হালকা জ্যোৎস্নায় বড় বড় গাছের ছায়া—সব মিলিয়ে রূপকথার রাজ্য তৈরি করত। আর ওই বয়েস—বুঝতেই পারছ, জীবনে তা একবারই আসে। যেন মেঘের ওপর ভেসে বেড়াতাম তখন।

কালীপূজোর ঠিক আগের দিন, সেদিন ভূতচতুর্দশী, তিনকড়ি সকালের দিকে আমাকে এসে বলল—রাম, চল আজ বিকেলে জলার ভেতর বেড়াতে যাই। একেবারে সন্ধের পর একটু রাত্তির করে ফিরব। আজই রাত্তিরে অমাবস্যা লাগবে, এত অন্ধকারে কখনো ওখানে বেড়াই নি। পথঘাট তো সবই আমাদের চেনা। যাবি?

সত্যিই, পুরো জলাভূমিটা আমরা নিজেদের হাতের তালুর মত চিনতাম। সন্ধে হয়ে গেলেও অসুবিধের কোনো কারণ নেই। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

একটু পড়ন্ত বেলায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গ্রাম ছাড়িয়ে আরো মাইলখানেক হেঁটে এসে পড়লাম জলাভূমির প্রান্তে। তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে, দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে নামছে আবছায়া অন্ধকার। তিনকড়িকে বললাম—হারে ভেতরে ঢুকবি? নাকি এইখানে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে ফিরে যাই চল–

তিনকড়ি হেসে বলল-কেন, ভয় করছে বুঝি?

—যাঃ, ভয় কীসের? আজ অমাবস্যা পড়ছে, একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে কিন্তু–

—তার মানেই তো ভয় পাচ্ছিস। দূর, চল দেখি। অন্ধকারেই তো মজা। আয়—

এরপর না গিয়ে উপায় থাকে না। ঢুকলাম জলার ভেতরে। চারদিকে প্রায় মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে হোগলার ঝোপ। বোধহয় সেইজন্যই সেখানে অন্ধকার নামছে একটু : তাড়াতাড়ি। হালকা ধোঁয়ার মত একটা অস্পষ্ট কুয়াশা ঘনাচ্ছে। হেমন্তকালের শুরু, এই সময়ে সন্ধেবেলা বাতাস বয়

না, কিন্তু লম্বা ঝোপগুলোর মধ্যে বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শী শী আওয়াজ হচ্ছে। সেটা অবশ্য আমার মনের ভুলও হতে পারে। খুব নির্জন জায়গায় কানের ভেতর রক্ত চলাচলের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যায়, মনে হয় শব্দটা যেন বাইরে থেকে আসছে।

ভয় ঠিক করছিল না, কিন্তু অন্যদিন জলার ভেতরে ঘুরে বেড়াবার সময় মনে যে সহজ ফুর্তির ভাব থাকে সেটা অনুভব করছিলাম না। পরিবেশে কেমন যেন বিষণ্ণ ভাব, কী একটা যেন ঘটতে চলেছে, সমস্ত জায়গাটা তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। মনে পড়ল আজ ভূতচতুর্দশী, দুপুরে চোদ্দশাক ভাজা দিয়ে ভাত খেয়েছি। এতক্ষণে বাড়িতে দিদিমা চোদ্দ পিদিম দেবার জন্য প্রদীপ গোছাচ্ছেন, সলতে পাকাচ্ছেন। দিদিমা বলতেন-ভূতচতুর্দশীর দিন সন্ধের পর চোদ্দজন ভূত বাতাসে ভর করে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, তাদের খপ্পরে পড়লে ভারি মুশকিল। এদিন অন্ধকার নামার পর আর কোথাও যাবিনে, ঘরে থাকবি। ভূতেদের নামও বলতেন—আরমুই, ছারমুই, পোড়ামুই, অন্তাই, দন্তাই, খন্তাই, বরী, ঠরী—আরো কী কী যেন, সবগুলো মনে পড়ছে না। বাড়িতে বসে এসব শুনলে হাসি পায়, এখানে গা ছমছম করে।

কিছুদূর হাঁটবার পর বাঁদিকে একটা সরু পথ ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ঢুকেছে। দুদিকে জল-কাদা আর নরম ভড্ডসে জমি, মাঝখানে আট-দশ আঙুল চওড়া একটু পথ জেগে রয়েছে। জলার মধ্যে কয়েকটা ঘাসে হাওয়া জমির টুকরো দ্বীপের মত জেগে আছে তা তো আগেই বলেছি। এই পথটা তেমন একটা দ্বীপে গিয়ে শেষ হয়েছে। আমরা সাবধানে পা ফেলে ঘাসজমিটায় গিয়ে হাজির হলাম। তখন দিনের আলো পুরোপুরি নিভে রাত্তির নেমেছে।

দ্বীপটা লম্বায় কুড়ি হাত, চওড়ায় পনেরো হাত মত হবে। মাঝখানে একটা বড় গাছ ঠেলে উঠেছে ওপরদিকে। তার মোটা গুড়িতে হেলান দিয়ে তিনকড়ি বসল, আমি বসলাম মুখোমুখি। অমাবস্যার রাত্তিরেও নক্ষত্রদের থেকে চুইয়ে আসা ক্ষীণ একটু আলোর আভাস থাকে, সে আলো অন্ধকার দূর করে না, পরিবেশকে আরো রহস্যময় করে তোলে।

তিনকড়ি বলল—আয়, নিধুবাবুর একখানা গান ধরা যাক। সেই যে গানটা যে খাতনা যতনে, আমার মনই জানে। গাইবি? নে, শুরু কর

আমার গাইতে ইচ্ছে করছিল না। তিনকড়ি বেশ ভাল

গান জানত, সে একাই গান ধরল। হঠাৎ আমার মনে হল তিনকড়ি আসলে ভয় পেয়েছে। প্রথমে সাহস দেখিয়ে এখন সে ভয়টা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে। গান গাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে তার ভয় কাটানোর চেষ্টা। কিন্তু কেন ভয় পেল তিনকড়ি? পরিবেশের অদ্ভুত বিষণ্ণতা আর দমচাপা ভাবটা কি সে ধরতে পেরেছে?

দু-একলাইন গাইবার পর তিনকড়ি থেমে গিয়ে আমাকে বলল—গতকাল এই জলার দিকে অনেক রাত্তিরে একরকম আশ্চর্য আলো দেখতে পাওয়া গিয়েছে, জানিস?

—আলো? কী রকম আলো? এতক্ষণ বলিসনি তো

—এমনিই বলিনি। আমাদের গ্রামের অনেকেই দেখেছে। আজ সকালে মধু মিত্তির, হারাধন মজুমদার আর বিশু খুড়ো আলোচনা করছিল পথে দাঁড়িয়ে, তাই শুনছিলাম।

—কী বলছিল? নিজেরা দেখেছে?

—মধু মিত্তির আর বিশু খুড়ো দেখেছে। নীলচে মত আলো, আকাশ থেকে গোলার মত নেমে এসে মাটির কাছে

দপ্ করে জ্বলে উঠে অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। হারাধন মজুমদার বলছিল কাল রাতে এই জলায় ডাইনিদের চাতর বসেছিল

-সে আবার কী?

-চাতর মানে আসর। দূর দূর দেশ থেকে ডাইনিরা গাছ চালিয়ে উড়ে আসে। তারপর সারারাত ধরে তাদের সভা চলে। ওই সভাকেই বলে চাতর। গাছ-চালা কাকে বলে জানিস তো? কোনো বড় গাছের ডালে বসে ডাইনিরা হুকুম করে–অমুক জায়গায় চল। অমনি সে গাছ আকাশে উড়ে সেই জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। উড়তে উড়তে গাছ যখন মাটির কাছে নেমে এসে লেগে বসে, তখন ওইরকম দ করে নীল আলো জ্বলে ওঠে। আমি অবশ্য এসব বিশ্বাস করি না-ওরা বলছিল, আমি শুনলাম—এই আর কী। বিশু খুড়ো আবার সন্ধের পর আফিং খায়। বুঝতেই পারছিস–

কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে তিনকড়ি একবার ওপরদিকে তাকাল, কী একটা জিনিস যেন তার মনে পড়ে গিয়েছে। তারপর সোজা হয়ে বসে পেছন ফিরে সে গাছটায় হেলান দিয়ে দিল, তার মোটা গুড়িতে একবার হাত

বোলালো। এবার সে ঘুরে আমার দিকে যখন তাকাল, সেই অল্প আলোতেও দেখলাম তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, ভয় পেলে মানুষের যেমন হয়।

বললাম—কী রে, কী হল তোর? নিজের গল্পে নিজেই ভয় পেলি নাকি?

ফিসফিস করার মত গলায় তিনকড়ি বলল—রাম, এই গাছটা কোথা থেকে এল? এটা তো আগে কখনো দেখিনি। তাছাড়া কী গাছ এটা?

এবার আমিও অবাক হয়ে গাছটার দিকে তাকালাম। সত্যিই তো, এই জমির টুকরোটায় মোটামুটি বড় গাছ বলতে একটা গাব আর একটা মাঝারি তেঁতুল গাছ বরাবর দেখে এসেছি। সে দুটো তো ওই যথাস্থানে দেখা যাচ্ছে। তাহলে বাড়তি এটা আবার কোথা থেকে এল? গাছটাই বা কী জাতের? আমরা গ্রামের ছেলে, সবরকম গাছই চিনি। বড় বড় শালগাছের মত পাতাওয়ালা এটা কোন গাছ? মাটি থেকে বিরাট মোটা গুঁড়ি সোজা আকাশের দিকে উঠেছে, বিশেষ জটিল ডালপালা নেই। অনেকটা ওপরে কিছু শাখাপ্রশাখা এদিক-ওদিক ছড়িয়েছে, তাতে থালার মত বড় বড় গোল

গোল পাতা। দেখলেই মনে হয়—এ বাংলাদেশের গাছ নয়!

তিনকড়ি একইরকম ভয় পাওয়া গলায় বললভেবে দেখ, দিনসাতেক আগেও এখানে বসে আমরা আড্ডা দিয়ে গিয়েছি, এই গাছটা তো দেখিনি। এখানে কেন, গ্রামের ত্রিসীমানায় এমন গাছ দেখেছিস কখনো? এ হল ভিনদেশের গাছ–

তারপর কাপাকাপা গলায় বলল-রাম, বিশু খুড়োরা ঠিকই দেখেছিল। এখানে ডাইনির চাতর হয়েছে কাল। এই গাছ তারাই উড়িয়ে এনেছে। চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই—

কী করে যে ফিরে এলাম তা আর তোমাদের কী বলব! চেনা জায়গা, ছোটবেলা থেকে খেলা করে মানুষ হয়েছি ওই জায়গায়, কিন্তু সেদিন যেন কেবলই পথ হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। যেদিকেই যাই, দেখি বেরুবার পথ নেই। রাস্তা আবার ঘুরে একই বিন্দুতে এসে হাজির হয়েছে। রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলে? অত্যন্ত আবছা তারার আলো, লম্বা ঘাসের জঙ্গল, একটু পা ফেলতে ভুল হলেই কোমর পর্যন্ত কাদায় গেঁথে যাবার সম্ভাবনা, তার সঙ্গে হেমন্তকালের অস্বচ্ছ কুয়াশার পাক খাওয়া—সব মিলিয়ে যেন একটা ভয়ের স্বপ্ন।

কোনোরকমে জলাভূমির বাইরে শক্ত জমিতে এসে যখন পা দিলাম তখন। আমরা দুজনেই ঘামছি।

হন্‌হন্‌ করে হেঁটে প্রায় যখন গ্রামে পৌঁছে গিয়েছি, একবার কেন যেন তিনকড়ি পেছন ফিরে তাকাল। তারপরেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমাকে বলল দেখ রাম, দেখ! কী কাণ্ড!

তাকিয়ে দেখলাম সেদিকে আকাশটা অদ্ভুত নীল রঙে ভরে গিয়েছে। তীব্র আলো নয়, মৃদু জ্যোৎস্নার মত আভা। আর তার মধ্যে দিয়ে কী একটা জিনিস যেন জলার ভেতর থেকে উঠে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভাল করে বুঝতে না বুঝতে জিনিসটা আলোর পরিধির বাইরে চলে গেল। আমরা দুজন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আলোটাও একটু একটু করে ম্লান হয়ে শেষে মিলিয়ে গেল।

গ্রামে ঢুকে দেখলাম বেশ হই চই শুরু হয়ে গিয়েছে, অনেক মানুষ বেরিয়ে এসেছে বাইরে। কে যেন গাড় হাতে মাঠে যাবার সময় দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে নীল আলোটা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে লোজন ডাকে। একেবারে মিলিয়ে যাবার আগে অন্তত সাতআটজন মানুষ দেখেছে আলোটা। যারা পরে বেরিয়েছে, তারা এখন প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে বিবরণ শুনছে।

বিশু ভটচাজ বলছেন—পরপর দুদিন! আর নিশ্চয় তোমরা অবিশ্বাস করবে না—এখন তো নিজের চোখে দেখলে? কালকেই তোমরা বলেছিলে আমি আফিঙের ঝেকে খেয়াল দেখেছি। আজ নিশ্চয় আর তা বলবে না? আগামীকাল কালীপূজা, রক্ষেকালীর মন্দিরে ভাল করে পূজো দাও সবাই। এসব ভাল লক্ষণ নয়—

রঘু চৌধুরী বললেন-ঠিকই। আজ হচ্ছে ভূতচতুর্দশী- ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি আজ সন্ধের পর থেকে প্রেতের দল বাতাসে মিশে ঘুরে বেড়ায়। তোমরা তো কেউ আজকাল কিছু মানো না, আধুনিক যুগ এসেছে, শহরে শুনছি তেলের বদলে গ্যাসের আলো জ্বলছে রাস্তায়। এখন বুঝে দেখ বুড়োদের কথা সত্যি না মিথ্যে।

এই গোলমালে কেউ খেয়াল করেনি আমরা বাইরে থেকে এসে গ্রামে ঢুকেছি। নইলে বকাঝকা খেয়ে মরতে হত। পরের দিন কালীপূজো, কথা রইল তিনকড়ি আর আমি বিকেল তিনটে নাগাদ রক্ষাকালীর মন্দিরের সামনে দেখা করব।

পরের দিন যথাসময়ে মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখি

তিনকড়ি আমার আগেই এসে হাজির হয়েছে। মন্দিরে আজ সারারাত ধরে পূজো হবে, তার প্রস্তুতি চলেছে পুরোদমে। তিনকড়ি আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে গিলে বলল-রাম, চল আমরা জলার দিকটা। আজ একবার ঘুরে আসি। দিনের বেলা তো কোনো ভয় নেই। কাল কী দেখতে কী দেখেছি

—নীল আলোটা তো সত্যি। আমরা ছাড়াও গ্রামের কত লোকে দেখেছে—

একটু ভেবে তিনকড়ি বলল—তবু চল যাই। বেলা থাকতে থাকতে ফিরে আসব।

গতকাল অত ভয় পেয়েছিলাম, আজই আবার সেখানে রওনা হলাম দুজন মিলে। সেই বয়েসে সবই সম্ভব ছিল। তাছাড়া ঝকঝকে সূর্যের আলোয় অপ্রাকৃত ভয় থাকে না। জলার ভেতরে ঢুকে আজ প্রথমেই যেটা অনুভব করলাম তা হ'ল কাল রাত্তিরের সেই দমবন্ধ-করা ভয়ের পরিবেশটা আর নেই। কেবল দিনের আলো রয়েছে বলে নয়, অমঙ্গলের প্রভাবটাই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বাঁদিকের সরু পথটা দিয়ে হোগলাবনে ঢুকে ঘাসজমির দ্বীপে পৌঁছে আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

বড় গাছটা সেখানে নেই।

নেই মানে একেবারেই নেই। আমরা এগিয়ে গিয়ে জমি পরীক্ষা করে দেখলাম। বড় একটা গাছ উপড়ে ফেললে তো সেখানে তার চিহ্ন থাকবে, মাটিতে তার গর্ত থাকবে—কিছু নেই। দিব্যি সমান ঘাসে ছাওয়া জমি। গেল কোথায় অত বড় গাছটা? যেভাবে এসেছিল সেভাবেই কি ফিরে গিয়েছে? ওই গাছটাকেই কি কাল রাত্তিরে আমরা আকাশে উঠে যেতে দেখেছিলাম?

বললাম–তিনু, কাল আমরা আলো-আঁধারিতে ভুল দেখিনি তো? হয়ত গাছ-টাছ কিছু ছিল না, সবটাই আমাদের চোখের ভুল। হতে পারে তো, তাই না?

তিনকড়ি দৃঢ় গলায় বললনা, হতে পারে না। কারণ আমি গাছটায় হেলান দিয়ে বসেছিলাম। জিনিসটার বাস্তব ছোঁয়া পেয়েছি। তাছাড়া

শার্টের পকেট থেকে একটা সবুজরঙের ভাজকরা কী জিনিস বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল—তাছাড়া এইটে।

এইটে তো আর মিথ্যে নয়, চোখের ভুল নয়—

গতকাল রাত্তিরে দেখা ভূতুড়ে গাছের একখানা পাতা।

তিনকড়ি বলল—কী ভেবে একখানা পাতা পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। নিচেই পড়ে ছিল।

আমরা দুজনে মিলে অনেক খুঁজলাম। নাঃ, আর একটাও পাতা পড়ে নেই। সমস্ত চিহ্ন নিয়ে গাছটা মিলিয়ে গিয়েছে? কেবল তিনকড়ির রেখে দেওয়া পাতাটা ছাড়া। গ্রামে ফিরে এসে অনেককে পাতাটা দেখিয়েছিলাম, কেউ চিনতে পারেনি। বহুবছর বাদে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম ওটা কী গাছের পাতা। কাশী গিয়েছিলাম বিশ্বনাথ দর্শন করতে। একদিন সেখান থেকে দেবী মহাকালীর পূজো দিতে গিয়ে পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের মধ্যে ওই গাছ দেখি। যে পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল—ওই বড় গাছটা? ওর নাম বাবু বুদ্ধ নারিকেল। বিহার আর উত্তরপ্রদেশের জঙ্গলে দেখা যায়-

বললাম-বাংলাদেশে হয় না?

—না বাবু। শুকনো পাথুরে মাটি ছাড়া বুদ্ধ নারিকেল জন্মায় না।

পরে অনেককে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি সত্যিই ওই গাছ বাংলায় হয় না। পাণ্ডার কথা শুনে আমার মনে পড়ে গেল ফেলে আসা প্রথম যৌবনের স্মৃতি। সেই মামাবাড়ির গ্রাম, ভূতচতুর্দশীর নিকষ কালো রাত, বন্ধু তিনকড়ি। সব কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। মামারা কেউ আর বেঁচে নেই, তাদের ছেলেপুলেরাও একজন ছাড়া সবাই জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়। আর কখনো সে গ্রামে যাইনি। তিনকড়িও এখন কোথায় আছে কে জানে। অনেকদিন তার সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

রাম গাঙ্গুলির গল্প শেষ হতে সবাই কিছুক্ষণ চুপ, তারপর পতিরাম মজুমদার বললেন–সরসী ভায়া, এবার কিন্তু আমাকে উঠতেই হবে। কিন্তু এরপর তো আর একা যেতে পারব না, গা ছমছম করবে। তুমি বলেছিলে তোমার লোক সঙ্গে যাবে, তাই একজন কাউকে দাও। ঠাট্টা করলে কর ভাই, আমি অপারগ—

সরসী চাটুজ্জে বললেন-কেউ ঠাট্টা করছে না, তোক

দিচ্ছি সঙ্গে।

আদিনাথ চক্রবর্তী বললেন—ওঠবার আগে আমার কাহিনীর শেষটা বলি—

পতিরাম বললেন—এখনো শেষটা বাকি।

—ভয় নেই, দুটো কথা মাত্র। অমর বিষ্ণুমূর্তি খুঁজে দিয়ে গিয়েছিল, ঠাকুমার মৃত্যুর পর তার ভবিষ্যৎবাণী যে সত্যি সে কথা জানান দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার তৃতীয় ভবিষ্যৎবাণীটাও যে সত্যি, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পরে। সে বলেছিল আমাদের বংশে একজন অদ্ভুত চরিত্রের উদাসীন সাধকের জন্ম হবে। সংসারী হয়েও সে বৈষয়িক হবে না। কবে, কোথায় কার ঘরে তার জন্ম হবে সেটাই কেবল সে বলেনি। শুধু বলেছিল এই শিশুর জন্মের মুহূর্তে আশ্চর্য এক নীল উল্কাপাত হবে আকাশে। তা দেখলে আমরা বুঝতে পারব।

বহুদিন পরে, তখন ছোটবেলার এ কাহিনী প্রায় ভুলেই গিয়েছি, আমার তৃতীয় ছেলের জন্মের সময় আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক বিশাল নীল রঙের আলো

ছড়ানো উল্কা ছুটে গেল। একজন দাই আঁতুড়ঘর থেকে উঠোন পেরিয়ে গরমজল আনতে যাচ্ছিল ভেতরবাড়িতে, তার চিৎকারে সকলে উঠোনে বেরিয়ে এসে দৃশ্যটা দেখলাম। সচরাচর অতক্ষণ ধরে উল্কা জ্বলতে জ্বলতে অতটা আকাশ পার হয় না। সেই আলো মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলের জন্ম। তার নাম তারানাথ। তারানাথ চক্রবর্তী।

আদিনাথের এক ছেলে ছোটবেলা থেকেই সংসারত্যাগী। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে, আবার কোথায় চলে যায়। এটা তার জীবনের গভীর ব্যথার জায়গা। আড্ডাধারীরা সেকথা জানেন বলে চুপ করেই রইলেন। আদিনাথ বললেন—এখন তার বয়েস বাইশ কী তেইশ। কোথায় আছে কে জানে। বছরখানেক আগে একবার সাতদিনের জন্য এসেছিল, তারপর আবার নিরুদ্দেশ। ছেলে আমার খুবই ভাল, চমৎকার সংস্কৃত জানে, পণ্ডিতেরা তার সঙ্গে পেরে ওঠে না। কোথা থেকে শিখল সে এক রহস্য। স্কুল-কলেজে তো কখনো পড়েনি। দোষের মধ্যে ওই এক বাড়িতে মন বসে না। জানি না আবার কবে তার দেখা পাব।

আড্ডাধারীরা তারানাথকে দেখেছেন। আট-দশ বছর আগে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তার আগে অবধি এই

গ্রামেই সে মানুষ হয়েছে। সমবেদনাসূচক নীরবতা পালন করা ছাড়া তাদের কিছু করবার নেই।

আদিনাথ বললেন—যাক, আমার ভাগ্য। আপনারা আশীর্বাদ করুন, সেখানেই থাকুক, সে যেন ভাল থাকে।

চতুর্থ

এতক্ষণ এ গল্প শুনছিলাম

এতক্ষণ এ গল্প শুনছিলাম তারানাথের মুখে।

মট লেনে তারানাথের বাড়িতে আমাদের চিরাচরিত আড্ডা বসেছে। আজ ছিল জন্মাষ্টমীর ছুটি। দুপুরের পরেই কিশোরী সেন আর আমি গল্পের লোভে হানা দিয়েছি তারানাথের বৈঠকখানায়। চারির বিয়ে হয়ে যাবার পর তারানাথ বোধহয় মনের দিক দিয়ে একটু অসহায় হয়ে পড়েছে। মেয়েরা বাপের যতখানি সেবা করে, ছেলেরা ততটা পারে না। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার পর তারানাথের মুখচোখে একটা ভরসা-হারা ভাব ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে। আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা করি না।

কী হবে প্রৌঢ় মানুষের মনে বিষণ্ণতার বোঝা বাড়িয়ে?

আজ তারানাথের বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিল চারি। অবাক হয়ে বললাম—একি রে! কবে এসেছিস তুই? গত হপ্তাতেও তো আমরা এসে গল্প করে। গিয়েছি, তোর বাবা তো বলেন নি তুই আসবি!

হাসিমুখে চারি বলল—না কাকাবাবু, আসার কথা ছিল না, গতকাল হঠাৎ এসে পড়েছি। ব্যবসার কাজে আপনাদের জামাইকে কলকাতা আসতে হ'ল, আমি ধরে পড়লাম—আমিও যাব। তাই

বললাম—জামাই তোর কথা সব খুব মান্য করে, তাই না?

চারি সলজ্জ হেসে মুখ নিচু করল। সে চিরকালই সপ্রতিভ, কিন্তু প্রগভা নয়। ছোটবেলা থেকে তাকে দেখছি, কন্যার মত স্নেহ জন্মে গিয়েছে তার ওপর। আগে আগে তার জন্য লেসের ডিজাইন, ছবিওয়ালা গল্পের বই ইত্যাদি নিয়ে আসতে হত। গতবছর। ভাল ঘরে-বরে বিয়ে হয়েছে চারির।

স্বামী মাঝারি ধরনের ব্যবসা করে, বিশাল ধনী নয়, কিন্তু সচ্ছল অবস্থা। ছেলেটিও ভাল, বিনয়ী এবং সচ্চরিত্র। এত ভাল পাত্রে মেয়ের বিয়ে দেবার ক্ষমতা তারানাথের ছিল না, কিন্তু চারি সুন্দরী বলে দেনাপাওনা কোনও বাধা হয়নি।

চারি বলল—আপনারা ভাল আছেন তো কাকাবাবু? আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

একটু পরেই তারানাথ বাড়ির ভেতর থেকে বৈঠকখানায় এসে বসল। তার মুখ আজ উজ্জ্বল, গত একবছরের ম্রিয়মাণ ভাবটা কেটে গিয়েছে। সে বলল-এসো হে দুই মূর্তি, আজ ছুটির দিন, আমি জানতাম তোমরা আসবে। তোমাদের বউদিদি ক্ষীরের মালপোয়া করেছেন, খেয়ে যাবে–

কিশোরী বলল—চারি এসেছে, বাড়ির চেহারাই দেখছি বদলে গিয়েছে। সত্যিই, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে মনে খুব আনন্দ হয়, তাই না?

—ঠিক। তাও এখন তো বুদ্ধি দিয়ে বুঝছ, আমার বয়েসে এলে হৃদয় দিয়ে বুঝবে।

যথাসময়ে চারি চা নিয়ে এল। আজ সব একদম সময়মাফিক ঠিকঠাক চলছে। আমরা আসবার সময় মোড়ের দোকান থেকে কিনে আনা তারানাথের প্রিয় সিগারেট পাসিং শোএর প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলাম। এটা না হলে তারানাথের গল্পের মেজাজ আসে না। নানারকম কথা হতে হতে নিজের ছোটবেলার গল্প বলতে আরম্ভ করল তারানাথ। সাধারণত সে নিজের পুরনো জীবন সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না, অন্তত সাধারণ পারিবারিক তথ্যগুলো আলোচনা করে না। বেছে বেছে কেবল অদ্ভুত আর অলৌকিক অভিজ্ঞতার গল্প শোনায়। আজ হঠাৎ কিশোরী জিজ্ঞাসা করল—আপনি তন্ত্রসাধনার উৎসাহ বা প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে? আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কি কেউ তন্ত্রসাধক ছিলেন? মানে আমি বলতে চাইছি যে, এর ধারাটা কি পরিবারে আগে থেকে ছিল?

সিগারেটের দগ্ধাবশেষ ছাইদানি হিসেবে ব্যবহৃত নারকেলের মালায় গুঁজে দিতে দিতে তারানাথ বলল—তা বলতে পার। একেবারে রক্তাম্বরধারী তান্ত্রিক কেউ না থাকলেও বাপ-ঠাকুর্দা-প্রপিতামহের ভেতর অনেকেই রীতিমত সাধকশ্রেণীর মানুষ ছিলেন। আমার আপন ছোট ঠাকুর্দা, মানে বাবার ছোটকাকা-তিনি কৈশোরেই গৃহত্যাগী হয়ে চলে গিয়েছিলেন। তাছাড়াও আমাদের পরিবারে নানাসময়ে নানান

আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে, যার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আর কিছু কিছু তো তোমাদের বলেছি।

বললাম—আপনার ছোট ঠাকুর্দা আর কখনো সংসার জীবনে ফিরে আসেন নি?

–না। তবে একবার তার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। সেও এক বলবার মত গল্প—

–বলুন না, আজকের আসর সেইটে দিয়েই শুরু হোক।

তারানাথ বলল-এ কাহিনী আমার বাবার কাছে শোনা। বাবা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে গল্প বলতে পারতেন—এ বিষয়ে তাঁর নাম ছিল। আমাদের গাঁয়ের সরসী চাটুজ্জের বৈঠকখানায় সন্ধেবেলা বোজ জমাট আড্ডা বসত, বাবা ছিলেন সে আড্ডার প্রধান কথক। মেজাজ ভাল থাকলে বাড়ি ফিরে সেদিন কী গল্প হল আমাদের শোনাতেন। তারপর তো আমিও অল্পবয়েসে বাড়ি থেকে উধাও হলাম। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে আসি, তবে সে খুব কম। তিন-চার বছরে একবার কী দুবার। ওই ভবঘুরেমির সময়টা আমার যে কী সুন্দর কেটেছে তা আর কী বলব! কোনও পিছুটান নেই, দায়দায়িত্ব নেই, কেবল

বিরাট এই পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। বাইরে থেকে দেখলে এটা হয়ত স্বপ্নদর্শী অলসের জীবনযাত্রা বলে মনে হবে, যে বাস্তব জগতের থেকে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আত্মীয়হীন, বন্ধুহীন দুনিয়ায় সম্পূর্ণ সম্বলহীন অবস্থায় ভেসে পড়তে হলে খুব সাহসের দরকার। কে খেতে দেবে ঠিক নেই, কোথায় থাকব তার কিছু ঠিক নেই, মন্দিরের চাতালে, পোড়ড়া বাড়ির বারান্দায় ঝড়ে-বৃষ্টিতে রাত কাটিয়েছি। কত অদ্ভুত চরিত্রের লোক দেখেছি, তাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত সাধক, কেউ নৃশংস কাপালিক, কেউবা জুয়াচোর। কত সময়ে অসুখ করেছে, প্রবল জ্বরে পথের ধারে গাছতলায় পড়ে কষ্ট পেয়েছি, জলতেষ্টায় বুক ফেটে গিয়েছে, কিন্তু জল দেবার কেউ ছিল না। মরেও যেতে পারতাম। সেক্ষেত্রে বাড়িতে কোনও খবরও পৌঁছত না। তবু কখনো ভয় হয়নি। মৃত্যুকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দেখিনি, দেখেছি ঈশ্বরের তৈরি এই জগতের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে। যে পরিণতিতে ভয়ের কিছু নেই, আছে স্রষ্টার অপার করুণা।

এই পর্বেই বীরভূমের শ্মশানে মাতু পাগলীর সঙ্গে পরিচয়, বরাকর নদীর ধারে নির্জন শালবনে মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব দেখতে পাওয়া। ওঃ, সেসব কী উত্তেজনাপূর্ণ দিন

গিয়েছে। মনে হয়েছিল বুঝিবা সৃষ্টির সব রহস্য জেনে ফেলব, সাধনার তীব্রতায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মকানুন ধরা দেবে আমার চেতনায়–

কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থেমে গেল তারানাথ। বললাম— কেন, অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তো হয়েছে—

—তা হয়েছে। যা পেয়েছি তা একজন সাধকের একটা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আসলে তো কিছুই জানা হল না। এই জগতের মানে কী, কী করে এই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি হল, না হলেই বা কী এসে যেত, সেই ভেতরের আসল কারণগুলো সব অজানা থেকে গেল। এখন মনে হয়–

আবার থেমে গেল তারানাথ। কী ভাবতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম-কী মনে হয়?

—মনে হয় সৃষ্টির গভীরতম কারণটা ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য আড়াল করে রেখেছেন। সে রহস্য জানতে পারলে সৃষ্টির আর কোনও সার্থকতা থাকবে না। গোলোকধাম খেলেছ তো? সেই যে কড়ি চেলে, কাগজে ছাপা

ছকের ওপর গুটি এগিয়ে খেলা। জন্ম থেকে শুরু হয়ে বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র, আদালত, পতিতালয়, শৌণ্ডিকালয়, মন্দির ইত্যাদির খোপে আঁকা ঘর পেরিয়ে খেলুড়েকে একটু একটু করে ওপরে উঠতে হয়। সবচেয়ে ওপরের খোপের নাম হচ্ছে গোলোকধাম। সেখানে পৌঁছলেই খেলা শেষ। তারপর ছক আর গুটি তুলে ফেলা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। আমাদের জীবনেও তাই। সবকিছু জেনে ফেললেই খেলা শেষ। সেটা ভগবান চান না। তা একদিক দিয়ে ভালই, খেলা চলছে চলুক না।

দেখলাম তারানাথ গল্প থেকে দর্শনের দিকে সরে যাচ্ছে। বললাম-তারপর যে কথা বলছিলেন, আপনার অল্পবয়েসের গল্প, সেটা বলুন–

তারানাথ বলল—একবার বাঁকুড়ার ইন্দাস অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সারাদিন হাটেমাঠে ঘুরি, রাত্রে যেখানে হোক আশ্রয় নিই। সেদিন বিকেল থেকেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বেশি পথ না হেঁটে আলো থাকতে থাকতে একটা ছোট গ্রামের সীমানায় শিবমন্দিরের চাতালে আশ্রয় নিয়েছি। বেশ বড় চওড়া চাতাল, আট-দশটা থামের ওপর ছাদ রয়েছে। কাজেই ওপরটা ঢাকা, বৃষ্টি হলেও ভিজতে হবে না। গায়ে উড়নি,

পায়ে খড়ম এক পৈতেধারী বুড়োমত লোক দেখি মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় যাচ্ছে। মনে হল এখানকার পূজারী। এগিয়ে গিয়ে বললাম—আজ্ঞে, এখানে রাত্তিরটা একটু থাকা যাবে?

লোকটি একান্ত নীরস এবং অমিশুক প্রকৃতির। কিছুক্ষণ আপাদমস্তক আমাকে ভাল করে দেখে সে শুকনো গলায় বলল—থাকতে ইচ্ছে হলে থাকো, আমাকে জিজ্ঞাসা করার কী প্রয়োজন?

—না, ভাবলাম আপনিই বোধহয় এ মন্দিরের পূজারী। কাজেই আপনার অনুমতি নেওয়াটা–

—কিছু দরকার নেই। আমি এখানকার পূজারী বটে, কিন্তু নাটমন্দিরে যে কোনও যাত্রী আশ্রয় নিতে পারে। তবে এখানে অতিথিশালা নেই, খাবারদাবার দেবার ব্যবস্থাও নেই। থাকার মধ্যে ওই নাটমন্দির, থাকতে চাইলে থেকে যাও।

–আপনি কোথায় থাকেন?

বৃদ্ধ আমাকে কড়া চোখে তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল

—কেন বল তো?

—না, তাই জিজ্ঞেস করছি–

—আমি এই গ্রামেরই ভেতরে থাকি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে স্থানাভাব, সেখানে আশ্রয় দিতে পারব না।

হেসে বললাম—আপনার আশ্রয়ে থাকার চেয়ে গাছতলায় থাকা ভাল। ভয় নেই, থাকতে চাইব না, কথাটা এমনিই জিজ্ঞেস করেছিলাম। গাছপালারা অন্তত আশ্রয়গ্রহণকারীকে কটু কথা বলে না–

বৃদ্ধ আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে হুম্‌ শব্দ করে গ্রামের দিকে চলে গেল।

আমার পথ হাঁটার সম্বল বলতে একটা ঝোলা। তার মধ্যে একখানা ঘটি, গায়ের চাদর, একখানা রুদ্রডামরের পুঁথি, কয়েকটা বাবলাডালের দাঁতনকাঠি, আর একটাকা বারো আনা পয়সা। এর বেশি কিছুর প্রয়োজনও বোধ করিনি কখনো। পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসা সেই হিন্দিভাষী সাধু শিক্ষা দিয়েছিলেন আগামীকালের জন্য কোনও সঞ্চয় না করতে। তার উপদেশ

মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। পরবর্তীকালেও যে উপার্জন বা সঞ্চয় করেছি, তা করেছি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মঙ্গলের জন্য, নিজের প্রয়োজনে নয়। আজ পর্যন্ত সেই অভ্যাস বজায় রেখেছি।

ক্রমেই আকাশ মেঘে অন্ধকার করে আসছে। ঝোলাসহ নাটমন্দিরের ওপর উঠে একখানা থামের গোড়ায় গুছিয়ে বসলাম। বাঁকুড়া জেলায় গিয়েছ কখনো? বড় সুন্দর জায়গা। বিশাল বিশাল লালমাটির প্রান্তর, ঝুঁটিবাঁধা বৈরাগীর মত তালগাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে মাঠের মধ্যে, ধুলোওড়া গ্রামের রাস্তায় একতারা হাতে গান গাইতে গাইতে বাউল হেঁটে যাচ্ছে। জেলাটার মাটিতে শান্তি আছে। থামে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসলাম।

হঠাৎ নাটমন্দিরের চাতালে কিছুদূরে কী একটা নড়ল বলে মনে হল। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে, পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। কিন্তু কোনও কিছু নড়লে আবছা আন্দাজ করা যায়। ভাল করে তাকিয়ে দেখি কেউ একজন শুয়ে রয়েছে সেখানে, শোয়া অবস্থায় পাশ ফেরায়। নড়াচড়াটা চোখে পড়েছে। হেঁকে বললাম—কে? কে ওখানে?

মনুষ্যমূর্তিটি উঠে বসে বলল—আমি।

—আমি কে? পৃথিবীতে সবাই তো আমি। যাত্রী?

লোকটি সামান্য হাসল, বলল—সংসারে সবাই যাত্রী, কোথাও না কোথাও চলেছে।

বাপ রে! এ যে গুরুমশায়ের মত কথা বলে। তবে তার কণ্ঠস্বর মৃদু, ভদ্র ও মার্জিত। পথচলতি লোকের কথা বলার ভঙ্গি সাধারণত এমন মার্জিত হয় না। একটু কৌতূহল হওয়ায় বললাম—এসো, এদিকে এসে বোসো

লোকটি উঠে এল আমার সামনে। আলো নেই, পরিষ্কার তাকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু মনে হ'ল তার বয়েস বছর চল্লিশ কী পঁয়তাল্লিশ হবে। এ বয়েসের কোনও লোককে। 'তুমি' বলাটা আমার উচিত হয়নি। বললাম—কিছু মনে করবেন না, অন্ধকারে ভাল দেখতে পাইনি, তুমি' বলে ফেলেছি।

—তাতে কী হয়েছে? জগতে সকলে সকলের বন্ধু। বন্ধুকে 'তুমি' বলা যায়।

লোকটির পরণে খাটো ধুতি আর হাফহাতা শার্ট। সাধারণ দরিদ্র পথিক। কিন্তু তার আচরণে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা সমীহ আদায় করে। বললাম কোথায় যাবেন? আসছেন কোথা থেকে?

এবার বেশ মজার ব্যাপার হ'ল। পথিক মানুষটি আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করতে লাগল, কিন্তু তার অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও আমি কিছুতেই তা পারলাম না। সে বলল— কোথাও যাচ্ছি না ভাই, অনেকটা তোমারই মতন। পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। যা পাই তাই খাই, যেখানে খুশি থেমে যাই—এই আরকি।

আমার সেই বয়েসের অভিজ্ঞতাতেই দেখেছি, কিছু লোক আছে যারা হেঁয়ালি করে। কথা বলতে ভালবাসে। ভেতরে শূন্যগর্ভ বলেই বোধহয় তারা বড় বড় দুর্বোধ্য কথা বলে। প্রথমে আমি এই লোকটিকে তাদের দলে ফেলেছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম তা সত্যি নয়। মানুষটার ভেতর গভীরতা আছে।

বললাম—আমারই মতন মানে? আপনি কী করে

জানলেন আমি কী রকম?

--ও জানা যায়। আমি বুঝতে পারি।

বয়েস অল্প হলেও তারই মধ্যে আমি অনেক সাধক এবং অদ্ভুতকর্মা তান্ত্রিকের সঙ্গে মিশেছি। তাদের আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ দেখেছি। এ আর আমাকে নতুন কী ভড়ং দেখাবে?

বললাম—কী করে বোঝেন? কাকচরিত্র বা লক্ষণশাস্ত্র চর্চা করেন নাকি?

—না। বুঝি এইভাবে যে, মন আসলে একটাই—তোমার আমার যদু কিম্বা মধুর, পৃথিবীর সব প্রাণীর। মায়ার আবরণে আলাদা আলাদা দেখায়। পর্দা টাঙিয়ে দিলে ওপারে কী আছে দেখা যায় না, পর্দা সরিয়ে দিলে আবার সব স্পষ্ট দেখা যায়। মায়ার পর্দা সরিয়ে দিলে সবই এক। তখন কারও মনের কথা জানতে অসুবিধে হয় না।

বললাম—আপনি তো বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা বলছেন। এ দর্শন শিক্ষা করেছেন কোথায়? খুব ভাল গুরু ছাড়া

অদ্বৈতবাদের পাঠ নেওয়া যায় না। কে আপনার গুরু?

—আমার বাবা।

—ও, আপনি বুঝি শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতের সন্তান?

সে চুপ করে রইল। ভাবলাম কোনও কারণে সে হয়ত নিজের পরিবারের কথা আলোচনা করতে চায় না। এক্ষেত্রে কথা না বাড়ানোই ভদ্রতাসঙ্গত হবে।

ঠিক এইসময় ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা ঝাপটা দিয়ে ঝড় এসে পড়ল। বর্ষাকাল হওয়া সত্ত্বেও সারাদিন প্রখর রোদ্দুর ছিল, গুমোটে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এখন শুকনো পাতা ধুলোবালি আর কুটোকাটা উড়িয়ে ঝোড়ো বাতাস এসে চারদিকে ঠাণ্ডা করে দিল। ঝড়ের মুখে পাক খেতে খেতে দুটো শালিক এসে নাটমন্দিরের কড়িকাঠের ফাঁকে আশ্রয় নিয়ে গুছিয়ে বসল। অথবা ওইটাই ওদের বাসা, ঝড়ের দাপটে কোনওরকম ফিরে এসেছে।

বললাম—আপনার নামটা তো জানা হ'ল না—

লোকটি চুপ করে থেকে বলল—আমার নাম অমর। অমরজীবন।

–বাড়ি কোথায়? এই জেলাতেই বুঝি?

অমরজীবন কোনও উত্তর দিল না। বুঝলাম নিজের কথা বলতে সে আদৌ আগ্রহী নয়। অন্য প্রসঙ্গে যাবার জন্য বললাম—আশ্রয় তো যাহোক পাওয়া গেল, কিন্তু খাওয়াটা বোধহয় জুটবে না

–না না, তা কেন? ঝড়টা থামুক, খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন–

—তা কী করে হবে? কাছাকাছি কোনো দোকানপাট দেখছি না। গ্রামে হয়ত আছে, কিন্তু তারা কি এই ঝড়বাদলে দোকান খুলে রাখবে? মনে হয় না।

অমর বলল-রাত্তিরে কী খাও তুমি? ভাত না রুটি?

বললাম–আমি ঠিক সন্ন্যাসী না হলেও পথে ঘুরছি অনেকদিন। সবই অভ্যেস আছে।

–বেশ, বেশ। ভাল। খাবার এসে যাবে।

অন্ধকারে অমরের মুখচোখ ভাল দেখতে পাচ্ছি না। লোকটা পাগল নয় তো? কোথায় খাবার?

অমর বলল—কালকেও আমি এখানে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আজ তুমি আসবে, তাই একটা দিন বেশি থেকে গেলাম। এমনিতে আমি দু-রাত্তির কোথাও থাকি না–

হ্যাঁ, নিশ্চয় পাগল। গতকাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছে আজ আমি আসব! বদ্ধ পাগল ছাড়া কী?

বললাম—আপনি জানতেন আমি এখানে আসব?

-হ্যাঁ।

–স্বপ্নে দেখেছেন?

-হ্যাঁ। স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন হলে আমাকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে সেখানে থাকতে হয়।

বেচারী! এমনিতে বেশ ভাল লোকটা, ভদ্র আর মিষ্টি কথাবার্তা। দোষের মধ্যে পাগল।

এরপরেই অমরজীবন হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল–তুমি বাড়ি চলে যাও।

আমি প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি সে কী বলছে। বললাম —তার মানে? বাড়ি যাব কেন?

—কিছু না। ভবঘুরে জীবন ত্যাগ করে সংসারে ফিরে যেতে বলছি না। সে যখন সময় হবে যাবে। তোমার নিজের ভালর জন্য বলছি, কয়েকটা দিনের জন্য বাড়ি যাও—

আচ্ছা বিপদ তো! বললাম—কিন্তু কেন?

—মনে করো না আমি তোমার বন্ধু, আমি অনুরোধ করছি তাই যাচ্ছ।

তার কথাগুলো একটু কেমন কেমন। কিন্তু গলার স্বরে একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ দৃঢ়তা আছে। তার কথা মনোমত না হলেও

অকস্মাৎ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তখনকার মত তাকে শান্ত করার জন্য বললাম–আচ্ছা, আচ্ছা। সে দেখা যাবে এখন। বিড়ি চলে?

সে হাসল। বলল—সব চলে। আছে? দাও–

তাকে দিয়ে নিজে একটা বিড়ি নিলাম। বাতাসের দাপটে চার-পাঁচটা কাঠি নষ্ট করেও ধরাতে পারছিলাম না। অমর হাত বাড়িতে বলল—আমাকে দাও দেখি–

তারপর দেশলাইটা হাতে নিয়ে অদৃশ্য কার দিকে যেন ধমক লাগাল—আরে একটু থাম্ তো রে বাপু! একটা বিড়ি ধরাতে কি একটা আস্ত দেশলাই খরচ করব নাকি?

কাকতালীয় কিনা জানি না, হাওয়ার ঝাপটা সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্য কমে গেল। ঝড় চলতে চলতে এরকম অবশ্য হয়ই, তবু মনে রেখাপাত করল জিনিসটা। দেশলাই ফেরৎ দিয়ে অমর বলল—সবকিছুর ব্যাখ্যা চাইতে নেই। ব্যাখ্যা হয়ও না। তার চেয়ে সরল বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা ভাল। আদেশ পেলে পালন করা ভাল।

—আদেশ কে পাঠায়?

বিড়িতে গোটাদুই টান দিয়ে অমর বলল—তা জানলে তো সব সমস্যাই মিটে যেত।

—আপনার কাছে আদেশ পৌঁছয় কেন? আপনি কে?

উত্তরে অমর বলল—বিড়িটা ভাল। খুব নরমও না, খুব কড়াও না। বেশ মিঠেকড়া ধরনের। কোত্থেকে কিনেছ? খাওয়ার পরে আর একটা দিও তো–

ঝড় থেমে গিয়ে নামল বৃষ্টি। চলল বেশ কিছুক্ষণ। দিকদিগন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মন্দিরের পেছনে কোথা থেকে ব্যাঙ ডাকতে লাগল। বৃষ্টি যখন থামল, তখন পাড়াগাঁর হিসেবে বেশ রাত। দেখি পথে জমা জলে ছপ ছপ করে কে একজন হেঁটে এসে নাটমন্দিরে উঠল। সামনে ঝুঁকে অন্ধকারে ঠাহর করার চেষ্টা করে ডাকল—ঠাকুরমশাই! ও ঠাকুরমশাই–

অমর বলল–এই যে, আমি এখানে। দাও–

কাছে এলে দেখলাম লোকটির হাতে একটা বড়

শালপাতার ঠোঙা। সে ঠোঙাটা অমরের হাতে দিতে দিতে বলল—আর এক মূর্তি এয়েচে দেখচি। তা হয়ে যাবে'খন দুজনের। দাঁড়াও, খাবার জল দিয়ে যাই। নতুন লোক, জল আনতে গেলে পুকুরঘাটে আছাড় খাবে।

বোধহয় পথিকদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মন্দিরের চাতালে রাখা একটা মাটির কলসী নিয়ে লোকটি অন্ধকারে কোথায় চলে গেল। অমর বলল—মন্দিরের পেছনেই একটা পুকুর আছে, সেখানে গেল জল আনতে। ভাল, পরিষ্কার জল —

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিলে বলল-খাবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলেছিলাম আর খাবার এসে গেল—এর ভেতর কিন্তু অলৌকিক কিছু নেই। এই লোকটির একটা ময়রার দোকান আছে গ্রামে, গতকালও আমাকে খাবার দিয়ে গিয়েছিল। অতিথিসেবা করতে ভালবাসে। পয়সা দিতে চেয়েছিলাম—নেয়নি। আজকের খাবারও দিতে বলা ছিল। যা খাবার দেয় তা আমি একা খেতে পারি না, আজও দুজনের হয়ে যাবে এখন। দেখি কী দিয়েছে-

উঠে গিয়ে যেখানে সে শুয়েছিল সেখান থেকে একটা

কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে এল অমর। তার ভেতর থেকে একটা মোমবাতি বের করে বলল—দেখি, দেশলাইটা আর একবার দাও–

শালপাতার ঠোঙা খুলে দেখা গেল ভেতরে গোটা পনেরো বড় মাপের পুরী, আলুর তরকারী, আর অনেকখানি মোহনভোগ। দেশী ঘি দিয়ে তৈরি, দারুণ গন্ধ বেরুচ্ছে। তখনো গাঁয়ের দিকে খাবারে ভেজাল দেবার কথা কেউ ভাবতে পারত না।

জল ভরে মেটে কলসীটা নিয়ে ফিরে এল ময়রা। আমাদের পাশে নামিয়ে রেখে বলল—এই জল রইল। এ খাবারে হয়ে যাবে তো? নাকি আর কিছু এনে দেব?

খাবারের প্রাচুর্য সম্বন্ধে তাকে আশ্বস্ত করে বিদায় করা হ'ল। অমর বলল—অন্ধকারে গল্প করা যাবে, কিন্তু খাওয়া যাবে না। মোমবাতি বেশি পুড়িয়ে লাভ নেই, এসো খেয়ে নেওয়া যাক–

অমর খুব কম খায়। মাত্র চারখানি পুরী সে খেল, বাকি সবগুলো খেতে হল আমাকে। অবশ্য পথ হেঁটে আমার খিদে

পেয়ে গিয়েছিল। কলসী কাত করে কানায় হাত দিয়ে জল খেলাম। তারপর মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে অমর বলল—এসো, এইবারে গল্প করি।

অন্ধকারের ভেতর থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল। কত গল্প সে শোনাল সারারাত ধরে। তেমন কথা আমি কারও কাছে কখনও শুনিনি। সাধারণ ডাল-ভাত খাওয়া জীবনের কথা নয়, যেন অচেনা ভাষায় অচেনা সুরে অদ্ভুত গান শোনাচ্ছে কেউ। আকাশ আর নক্ষত্রের গল্প, সমুদ্রের ঢেউয়ের গল্প, আগুন-বাতাস-পাহাড়-মাটির গল্প। সে। আমি তোমাদের ভাষা দিয়ে ঠিক বোঝাতে পারব না। সৃষ্টির আদিম গল্প সে, আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবনে তার কোনও প্রতিচ্ছবি হয় না। সেই রাতের কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। কথা বলতে বলতেই অমরজীবন হঠাৎ বলল–তোমার ছোট ঠাকুর্দা গৃহত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, না? উনি এখনো বেঁচে আছেন।

আশ্চর্য তো! কী করে সে কথা জানলো এই লোকটা? কিন্তু তখন আমার এত ঘুম পেয়েছে যে, যথেষ্ট অবাকও হতে পারলাম না।

তখন রাত বোধহয় তিনটে পেরিয়ে গিয়েছে, অমর বলল—না, আর কথা না। এবার তুমি ঘুমোও। বাড়ি চলে যেও কিন্তু। কালকেই। তোমার ভালর জন্যই বলছি।

আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছে। বললাম—আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে। যাবেন?

—না, এবার না। এবার থাক। তবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে আমার।

আমার কানে যেন কে নিদুলির মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। আর তাকাতেই পারছি না। ঘুম-ঘুম।

যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদুর উঠে গিয়েছে। গতকাল রাত্তিরের মেঘ-বৃষ্টির চিহ্ন নেই কোথাও, ঝকঝক করছে দিনের আলো।

পাশে অমরজীবন নেই। তার ঝোলাঝুলিসহ কখন সে চলে গিয়েছে কে জানে।

কাল সন্ধেবেলা দেখা সেই পুরোহিত এসে মন্দিরের

দরজা খুলে সকালের পুজোর উদ্যোগ করছে। আমার দিকে আড়ে আড়ে তাকাল কবার। জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, এখানে যে আর একজন পরশু থেকে ছিলেন, তিনি চলে গিয়েছেন?

সে বলল—কে ছিলেন?

—একজন যাত্রী। আমার আগে থেকেই তো ছিলেন—

–দেখিনি। খেয়াল করিনি। অমন কত লোক যাচ্ছে আসছে—

লোকটি শুধু নীরস নয়—নিরুৎসুক, নিরুদ্বেগ এবং সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ।

যাই হোক, অমরজীবন লোকটিকে আমার খুবই অদ্ভুত লেগেছিল, তার কথা অমান্য করতে মন চাইল না। সেদিনই রওনা হলাম বাড়ির দিকে। বাড়ি পৌঁছনোর পর প্রতিবারের মতই প্রথমে বাবার বকাঝকা, তারপরে মায়ের কান্নাকাটি, এবং তারও পরে আত্মীয়স্বজনের আবেগের বন্যা সহ্য করতে হ'ল। দুপুরে খেতে বসে বাবা বললেন—গত পরশুদিনই সরসী চাটুজ্জের আড্ডায় তোমার কথা হচ্ছিল। আমার যে একটা

এমন বাড়িপালানো হাড়জ্বালানো ছেলে হবে সে কথা অনেক আগেই একজন বলে দিয়েছিল—

বললাম–কে? কোনও জ্যোতিষী?

—না। এমনিই একজন পথিক। আমার ছোটবেলায় একদিনের জন্য আমাদের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিল। তার নাম অমর, অমরজীবন। সেই গল্পই হচ্ছিল সরসী চাটুজ্জের বাড়ি

চমকে উঠে বললাম—অমর! অমরজীবন!

বাবা বললেন—হ্যা! চমকে উঠলে কেন?

—না, কিছু না। গল্পটা বরং বলুন, শুনি—

খেয়ে উঠে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে বাবা বলতে শুরু করলেন।

নিজের বাবার কাহিনী লেখকের বর্ণনার ভঙ্গিতে বলে গেল তারানাথ। তারপর থেমে একটু দম নিয়ে বলল—এই ব্যাপারটার সবচেয়ে বিচিত্র দিক কোনটা জানো? যে লোককে

চল্লিশ বছর আগে বাবা পঁয়তাল্লিশ বছরের দেখেছিলেন, তাকে এতকাল পরে আমিও সেই বয়েসে দেখলাম কী করে?

ছোট ঠাকুর্দার খবরটা বাবাকে জানাবো ভেবেছিলাম, দেখলাম অমরজীবন মারফৎ সেটা তিনি আগেই জানেন।

পরদিন বুঝলাম কেন অমরজীবন বাড়ি চলে আসতে বলেছিল। পরদিন থেকে আমার এল প্রবল জ্বর। প্রায় দেড়মাস ভুগে সেরে উঠলাম। পথে থাকলে প্রাণসংশয় হত সন্দেহ নেই।

পঞ্চম

পাসিং শো ধরাবার জন্য

পাসিং শো ধরাবার জন্য তারানাথ থামল।

বাইরে সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। মন্টু লেনের একটু ভেতরদিকে তারানাথের বাড়ি, এখান থেকে বড়রাস্তার কোলাহল আর গাড়িঘোড়ার শব্দ খুব আবছাভাবে শোনা যায়। কলকাতার পুরনো গৃহস্থপাড়ায় দিনাবসানের একটা আলাদা মেজাজ আছে, কলকাতার বনেদি বাসিন্দারা সেটা টের পায়। তারানাথের বাড়িতে বসে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারা যায়।

তারানাথ বলল-আর একটু চা বলি, কি বল?

কিশোরী বলল বেশ তো, বলুন। ততক্ষণে আমি বরং গলির মোড় থেকে গরম তেলেভাজা নিয়ে আসি। তেলেভাজা আর চা একসঙ্গে না হলে আবার আড্ডা কী?

–আরে না না, কেন আবার ওসব ঝামেলা—

তারানাথের আপত্তিতে কর্ণপাত না করে কিশোরী বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই সে ফিরে এল হাতে বেশ বড় মাপের এক শালপাতার চাঙাড়ি নিয়ে।

-কী হে! এতসব কী এনেছ?

তারানাথের সামনে চাঙাড়ি নামিয়ে কিশোরী বলল— একেবারে সদ্যভাজা বেগুনী, ঝালবড়া আর মোচার চপ। কিছু আমাদের জন্য রেখে বাকি ভেতরে পাঠিয়ে দিন

চারি চা নিয়ে এল। আমরা বেগুনীতে কামড় দিয়ে গল্পের আশায় উৎসুকভাবে তারানাথের দিকে তাকালাম। হাত দেখা বা কোষ্ঠীবিচার জানি না, কাজেই তারানাথ কত বড় জ্যোতিষী বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। যে গল্প সে

আমাদের শোনায় তার সত্যাসত্য বিচারও দুঃসাধ্য, কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে—গল্প বলে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখার ক্ষমতায় তারানাথ অদ্বিতীয়। বাড়ির বাইরে জ্যোতিষ কার্যালয়ের সাইনবোর্ডটা বিবর্ণ হয়ে ঝুলে পড়েছে, পুরনো কয়েকজন বাঁধা খদ্দের ছাড়া আজকাল ভাগ্যগণনায় আগ্রহী নতুন লোক বড় একটা ভিড় করে না। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে তারানাথের ব্যবসায় ভয়ানক মন্দা চলেছে। তাতে তারানাথের বিশেষ উদ্বিগ্নতা কিছু নেই, আর আমাদের তো ভালই হয়েছে। একদিন তারানাথ নিজেই বলল-বরাকর নদীর ধারে বালির চড়ায় পোড়া শোলমাছের নৈবেদ্য দিয়ে মধুসুন্দরী দেবীকে অর্ঘ্য দিয়েছিলাম, সে গল্প তত তোমাদের বলেছি। সেই রাত্তিরেই নদীর ধারের শালবনে স্নান অপার্থিব জ্যোৎস্নায় দেবী আবির্ভূত হলেন। সেই অলৌকিক সৌন্দর্য মানবীর হয় না, সেই ভালবাসা পৃথিবীর নারীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রায় এক বছর ধরে বরাকর নদীতীরের শালবন আমার তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল। রোজ রাত্তিরে দেবী দেখা দিতেন। আমি চরিত্রের দিক দিয়ে শুকদেব নই, কামনা-বাসনাহীন ঋষিও নই। কাজেই মহাডামরতন্ত্রে মাতৃরূপে বা কন্যারূপে যে দেবীদের পাওয়া যেতে পারে তাদের জন্য সাধনা করিনি। গুরু বলেছিলেন কন্যারূপে কনকবতী দেবীর আরাধনা করতে। আমার সে পরামর্শ মনঃপূত হয়নি।

মধুসুন্দরী দেবীকে প্রেমিকা হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু–

তারানাথ একটু থামল।

জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কী?

আমরা সাধারণ মানুষ রে ভাই, প্রেমিকা হিসেবে দেবীকে সামলানো কি আমাদের পোষায়? মানুষ-বৌ নিয়েই জেরবার হতে হয়। কিন্তু এটা ঠিক, সাধকের জীবনকে দেবী স্বর্গীয় প্রেমসুধায় পূর্ণ করে দেন—

কিশোরী বলল—স্বর্গীয় বলছেন, এঁরা কি স্বর্গের দেবী?

–না। একেবারেই না। মহাডামরের এক বিভাগ হচ্ছে ভূতডামর। ভূতডামরে এইসব জীবেদের উল্লেখ আছে। এরা মানুষও নয়, আবার সাধারণ অর্থে প্রেতও নয়। দেবতা তো নয়ই। ভূত বলতে লোকে বোঝে পরলোকের অধিবাসী, মানুষ মরে যেখানে যায়। ভূতডামরে যাদের উল্লেখ রয়েছে, তারা মানুষ এবং তথাকথিত ভূতপ্রেতের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত জগতের বাসিন্দা। আজন্মকাল লালিত আমাদের শুভ ও অশুভের বোধ, মঙ্গলের ধারণা, ন্যায়-অন্যায়, পবিত্রতা–কিছুই

সেখানে খাটে না। আজ যে দেবীর মহিমা নিয়ে আমাকে সেবা ও প্রেমে ধন্য করছে, মন্ত্র ও সাধনায় সামান্য ত্রুটি হলে পিশাচীর মত সে আমাকে ধ্বংস করবে। এদের প্রেমও চরম, প্রতিহিংসাও চরম।

বললাম—প্রতিহিংসা কীসের? সাধক তো কোনো অন্যায় করেনি–

–করেছে বইকি। তোমাকে যদি কেউ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে খাটিয়ে নেয় তাহলে কি তোমার খুব ভাল লাগবে? তেমনি বিপুল ক্ষমতাশালী ডামরীদের তুমি মন্ত্রের বাঁধনে আটকে তোমার ইচ্ছেমত কাজ করাচ্ছ, এতে কি তারা খুশি হচ্ছে? তা নয়। কিন্তু অসহায়ের মত তারা তোমার ক্রীতদাস হয়ে আছে। আত্মরক্ষার বর্মে এতটুকু ছিদ্র পেলে তারা তোমাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। আমি নিজে দেখেছি—

তারানাথ যেন একটু শিউরে উঠে থেমে গেল।

কিশোরী জিজ্ঞেস করল-কী দেখেছেন?

—অসাবধানী সাধকের মর্মান্তিক পরিণতি। মাথাটা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল—

বিষয়টি মুখরোচক নয়। আগ্রহ হলেও আর কোনো প্রশ্ন করলাম না।

তারানাথ বলল-বাড়ির লোক খবর পেয়ে আমাকে গিয়ে ধরে আনে। তখন আমার পাগলের মত দশা। কত মাস চুল-দাড়ি কাটিনি, বড় বড় নখ, শতছিন্ন জামাকাপড়, গায়ে ময়লা। বাড়ি ফিরে আসবার আগের রাত্তিরে শেষবারের মত দেবী আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কিছু শক্তি তোমাকে দিলাম। যদি বুঝে ব্যবহার করতে পার তাহলে জীবনে অন্তত ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। আমার সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই সম্ভব, যদি না–

কীভাবে দেখা হতে পারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। দেবী উত্তর দেননি।

যাই হোক, আমার সাংসারিক অবস্থা তো দেখছ। কিন্তু দেবীর আশীর্বাদে একরকম করে চয়ে যায়। বড়লোক হতে পারিনি, কিন্তু ভিক্ষেও করতে হয়নি।

কিশোরী বলল–আমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার প্রথমদিকে আপনি বীরভূমের শ্মশানবাসিনী মাতু পাগলীর কাহিনী বলেছিলেন। তার সঙ্গেও পরে আর দেখা হয়নি?

তারানাথ বলল—না। তবে আমার মনে হয় মাতু পাগলী, তন্ত্রে উল্লিখিত ডামরী, মধুসুন্দরী দেবী—এঁরা সব আসলে একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। মাতু পাগলী ছেড়া কাপড় পরে গ্রামের শ্মশানে বসে থাকত বটে, কিন্তু সে বিশাল শক্তির অধিকারিণী ছিল। এখন আমার মনে হয় সে মানুষ ছিল না। আমার খুব সৌভাগ্য তাই তার দেখা পেয়েছিলাম।

বললাম—মানুষ ছিল না বলছেন, তাহলে সাধারণ মানুষের মত হাটে-মাঠে পড়ে থাকত কেন?

–মাতু পাগলী যে পর্যায়ে উঠেছিল, সেখানে পৌঁছলে পার্থিব সুখৈশ্বর্য তুচ্ছ হয়ে যায়। শ্মশানে থাকলেও যা, রাজপ্রাসাদে থাকলেও তাই। সেসময় একটা গুজব শুনেছিলাম লোকের মুখে, তখন বিশ্বাস করিনি। শুনেছিলাম মাতু পাগলী নাকি আহার্য বা পানীয় গ্রহণ করে না। পরে ভেবে দেখেছি, সত্যিই তো, এক একদিন সকাল থেকে গভীর রাত্তির পর্যন্ত

তার সঙ্গে কাটিয়েছি, কখনও তার সামান্য জলও খেতে দেখিনি। ছায়াটা অবশ্য খেয়াল করিনি, তখন জানতামও না–

কিশোরী বলল—ছায়া খেয়াল করা কী রকম?

—গ্রামাঞ্চলে প্রবাদ আছে জানো তো, প্রেত-পিশাচের নাকি ছায়া পড়ে না। কথাটা আংশিক সত্য, পুরোটা নয়। তাদেরও ছায়া পড়ে ঠিকই, কিন্তু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়ে না। একটু জলমেশানো ভেজাল ছায়া পড়ে। অভিজ্ঞ সাধক দেখলে বুঝতে পারে।

ভেজাল ছায়া! কতরকম অদ্ভুত কথাই যে শুনলাম তারানাথের কাছে!

তারানাথ অনেকসময় মানুষের মুখ দেখে নির্ভুলভাবে মনের কথা আন্দাজ করে ফেলে। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল—বিশ্বাস করা কঠিন, না? ভাবছ, এ বুড়ো কীসব আবোলতাবোল বকে আসর জমাবার চেষ্টা করে। ব্যাপার অত সোজা নয়। দেবীর দয়ায় আর গুরুর আশীর্বাদে কিছু গুণ লাভ করেছিলাম, এসব তারই প্রকাশ। বলেছি বোধহয় তোমাদের-আমার তন্ত্রদীক্ষা হয়েছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের

সময়ে। গলায় পদ্মবীজের মালা পরে গুরু যখন বিরজা হোমের পূর্ণাহুতি দিলেন, তখন আকাশে গ্রহণগ্রস্ত সূর্য তাম্রাভ চাকার মত বিবর্ণ আর ম্লান দেখাচ্ছে। গুরুই বলেছিলেন—খুব শুভযোগে তোমার দীক্ষা হল। অনেক ক্ষমতা লাভ করবে তুমি–

বললাম-বিরজা হোম কী?

—সংসার ত্যাগ করে তবে সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করতে হয়। দীক্ষার পরমুহূর্ত থেকে সাধকের আর কোনও সামাজিক পরিচয় থাকে না। এমন কী, বাবা-মায়ের শ্রাদ্ধ করার অধিকার থেকেও সে বিচ্যুত হয়। দীক্ষার সময় যে বিশেষ যজ্ঞের মাধ্যমে নিজের শ্রাদ্ধ করতে হয়, তারই নাম বিরজা হোম।

বললাম—নিজের শ্রাদ্ধ করার সময় আপনার মন খারাপ হয়নি?

—খুব সামান্য। সাধনার জন্য যত ব্যগ্রই হওয়া যাক না কেন, ওটুকু মানুষী দুর্বলতা থেকেই যায়। সমাজ ও সংসারের প্রতি স্বাভাবিক যে টান। শ্রাদ্ধের চেয়ে বেশি খারাপ লেগেছিল

পৈতেটা ত্যাগ করতে। সেই সময়টায় বুঝেছিলাম আজন্মলালিত বিশ্বাস ও সংস্কার কতখানি গভীরে শেকড় গেড়ে থাকে।

—পৈতে কেন ত্যাগ করতে হয়?

—বিরজা হোমের পরে তুমি আর কারও সন্তান নও, তোমার কোনও সামাজিক সম্প্রদায় নেই। তুমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র কিছুই নও। তুমি কেবল একজন সাধক। পৈতে থাকলে বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসেবে তোমার অহংবোধ জন্মায়। সাধনার ক্ষেত্রে তা অমার্জনীয়।

বললাম—এখন তো আপনি পৈতে ধারণ করে আছেন। কেন?

তারানাথ হেসে বলল—আবার গৃহাশ্রমে ফিরে এসেছি, সেও তো বেশ অনেক বছর হয়ে গেল। মনে মনে গুরুর কাছে ক্ষমা চেয়ে পিছিয়ে এলাম। দেখলাম ভেতরে ভেতরে আমার ভোগবাসনা আর সংসার করার কামনা পুরোপুরি রয়ে গিয়েছে। দুই নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায় না। দেখলাম ফিরে আসাই ভাল–

—কবে আবার পৈতে নিলেন?

—সেটা বেশ একটা আশ্চর্য ঘটনা। শুনবে?

বলে কী তারানাথ জ্যোতিষী! গল্প শোনার লোভেই তো ছুটির দিনে তার কাছে এসে বসে থাকি। বললাম—অবশ্যই শুনবো। বলুন—

একটা পাসিং শো ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা ছাইদানি হিসেবে রাখা নারকেলের মালায় গুঁজে দিতে দিতে তারানাথ বলল—এতসব অদ্ভুত ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে যে, ভাবলে আমার নিজেরই অবাক লাগে। আর তোমরা তো নিশ্চয় ভাবো লোকটা নির্বিকার মুখে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলে। তোমাদের দোষ দেওয়া যায় না, এসব কাণ্ড বিশ্বাস করা প্রকৃতপক্ষেই কঠিন।

তারানাথ খুব একটা বাজে কথা বলে নি। অদ্ভুত গল্পের নেশায় তার কাছে ছুটে আসি, যতক্ষণ সে গল্প বলে ততক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেও যাই, কোনও বিরুদ্ধ যুক্তি মনে উঁকি দেয় না। কিন্তু তার সান্নিধ্যের প্রবলতা থেকে মুক্তি পেয়ে গল্পের

শেষে মন্টু লেনের বাইরে এসে কলকাতার কঠিন ফুটপাথে পা দিলেই বিশ্বাস একটু একটু করে ক্ষইতে শুরু করে। মুগ্ধতা থাকে, বিশ্বাসটা থাকে না। তবু পরের সপ্তাহে আবার যাই। গল্পের এমনই নেশা।

তারানাথ বলল—এ ঘটনা আমার প্রথম জীবনের। আজ থেকে প্রায় তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। দীক্ষা নিয়েছি তা আট-দশ বছর হয়ে গেল, কিন্তু মনের ভেতর কোনও প্রসন্নতা অনুভব করি না। গুরুর প্রদর্শিত পথে সাধনা করবার চেষ্টা করি, আর হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়াই।

এমনি ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুরের কিছু পরে ক্লান্ত হয়ে একটা নদীর ধারে কঁকড়া এক বটগাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলাম। জায়গাটা ভারি শান্তিপূর্ণ, নদী বয়ে যাচ্ছে সামনে, মাথার ওপরে নানা ধরনের পাখির বিচিত্র ডাক। একটু বিশ্রাম করে নদীতে নেমে হাতমুখ ধুয়ে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হলাম। এখনও বেশ রোদ, কিছুক্ষণ গাছের ছায়ায় শুয়ে থেকে তারপর পথ হাঁটলেই হবে। নদী থেকে উঠে এসে গাছের একটা শেকড়ে মাথা দিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। ভবঘুরে জীবনের এই একটা সুন্দর দিক—কোনও দায়দায়িত্ব কিচ্ছু নেই, মুক্ত আনন্দে ঘুরে বেড়াও, ইচ্ছে হলে কোথাও দু-

দিন থাকো, ইচ্ছে না হলে আবার বেরিয়ে পড়ো পথে। ভারি আনন্দের জীবন, চমৎকার জীবন–

বললাম—তাহলে আর সংসারের এই বন্ধনের মধ্যে ফিরলেন কেন?

একটু চুপ করে থেকে তারানাথ বলল—আগেই তো বলেছি সত্যিকারের বড়মাপের সাধক হওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। জগৎব্যাপারে বিশাল মুক্তির মধ্যে চিরতরে নিজেকে যুক্ত করতে গেলে শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। তবু বলি, জীবনের ওই কটা বছর বড় আনন্দে, বড় শান্তিতে কাটিয়েছি।

ঠাণ্ডা ছায়ায় শুয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে বোধহয় একটু ঘুম এসে গিয়েছিল। চটকা ভেঙে যেতে দেখলাম বেলা গড়িয়ে গিয়েছে, সূর্যাস্ত হতে আর খুব দেরি নেই। পথে শুনেছি আরও মাইল চারেক গেলে পড়বে জয়তলা গ্রাম। সেখানকার মুখুজ্যে জমিদাররা যাত্রীদের জন্য অতিথিশালা করে রেখেছেন। সেখানেই রাত্তিরটা থাকবো। এখনই হাঁটতে শুরু করা দরকার, কারণ চার মাইল যেতে কম সময় লাগবে না।

নদী বাঁদিকে রেখে চলেছি, সন্ধের পরে পরেই জয়তলা পৌঁছে যাব। হঠাৎই কেন যেন বাঁদিকে তাকালাম। তাকানোমাত্র এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

সূর্য দিগন্তরেখা প্রায় ছুঁয়েছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ডুবে যাবে। সেই অস্তোন্মুখ রক্তবর্ণ সূর্যের গোলক ঘিরে একটা ঘোর কালো বৃত্ত! গতকালও এখান থেকে বারোতেরো মাইল দূরে একটা গ্রামের বাইরের মাঠে বসে সূর্যাস্ত দেখেছি। কই, এমন কিছু চোখে পড়েনি তো! কালো মেঘ বা বাতাসে হঠাৎ জমে ওঠা কালোরঙের ধুলো বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এ একেবারে অন্যরকম। আকাশের গায়ে যেন একটা মোটা, চওড়া কালো অন্ধকারের গণ্ডী। অমঙ্গলের অগ্রদূত।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করল-অমঙ্গলের অগ্রদূত বলছেন কেন? জিনিসটার তো প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাও থাকতে পারে–

-না, তা পারে না। আসলে তোমরা ব্যাপারটা দেখ নি, দেখলে বুঝতে পারতে। দেখতে পেতে না অবশ্য, ওটা কেবল আমার কাছেই দৃশ্যমান হয়েছিল। সেটাও একটা বড় প্রমাণ যে, এর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হয় না–

—আর কেউ দেখতে পায়নি বুঝলেন কী করে?

–ওসব গ্রাম জায়গা, কেউ অমন অদ্ভুত কিছু দেখতে পেলে মুহূর্তে তা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ত। জয়তলা গ্রামের দিকে হাঁটছি, চাষীরা দিনের কাজ সেরে বাড়ির দিকে ফিরছে, রাখাল ছেলেরা গরুর পাল তাড়িয়ে গ্রামে যাচ্ছে। আমি ছাড়া তারা কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

বললাম—আপনি ভয় পেলেন কেন? ওই কালো বৃত্তের মানে কী?

—ওর মানে আমার প্রতি কেউ তন্ত্রোক্ত অভিচার ক্রিয়া প্রয়োগ করেছে। কেউ আমার ভয়ঙ্কর ক্ষতি করতে চায়, পারলে প্রাণহানি করতে চায়। কিন্তু কে? কেন সে আমার ক্ষতি চায়? এসব জানবার জন্য ঠিক করলাম জয়তলা পৌঁছে একটু বেশি রাত্তিরে মনোদর্পণে বসব—

কিশোরী বলল—মনোদর্পণ আবার কী?

—তোমরা তো জান আমি চন্দ্রদর্শনে সিদ্ধ। বুড়ো আঙুল দিয়ে কান ও দুই তর্জনী দিয়ে চোখ টিপে ধরে মনোসংযোগ

করে একটি মন্ত্র রোজ এক হাজারবার জপ করতে হয়। যেদিন সিদ্ধিলাভ হবে সেদিন দেখতে পাবে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, আর নিচে একটি গাছের তলায় দুজন পরী দাঁড়িয়ে। তুমি যা প্রশ্ন করবে পরীরা তার উত্তর দিয়ে দেবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার অজানা কিছু থাকবে না। প্রশ্ন করার পরেই পরী, চাঁদ সব মিলিয়ে। গিয়ে সামনেটা বায়োস্কোপের পর্দার মত খালি হয়ে যাবে। তুমি যা জানতে চাও, তা সেই পর্দায় ছবির মত ফুটে উঠবে। একেই বলে মনোদর্পণ।

–বাঃ, এ তো ভাল মজা! এতে তো ইচ্ছে করলে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী আর ধনী মানুষ হওয়া যায়! আগামীকাল রেসের মাঠে কোন ঘোড়া জিতবে, কোন শেয়ারের কত দর থাকবে—এই জানলেই তো রাজা! তাছাড়া নিজের বিপদ-আপদ, মেয়ের বিয়ে—সবই তো পরীরা বলে দেবে। আপনি রোজ বসেন না কেন মনোদর্পণে?

তারানাথ হাসল। বলল—খুব বড় আর মূল্যবান প্রশ্ন করেছ। ঠিকই তো, সপ্তাহে একবার করে আসনে বসলেই আমার আর কোনও অভাব থাকবে না। আমার সাংসারিক অবস্থা তো দেখছই, প্রতিদিনের চিন্তা প্রতিদিন করতে হয়। তাহলে রাজা হবার এমন সহজ উপায় গ্রহণ করছি না কেন?

না, তা করা যায় না। এইখানেই সাধকের পরীক্ষা। ক্ষমতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সংযম অভ্যেস না করলে ক্ষমতা চলে যায়। প্রথম জীবনে শক্তি পাবার দম্ভে এসব অনেক করেছি, পরে সচেতন হয়ে সাবধান হয়ে যাই। লোভ আর প্রকৃত সাধনা একসঙ্গে হয় না।

সন্ধের কিছু পরে পরেই জয়তলা গ্রামে পৌঁছলাম। মুখুজ্যেরা কোনও একসময়ে বর্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তাদের অবস্থা ভাল নয়। বিশাল বাড়ি মেরামতির অভাবে জীর্ণ হয়ে এসেছে। কোথাও দেয়ালের পলস্তারা খসা, কোথাও কার্নিশে বটগাছের চারা। কিন্তু সব মিলিয়ে মানুষজনের আচরণে বনেদিয়ানার ছাপ। বারবাড়িতে দেউড়ির পাশে লম্বা কাছারিঘর, সন্ধের পর এখন আর সেখানে অন্য কর্মচারী কেউ নেই, কেবল সামনে লণ্ঠন নিয়ে প্রৌঢ় নায়েবমশাই বসে কী হিসেব দেখছেন। আমি গিয়ে দাঁড়াতে খেরো থেকে মুখ তুলে বললেন—কে? কী চাই?

নাম বললাম। রাত্তিরটুকু থাকতে চাই তাও জানালাম।

নায়েবমশাই বললেন—অতিথিশালায় ভাল ঘর দিয়ে দিচ্ছি। একটা সিধে দিচ্ছি, তাতে চাল ডাল আলু ঘি লবণ

থাকবে। আর আধসের দুধ। সারারাত জ্বলবার মত তেলভরা লণ্ঠন দেওয়া হবে। রঘু-রঘু!

একজন কর্মচারী এসে দাঁড়াল। নায়েবমশাই বললেন—এই একজন অতিথি এসেছেন। এঁকে অতিথিশালায় নিয়ে যাও। পূবের ভাল ঘরটা দেবে।

রঘু আমাকে নিয়ে গিয়ে ঘর খুলে দিল। মাঝারি ঘর। একটা ন্যাড়া তক্তাপোষ আছে, তাতে বিছানাপত্র কিছু পাতা নেই। সে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে, অন্যের ব্যবহার করা বিছানায় বা চাদরে আমার শুতে ভারি অস্বস্তি হয়। রঘু বলল-বারান্দায় কাঠের জ্বালের উনুন আছে ঠাকুরমশাই, আর ওইদিকের কোণের ঘরে চ্যালা করা শুকনো জ্বালানি কাঠ আছে, যত দরকার হয় নিয়ে নেবেন—

সিধে এসে গেল। রান্না করতে করতে এই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে, বিপদ প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। বড় মাপের বিপদ। বললাম—কী করে বুঝলেন? কোনও অনুভূতি হল?

তারানাথ বলল—আমার লণ্ঠনের আলো ম্লান হয়ে কমে

আসতে লাগল। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো বা তেল ভরে দিতে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু লণ্ঠন হাতে তুলে নাড়িয়ে দেখলাম —ভেতরে কলকল করে তেল নড়বার শব্দ হচ্ছে। বনেদি জমিদারবাড়ির কেতাদুরস্ত কর্মচারী, এমন ভুল করবে না। তাহলে?

একটা কেমন ভেজা-ভেজা, সোঁদা গন্ধ আসছে নাকে। চামচিকের নাদি-ভর্তি ঘর বহুদিন বন্ধ থাকার পর খুললে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়। ভাল নয়, একেবারেই ভাল নয়। মনে মনে অপদেবতা তাড়াবার মন্ত্র পাঠ করতে লাগলাম—ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ, অপসর্পন্তু তে সর্বে গৃহাদস্মাচ্ছিবাজ্ঞয়া।

আস্তে আস্তে আলো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, গন্ধটাও চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়া করে অতিথিশালার বারান্দায় বসে একটা বিড়ি খেলাম। গ্রামাঞ্চলে সাড়ে-আটটা নটার মধ্যেই নিযুতি রাত হয়ে পড়ে। কোথাও মানুষজনের কোনও সাড়া নেই, কেবল দূরে কতগুলো কুকুর ডাকছে। পথ হেঁটে আমিও ক্লান্ত। কিন্তু ঘুমোলে তো চলবে না। এখন দেহবন্ধন করে

আসনে বসে মনোদর্পণে দেখতে হবে কে আমার ক্ষতি করতে চায়—এবং কেন?

চন্দ্রদর্শন আমার এমন আয়ত্তে এসে গিয়েছিল যে, চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র আর দুই পরীদের আনতে দশ মিনিটও লাগল না। মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রশ্ন করতেই সামনে পরী, চাদ সব মুছে গিয়ে সাদা দেয়ালের মত শূন্যতা ফুটে উঠল। চৌকো সেই পর্দা থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে একটা ভয়াবহ হিংস্র মুখ। মাঝখানে সিঁথি করা লম্বা কোঁকড়ানো চুল, কপালে তেল-সিঁদুরের ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় রুদ্রাক্ষ আর হাড়ের মালা। খুব নিম্নমার্গের সাধক-মুখে সাধনার জ্যোতি নেই, রয়েছে ক্রোধ আর নিবিড় হিংসা। এদের উপকার করার ক্ষমতা নেই, কিন্তু অপকার করার ক্ষমতা অসীম।

লোকটাকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! কোথায় দেখেছি একে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল! পাঁচ-সাত বছর আগে সেই চড়ইটিপ গ্রাম! আমার বাল্যবন্ধু। বিরাজমোহনের সর্বনাশ করবার জন্য একজন কাপালিক শ্বেতবগলার পূজোর

আয়োজন করেছিল। কাকের বাসার কাঠি দিয়ে, ঘোড়ার চর্বি দিয়ে যজ্ঞ করার নিয়ম। বিরাজের নাম লেখা একটা নিমপাতা যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিলেই একমাসের ভেতর উদ্দিষ্টের মৃত্যু। আমার হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা বানচাল হয়ে যায়। বিরাজের নিজের দাদাই সম্পত্তির লোভে ভাইয়ের প্রাণহানির জন্য কাপালিককে নিয়োগ করেছিল। পরে ব্যাপারটা খুব ভালভাবে মিটে যায়, দুই ভাইয়ে আবার মিলন হয়ে যায়। কিন্তু ব্যর্থ-মনস্কাম কাপালিক চলে যাবার সময় আমাকে বলে গিয়েছিল কাজটা ভাল করলে না। একজন সাধক কখনও অন্য সাধকের ক্রিয়ায় বাধা দেয় না। তা নিয়ম নয়। আজ হোক, দশ বছর পরে হোক, এর প্রতিফল তোমাকে পেতেই হবে। তৈরি থেকো—

আমি বলেছিলাম—আপনার সাধনা বা কৌলিক ক্রিয়াকর্মে বাধাদান করার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আপনি তো সজ্ঞানে একজন নিরীহ মানুষের সর্বনাশ করার। জন্য অভিচার ক্রিয়ার আয়োজন করেছিলেন। এরকম প্রচেষ্টার কথা জানতে পারলে সর্বশক্তি দিয়ে তা নিবারণের ব্যবস্থা করতে বলেছেন আমার গুরু।

চোখে আগুন ফুটিয়ে সে বলল—বেশ, আমাকে মনে

রেখো।

মনে রাখিনি, ভুলে গিয়েছিলাম। আজ মনোদর্পণে এতদিন পরে তাকে আবার দেখে চিনতে পারলাম।

একটু পরেই কাপালিকের চেহারা মিলিয়ে গেল সামনে থেকে। যাক, কী ব্যাপার জানতে পেরেছি। আগামী পরশু কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী, ওই দিন একটু আসনে বসে পূজা করব। কাপালিক বুঝতে পারবে কার সঙ্গে সে লাগতে এসেছে।

কিশোরী বলল—কেন, কী ক্রিয়া করবেন আপনি? ও বীজমন্ত্র ছাড়া প্রকরণ বলছি, শুনে রাখো। কালো ছাগল, ঘোড়ার খুড়ের কাছের ললাম, কালো মুরগি আর কাকের চারটে করে পালক আগুনে পুড়িয়ে, তিসির তেলে গুলে বাঁহাতের কড়ে আঙুল দিয়ে কপালে তিলক লাগিয়ে পূজার আসনে বসলে যে আমার ক্ষতি করতে চাইছে তার সব কাজ ব্যর্থ হবে। লোকটা মারা পড়বে না ঠিকই, কিন্তু দেহে ও মনে বিরাট ধাক্কা খাবে।

–বীজমন্ত্রটি কী?

তারানাথ কিশোরীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল—গল্প শোনো, গল্প শোনো—

ঘরে এসে তক্তাপোষে শুলাম। মেঝেতে লণ্ঠনটা কমিয়ে রাখা আছে। নরম, মৃদু আলোয় আবছা আবছা সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। পথ হেঁটে ক্লান্ত ছিলাম, একটু বাদেই ঘুম এসে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ চটকা ভেঙে তাকিয়ে দেখি ঘরের ভেতরে নিকষ অন্ধকার। এটা কেমন হল? লণ্ঠনে যথেষ্ট তেল আছে, সে তো আমি নিজেই দেখে নিয়েছি। যাক, নেমে জ্বালিয়ে নিচ্ছি।

কিন্তু ঘরের মধ্যে এমন দমবন্ধ করা ভ্যাপসা ভাব কেন? সবকটা জানালা কে বন্ধ করে দিল? জানালা তো ভোলাই ছিল! এই ধরনের উপদ্রব দূর করার সহজ উপায় আর মন্ত্রগুলো অকস্মাৎ কিছুই মনে আসছে না। আলো জ্বাললে মনের জোর ফিরে পাব—আন্দাজে আন্দাজে মেঝেতে নেমে লণ্ঠন আর দেশলাই খুঁজতে গেলাম, কোথাও খুঁজে পেলাম না। তক্তাপোষ থেকে হাত তিন-চার দূরে দরজার পাশে

লণ্ঠনটা ছিল। দরজাটাই বা কোথায়? দেয়ালে হাত দিয়ে সমস্ত ঘরটা একবার পাক দিলাম। জানালা বা দরজা কিছুই হাতে ঠেকলো না!

এ আবার কী! আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে! এই অন্ধকূপে কীভাবে বন্দী হলাম আমি? এই কি তাহলে শেষ?

মনে পড়ল বাবার কথা। বাবা বলতেন-দেখ, চক্কোত্তি বামুনের ছেলে। যেখানে যাও, যা করো, পৈতেটা শরীরে রেখো। ভয় পেলে বা বিপদে পড়লে পৈতে আঙুলে জড়িয়ে গায়ত্রী জপ করতে আরম্ভ করবে। অন্ততঃ প্রাণটা রক্ষা পাবে।

অভ্যাসবশত পৈতে খুঁজতে আরম্ভ করে মনে পড়ল—পৈতে তো সেই কবেই বিরজা হোমের কুণ্ডে বিসর্জন দিয়েছি। হায়! এখন কী হবে?

অন্ধকারের ভেতরেই ঘরের ছাদের কাছ থেকে কী যেন একটা নরম, হাল্কা জিনিস আমার মাথায় পড়ে মেঝের দিকে গড়িয়ে গেল।

প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। তারপর মনে হল টিকটিকি

বা ওইরকম কিছু হবে। পা দিয়ে সরিয়ে দিতে গিয়ে পায়ে ঠেকলো দেশলাইটা। ভাল মজা! এতক্ষণ কিছুতেই পেলাম না, এখন আপনা-আপনি ফিরে এল। দেশলাই জ্বালতেই দেখলাম ঘরের জানালা-দরজা সব যথাস্থানে আছে। আর–

আর পায়ের কাছে মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি সদ্য তৈরি গ্রন্থি দেওয়া পৈতে!

হয়ত গুরু পাঠিয়েছেন আমার বিপদ দেখে। অথবা বাবার আত্মা বুঝতে পেরেছে সন্তানের প্রাণসংশয়, তাই—

যাই হোক, তৎক্ষণাৎ পৈতেটা ধারণ করে গায়ত্রী জপ করতে শুরু করলাম। অবাক হয়ে দেখলাম জানালা দুটোই খোলা ছিল, এখন তা দিয়ে স্নিগ্ধ, শীতল বাতাস আসছে। ঘরের ভ্যাপসা আর দমবন্ধ ভাবটা আর নেই।

জানি না কৌলিক প্রথায় আঘাত করেছি কিনা, কিন্তু সেই থেকে পৈতেটা আর ছাড়িনি। বরাবর ধারণ করে আছি।

ষষ্ঠ

অতিথিশালার পরিচারক রঘু

পরের দিন সকালে অতিথিশালার পরিচারক রঘু এসে ছোট বেতের ধামায় করে চিড়ে আর নারকেল জলখাবার দিয়ে গেল। বাঃ, বেশ নিয়ম তো এদের। অতিথির স্বাচ্ছন্দ্যের। জন্য সর্বদাই ব্যস্ত। বনেদিয়ানা একেই বলে।

জলখাবার খাচ্ছি, এমনসময় রঘু আবার এসে বলল—ঠাকুরমশাই, আপনি কি আজও নিরামিষ খাবেন? কাল রাত্তিরে হঠাৎ কোনও ব্যবস্থা করে ওঠা যায়নি, যদি আমিষ আহারে আপত্তি না থাকে তাহলে তার ব্যবস্থা দেখি—

হেসে বললাম—আপত্তি আর কী, আমি কি বোষ্টম যে

মাছ-মাংস খাব না? কিন্তু ওসব করার দরকার নেই, আমি আজ চলে যাব–

অবাক হয়ে রঘু বলল—চলে যাবেন! কেন?

—যেতে তো হবে, তাই না? অতিথি কি চিরদিন থাকে?

মাথা চুলকে রঘু বলল—সে তো ঠিকই, ঠাকুরমশাই। তবে এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। আপনি জল খান, আমি নায়েবমশাইকে খবর দিচ্ছি—

একটু বাদেই নায়েবমশাই এসে হাজির হলেন। গোলগাল চেহারার মধ্যমাকৃতি মানুষটি। ভারি সজ্জন। হেসে বললেন—ঠাকুরমশাই নাকি আজ চলে যাওয়া স্থির করেছেন? কিন্তু তা তো হবার নয়–

বললাম—সে কী! আমি অতিথি, না বন্দী?

জিভ কেটে নায়েবমশাই বললেন—না না, অমন বলবেন না। বন্দী হতে যাবেন কেন? আসলে আপনি অতিথি হয়ে আছেন শুনে বড়কর্তা আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে

চেয়েছেন। কাল তো দেখা হয়নি–

—এ বাড়ির বড়কর্তা? জমিদারমশাই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব ভাল লোক। থেকেই যান আজকের দিনটা–

থেকে গেলাম। এক এক জায়গায় অতিথি হয়ে থাকতে মন্দ লাগে না। মুখুজ্যেদের বাড়িও তাই। বেশ শান্ত আর স্নিগ্ধ পরিবেশ, ভাঙা কার্নিশে পাখি উড়ে এসে বসছে, বাড়ির ভেতর থেকে উঁচু গলায় কথা বলার কোনও আওয়াজ আসছে না। সবচেয়ে বড় কথা, কর্মচারীরা প্রত্যেকে ভদ্র, কেতাদুরস্ত এবং মিষ্টভাষী। ভৃত্যকে দেখে প্রভুকে চিনতে পারা যায়।

কিছুক্ষণ বাদে রঘু এসে বলল—চলুন ঠাকুরমশাই, বড়কর্তা এসে কাছারির বারান্দায় বসেছেন।

তার সঙ্গে গিয়ে চার-পাঁচ ধাপ টানা লম্বা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতেই বাড়ির কর্তাকে দেখতে পেলাম। দীর্ঘদেহী, ফর্সা মানুষ। উজ্জ্বল বড় বড় চোখ। কোঁকড়ানো চুলে মাঝখানে সিঁথি করা। পরনে তাঁতের ধুতি আর হাতকাটা

বেনিয়ান। বয়েস বছর পঞ্চাশ কী বাহান্ন হবে। যাকে বলে সুপুরুষ। বারবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। হেলান দেওয়া চেয়ারে আধশোয়া হয়ে আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে সোজা হয়ে বসে হাতজোড় করে বললেন- নমস্কার, বসুন। কাল একটু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম, আলাপ করা হয়ে ওঠেনি, তাই নায়েবমশাইকে বললাম—যান, নিয়ে আসুন ওঁকে, একটু গল্প করা যাক। আজ থাকছেন তো?

হেসে বললাম–রাজার হুকুম, মানতেই হবে।

জমিদারবাবুর নাম দেবদর্শন মুখোপাধ্যায়। নামটা কিছু আগে নায়েবমশাইয়ের কাছে জেনেছি। তিনি বললেন—তামাক চলে?

—তা চলে।

–ওরে, কে আছিস! ঠাকুরমশাইকে তামাক দিয়ে যা। চলতি তামাক দিবি না, আমার থেকে দে—

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—একনম্বর গয়ার অম্বুরি, খেয়ে দেখুন দিকি

কেমন লাগে—

যে তামাক এতক্ষণ উনি খাচ্ছিলেন সেটাই যদি একনম্বর গয়ার অম্বুরি হয়, তাহলে জিনিসটা নিঃসন্দেহে ভাল। গন্ধে চারদিক আমোদিত করেছে।

চাকর তামাক দিয়ে গেল। মৌজ করে টানতে শুরু করলাম।

দেবদর্শনবাবু বললেন—রাজার হুকুম শুনলে আজ হাসি পায় বটে, কিন্তু এককালে লোকে আমাদের রাজাই বলত। ভেঙে পড়ছে বটে, তবু বাড়িটা দেখলে হয়ত সেটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন। ঠাকুরদার আমল থেকে পতনের শুরু, আর আজ এই যা দেখছেন।

এসব কথার কোনও উত্তর হয় না। চুপ করে তামাক খেতে লাগলাম।

একটু পরে দেবদর্শনবাবু বললেন—প্রায় দেড়শো বছর আগে আমার পঞ্চম ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ জয়দর্শন মুখোপাধ্যায়

এই গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামেই গ্রামের নাম। সে সময়ে আমাদের প্রতিপত্তি ভাবতেও পারবেন না ঠাকুরমশাই। জয়দর্শনের পিতা নবাবী আমলে উড়িষ্যায় কী একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে দেওয়ানী করে বিপুল ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছিলেন। নবাবের কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি এই গ্রাম এবং কাছাকাছি অনেক ভূসম্পত্তি কেনেন। অনেক অর্থসম্পদ উপার্জন করলেও নবাবসরকারে চাকরি করার সময়ে তিনি অন্তরে অন্তরে দাসত্বের গ্লানি ভালই অনুভব করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ভূসম্পত্তির অধিকারী না হলে সমাজে স্থায়ী মান্যতা লাভ করা যায় না। কিন্তু সম্পত্তি কিনে লোকবসতি গড়ে তোলবার আগেই তার মৃত্যু হয়। সে কাজ দক্ষতার সঙ্গে শেষ করেন জয়দর্শন। সবাই বলত— রাজা জয়দর্শন। প্রজারা তাঁকে ভয়ও যেমন করত, তেমনি ভালও বাসত। শুনেছি তাঁর আমলে জয়তলা এবং আশেপাশে কখনও ডাকাতি হয়নি। হলে ডাকাতদের রেহাই ছিল না। ধূমধাম করে মুখুজ্যেবাড়ির দুর্গোৎসব হত। বোধনের দিন থেকে বিজয়ার রাত্তির পর্যন্ত গ্রামের কারও বাড়িতে উনুনে আঁচ পড়ত না। জমিদারবাড়িতে সবার নেমন্তন্ন।

এইপর্যন্ত বলে মুখুজ্যেমশাই থামলেন। কী একটা মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন-ভাল কথা, আপনার পাঁঠার

মাংস চলে তো?

বললাম—খুব চলে। কালই নায়েবমশাইকে বলেছি—আমি মাছ-মাংস সবই খাই। আজ সকালেও রঘু জিজ্ঞেস করছিল

—সাহস করে একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না তো?

অবাক হয়ে বললাম—ও কী কথা! নিশ্চয় বলবেন—

দেবদর্শনবাবু বললেন—আপনি কি স্বপাক ছাড়া আহার করেন না?

–করি বইকি, কেন করব না? আমার ওসব বাতিক নেই —

–তবে কাল নিজে কষ্ট করে রান্না করতে গেলেন কেন? অবশ্য সে আমাদেরই দোষ, অতিথিশালার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে সিধে দেওয়া হয়েছে। আপনি নিজে তো আর বলবেন না–আমিও কাল ব্যস্ত থাকায় আর-রঘু! এই রঘু!

রঘু এসে দাঁড়াতে মুখুজ্যেমশাই বললেন—শোনন, ঠাকুরমশাইকে আজ থেকে আর সিধে পাঠাবে না, উনি আমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে খাবেন। যাও, বাড়ির ভেতরে বলে এসো —আর হ্যাঁ, তামাক বদলে দাও।

একটু পরে রঘু এসে নতুন সাজা কলকে বসিয়ে দিয়ে গেল। বার দুই আরামের টান দিয়ে দেবদর্শন বললেন—সূক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধি না থাকলে কোনও ঐশ্বর্যই চিরস্থায়ী হয় না। জয়দর্শন এবং তাঁর পিতা শ্রম এবং বুদ্ধি দিয়ে যা গড়ে তুলেছিলেন, পরের দু-তিন পুরুষে তা সবই প্রায় গেল। সবচেয়ে বড় কারণ—একতার অভাব। সংসার বড় হতে লাগল, লাগাম কার হাতে থাকবে তা নিয়ে বিরোধ শুরু হল। ফলে অনিবার্যভাবে এতদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে লাগল। বর্তমানে এই গ্রাম ছাড়াও কত জায়গায় জয়তলার মুখুজ্যেরা ছড়িয়ে আছে। সন্তুষ্ট কেউই নয়, সকলেরই ধারণা সে তার ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়ে কম পেয়েছে। আমি ঝগড়াঝাটি করিনি, কিন্তু বাপ-পিতামহের এই ভদ্রাসন দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছি। টাকা না পাই, স্মৃতি থাক।

চিরদিনই আমার গল্প শুনতে ভাল লাগে। আর ভাল

লাগে এইরকম পড়ন্ত বনেদি বাড়ির পরিবেশ। এসব বাড়ির প্রতিটি ইঁটে, কার্নিশে বটগাছের চারায়, বারান্দার বাঁকে বাঁকে পুরনো দিনের গল্প মিশে আছে। কাদের যেন সব ফিসফাস কানাকানি, হঠাৎ আবো অন্ধকারে কে যেন কোথায় হেসে উঠল, মিলিয়ে আসা ধূপের গন্ধ পাক খায় আনাচে কানাচে।

দেবদর্শন আবার বলতে শুরু করলেন—আমাদের পরিবার শেষ বড় ধাক্কা খেল। আমার বাবার আমলে। ঠাকুর্দাকে বাবা দেবতার মত শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর বাবা স্থির করলেন একটা অসাধারণ শ্রাদ্ধের আয়োজন করে সবাইকে দেখাবেন নিজের বাবাকে তিনি কতখানি ভালবাসতেন। খুবই ছেলেমানুষি সন্দেহ নেই, কিন্তু বাবা এটা করলেন সত্যি সত্যি ঠাকুর্দাকে ভালবেসে। তখনকার যুগে বড় বড় ধনী পরিবারে অন্নপ্রাশন বিয়ে শ্রাদ্ধ বা দুর্গোৎসব নিয়ে ভয়ানক রেষারেষি ছিল—কে কতটা জাঁকজমক বা খরচ করল সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা। বাবা কিন্তু এসব সামাজিক দলাদলি আর লোকদেখানো ভড়ং একদম পছন্দ করতেন না। আসলে তিনি এইভাবে ঠাকুর্দার স্বর্গস্থ আত্মাকে দেখাতে চাইলেন তার শ্রদ্ধা কতটা বিস্তৃত আর গভীর ছিল। আপনি পণ্ডিত মানুষ, কতরকম শ্রাদ্ধ হয় নিশ্চয় জানেন। সবচেয়ে অনাড়ম্বর হল তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ, তারপর যোড়শোপচার,

তারপর বৃষোৎসর্গ, তারপর দানসাগর। দানসাগরে গিয়েই সবাই থেমে যায়—মানে, ওইপর্যন্ত যারা পৌঁছতে পারে। কিন্তু এর চেয়েও বড়মাপের শ্রাদ্ধ আছে, তা হল—

বললাম—দ্বিজদম্পতি শ্রাদ্ধ।

দেবদর্শন একটু যেন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন—আপনি জানেন? অবশ্য আপনি তো জানবেনই। দ্বিজদম্পতি শ্রাদ্ধে তিলকাঞ্চন থেকে দানসাগর পর্যন্ত সবই করতে হয়। তারপর আমন্ত্রণ করে আনা এক ব্রাহ্মণ যুবক আর এক কুমারী। ব্রাহ্মণ মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়, ওই মণ্ডপেই। তাদের ভূমিদান করতে হয়, মেয়ের গয়না, ছেলের যাবতীয় দাবির জিনিস দিতে হয়। তাদের ঘরবসত করিয়ে ভবিষ্যতের সমস্ত সংস্থান করে দিতে হয়। বুঝতে পারছেন কাণ্ডখানা? সমস্ত ক্রিয়ায় যা ব্যয় হয়, একজন ধনবান মানুষ সারাজীবনে তা উপার্জন করতে পারে না। আমার তখন খুব ছোটবেলা, বছর পাঁচেক বয়েস হবে। আবছা আবছা মনে করতে পারি দূর দূর গ্রাম থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে আসা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে দানের জিনিস হিসেবে বাসনপত্র, শালদোশালা আর স্বর্ণ-রৌপ্যখণ্ড তুলে দেওয়া হচ্ছে। দ্বিজদম্পতি হাসিমুখে বসে আছেন আসরে, উপস্থিত

লোকজন তাদের সাক্ষাৎ বিষ্ণু আর লক্ষ্মীজ্ঞানে প্রণাম করছে। এই গ্রামেই তাদের বসত করানো হয়েছিল। তাদের দুজনের কেউই আজ আর জীবিত নেই। তবে তাদের সন্তানেরা আছে। দক্ষিণা হিসেবে পাওয়া সেই ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব থেকে তাদের ভালভাবেই চলে। যায়। আমাকে তারা দাদা বলে ডাকে। নিকট

বললাম—আপনি ভাগ্যবান। এ জিনিস নিজের চোখে দেখেছেন।

—ঠিকই। শ্রাদ্ধ শেষ করে ভাটপাড়া থেকে আসা পুরোহিত বাবাকে বলেছিলেন—রামরূপ মিশ্রের ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি বলে যে বিখ্যাত বই, তাতে দ্বিজদম্পতি। শ্রাদ্ধের উল্লেখ পেয়েছিলাম। পরে বাবার কাছে কাজটা শিখেছি। কিন্তু সে তো পুঁথিগত বিদ্যা। দেখলাম আর নিজের হাতে করলাম আজ প্রথম। বাংলাদেশে এ জিনিস আর কোথাও হয়েছে বলে শুনিনি।

থেমে গিয়ে দেবদর্শন আবার জোরে ডাকলেন—রঘু! এই রঘু!

রঘু তার প্রভুর কখন কী প্রয়োজন সব বুঝতে পারে এবং সেজন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকে। ডাক শোনামাত্র সে এসে কলকে বদলে দিয়ে গেল।

এবার তারানাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা ভাবছ, আবার কী করে পৈতে ধারণ শুরু করলাম, সে গল্প বলতে গিয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছি। তা নয়, জীবনের সব কাহিনীই একটার সঙ্গে আর একটা জোড়া কোনও একটা বলতে শুরু করলে অন্যগুলোয় টান পড়ে। তাছাড়া বকবক করা বয়েস বাড়বার একটা লক্ষণ। আর বকব, না থামব?

সর্বনাশ! তারানাথ বলে কী! এই বকুনির লোভেই তো তার কাছে আসা। বললাম— বলতে থাকুন, বলতে থাকুন- তেমন হলে সারারাত বসে শুনব–

তারানাথ পরিতৃপ্ত মুখে নতুন পাসিং শো ধরাল। যে গল্প বলতে ভালবাসে এবং ভাল গল্প বলে, সে আগ্রহী শ্রোতা পেলে যেমন খুশি হয় তেমন আর কিছুতে নয়। সিগারেটে একটা গভীর টান দিয়ে সে আবার শুরু করল—পৈতে কী করে আবার ধারণ করলাম সে গল্প হয়ে গিয়েছে। কিন্তু

মুখুজ্যেবাড়ি থেকে চলে আসার আগে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল, সেটুকু বলে নিই। তোমরা ভাব তারানাথ গল্প বললেই বোধহয় কেবল কষ্ট, দুঃখ আর ভয়ের গল্প বলে। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। আমি জীবনের গল্প বলি, জীবন যেমন বিচিত্র উপলব্ধির মালা দিয়ে গাঁথা, আমার গল্পও তাই। কখনও মেঘ, কখনও বরাদুর।

গোটা দু-চার টান দিয়ে কলকে ঠিকমত চালু করে দেবদর্শনবাবু আবার বলতে শুরু করলেন—মোটামুটি এই আমাদের পরিবারের গল্প ঠাকুরমশাই। সাধারণ গল্প, বড় পরিবারের পতনের কাহিনী আপনি নিশ্চয় আগেও শুনেছেন। আমারও বিশেষ কোনও দুঃখ নেই, কারণ আমি লোভী মানুষ না। সামান্য যেটুকু আছে তাতে সম্মান বাঁচিয়ে হয়ত বাস করা যায়, কিন্তু তার বেশি কিছু না। অথচ আমার ইচ্ছে ছিল এই বাড়িটা একটু মেরামত করার। সে তো খুব কম পয়সায় হবার নয়, বুঝতেই পারছেন। এই হাতির মত বাড়ি। আমি চোখ বুজলে হয়ত পরিবারের কে কোথায় ছিটকে যাবে, যারা থাকবে তাদের পক্ষেও এতবড় বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে না। তবু এ আমার ভদ্রাসন, শৈশবের স্মৃতি দিয়ে জড়ানো বাড়ি। আমি থাকতে এ বাড়ি ভেঙে পড়ে যাবে?

মানুষটার দুঃখ আমি বুঝতে পারছিলাম। জগতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল পারিবারিক ঐতিহ্য আর পুরনো স্মৃতিকে ত্যাগ করা। বাস্তব দুনিয়ার নির্মম পেষণে সেটাও যখন স্বীকার করতে হয়, তখন সহৃদয়, সজ্জন মানুষের মুখের চেহারা বোধহয় দেবদর্শন মুখুজ্যের মত করুণ-বিধুর হয়ে আসে।

মুখুজ্জেমশাই বললেন—আপনাকে কেন থেকে যেতে বললাম জানেন? আমার ধারণা আপনার কৃপায় বোধহয় আমার সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে।

অবাক হয়ে বললাম—আমি? আমি কী ভাবে—

দেবদর্শন বললেন-আজ থেকে মাসখানেক আগে একজন পাগলামত ভবঘুরে অতিথি দিনদুয়েক অতিথিশালায় এসে ছিল। পাগলামত বলছি বটে, কিন্তু তার চেহারার ভেতর কী যেন একটা ছিল, যাতে তাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভালো বংশের সন্তানের মত হাবভাব, উজ্জ্বল চোখ। দোষের মধ্যে ঐ একটু মাঝেমাঝে অসংলগ্ন কথা বলা। সে বলেছিল আমাদের অতিথিশালায় কিছুদিনের মধ্যেই এমন একজন লোক আসবে যার মাধ্যমে আমাদের পরিবারের

বর্তমান আর্থিক সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়ে যাবে। আপনি সাধক মানুষ, ভাবলাম আপনিই যদি সেই লোক হন? মা আমার মনের মধ্যে তখন একটা মৃদু ঘণ্টার শব্দ বেজে উঠেছে। নৈঋত কোণে ঝড়ের মেঘের মত দ্রুত সেটা বিরাট অবয়ব নিতে লাগল। বললাম—অসংলগ্ন কথা বলত কী রকম? অসঙ্গত কিছু?

-না না, আদৌ তেমন নয়। আলোচনা করতে করতে হঠাৎ হয়ত এমন একটা কথা বলল যার কোনও মানেই হয় না। একটা ছড়া তো খুব বলত–

বললাম—কী ছড়া?

—সে থাক, সে শুনলে আপনি হাসবেন। পাগলের কাণ্ড–

—বলুন মুখুজ্যেমশাই, এর ওপরেই হয়ত আপনাদের পরিবারের ভাগ্য-পরিবর্তন নির্ভর করছে।

দেবদর্শন চমকে আমার দিকে তাকালেন, বললেন—আপনি তাই মনে করেন?

হতে পারে। বলুন আপনি—

দেবদর্শন বললেন—প্রথম যেদিন শুনি, সেদিন জিনিসটার কোনও গুরুত্ব দিইনি। সকালবেলা কাছারিতে বসে হিসেবপত্র দেখছি, এমনসময় লোকটি হঠাৎ এসে ঘরের। দরজায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল–

দিকে দিকে সাগরেতে ভাই,
চোখে চোখে চাঁদ খুঁজে পাই।

আমি অবাক, নায়েবমশাই অবাক, গোমস্তা-মুহুরীরা অবাক! বলে কী লোকটা? পাগল নিশ্চয়, কিন্তু পাগলে কি গুছিয়ে ছড়া বলে?

যাই হোক, এরপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল— এই অতিথিশালায়, এই বাড়িতে একজন আসবে শিগগীরই। সাধক মানুষ। তাকে এই ছড়া শুনিও। সে তোমার উপকার করবে–

এই ঘটনার পর আর একটা দিন সে আমাদের বাড়ি ছিল। ওই একটা দিন সে প্রায়ই ঘুরে ঘুরে আমার কাছে

আসত আর বলত—মুখস্থ করে নাও, মুখস্থ করে নাও। খুব কাজে দেবে—

দেবদর্শন থামলেন। বললাম—এ লোকটির নাম কী? নাম বলেছিল?

মুখুজ্যেমশাই বললেন—বলেছিল। ব্রাহ্মণসন্তান। নাম অমরজীবন ভট্টাচার্য।

যতটা চমকানো উচিত ছিল ততটা চমকালাম না। আমি একরকম বুঝতেই পেরেছিলাম উনি এই নাম বলবেন।

কাছারিবাড়ির কার্নিশে বাসাবাঁধা পায়রার দল গলার মধ্যে কুমকুম শব্দ করছে। সুন্দর বেলাটা চড়েছে বাইরে। এ বাড়ির এখন কোনও বিপদ নেই সামনে, বরং এদের মঙ্গল হবে। শান্ত, পবিত্র পরিবেশে সেই আসন্ন মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি। স্থানলক্ষণ বোঝবার শক্তি দিয়েছিলেন মধুসুন্দরী দেবী। তা এখনও নষ্ট হয়নি।

দেবদর্শন বললেন—ছড়াটার মানে কিছু বুঝলেন ঠাকুরমশাই?

বললাম—নাঃ, এখনও তো কিছু ধরতে পারছি না। দেখি আর একটু চিন্তা করে। তাছাড়া আমিই যে সেই লোক, যে আপনার বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় বলে দেবে, তাই বা জানছেন কী করে?

-না, তা ঠিক নয়, মানে

—আমি সে তোক না হলে আরও দিন-দুই থাকতে পাবো তো?

দেবদর্শন বিস্মিত মুখে বললেন—ওমা, সে কী কথা! নিশ্চয় থাকবেন। অতিথি নারায়ণ, কত সৌভাগ্য থাকলে তবে বাড়িতে অতিথি আসে—

মানুষটি স্বচ্ছ, বুকের ভেতরটা পর্যন্ত দেখা যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, এই লোকটি, মানে অমরজীবন—এর বয়েস কত বলে মনে হয়েছিল আপনার? খুব বুড়োমানুষ কি?

—না, একেবারেই নয়। কত আর হবে? এই—পঁয়ত্রিশ কী ছত্রিশ—

একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশই বটে।

পরের দিন সকালে মুখুজ্যেমশাইয়ের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি, এমন সময় একজন প্রৌঢ় মানুষ ঘরে ঢুকে জীর্ণ ছাতাখানা দরজার কোণে ঠেসিয়ে রেখে বললেন–নমস্কার রাজাবাবু। এ বছর তো আমার খেলা সামনের মাসে। আজ একখানা টিকিট দিয়ে যাই? সোমবার বিলেতের মেলে কাগজপত্র সব পাঠিয়ে দেব। এদিকে তো আর আসা হবে না। আজই দিয়ে যাই?

দেবদর্শন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বিলেতের ডার্বির টিকিট। পাবো কত সে আমিও জানি, আর এই ভূষণ রায়ও জানে। তবে বছরে একখানা কিনি, অভ্যেস আর কী। দাও হে, একখানাই দাও–

গোছা থেকে একটা টিকিট বের করে ধরেছেন দেবদর্শন।

আমি ঝুঁকে পড়ে বললাম একটু দাঁড়ান। দেখি, না-ওটা নয়, আপনি এটা নিন। গোছা থেকে অন্য একটা টিকিট বেছে দিলাম।

দেবদর্শন যেন কেমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

সপ্তম

বেশি ভাববার কিছু নেই

আমি হেসে বললাম–বেশি ভাববার কিছু নেই। নিলে এটাই নিন—

ভূষণ রায় স্পষ্টই কিঞ্চিৎ ইতঃস্তত করছেন, একবার আমার দিকে আর একবার মুখুজ্যেমশাইয়ের দিকে তাকাচ্ছেন। পুরনো আমলের জমিদার খদ্দের, আমার কথায় তো কেবল হবে না।

দেবদর্শন দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বললেন—ঠিক আছে, ঠাকুরমশাই যেখানা বলছেন সেখানাই দাও। নিজের পছন্দে তো অনেক দেখলাম, এবার ঠাকুরমশাইয়ের পছন্দের ফলটা

দেখি–

ভূষণ রায় বললেন—তাহলে তাই দিই রাজাবাবু?।

–দাও।

গোছা থেকে টিকিটখানা ছিঁড়ে দেবদর্শনকে দিলেন ভূষণ রায়। কী একটা ফর্মে নাম ঠিকানা আর নো-ডি-প্লাম লিখে নিলেন। যে টিকিট কিনছে সে তার পছন্দ আর ইচ্ছেমত একটা সাঙ্কেতিক শব্দ ঠিক করে, সেটাকে বলে নো-ডি-প্লাম। এর ফলে কে পুরস্কারের প্রাপক তা নিয়ে কোনও সংশয় থাকে না। একই নামে একাধিক লোক থাকতে পারে, কিন্তু গোপনে নির্বাচন করা সাঙ্কেতিক শব্দ কখনও এক হবে না।

ভূষণ রায় বললেন—নোম্-ডি-প্লাম কী লিখব?

দেবদর্শন বললেন—ওটা লেখোইয়ে, গতবার যেন কী ছিল? মা কালী, না? এবার বরং লেখো—

আমি বললাম-অমরজীবন।

দেবদর্শন শুধু জন্মসূত্রে বনেদি এমন নয়, তার অত্বরিত, সংযত আচরণের মধ্যে দিয়ে একটা সহজ আভিজাত্য প্রকাশ পায়। আমার কথা শুনে তিনি অবাক হলেন ঠিকই, কিন্তু বাইরে তা কিছুই দেখালেন না। বললেন—ঠিক আছে, লেখো অমরজীবন—

ভূষণ রায় সবকিছু লিখে নিয়ে ফর্মখানা কাগজের দপ্তরের মধ্যে যথাস্থানে খুঁজে রাখলেন। বললেন-তাহলে আজ আসি রাজাবাবু? প্রণাম

-নমস্কার। রঘু, এই রঘু! যা, রায়মশাইকে নিয়ে কাছারিঘরে যা। খাজাঞ্চিকে আমার নাম করে বল ওঁর টিকিটের দামটা দিয়ে দিতে। আচ্ছা এসো

ভূষণ রায় চলে গেলে দেবদর্শন কিছুক্ষণ চুপ করে গড়গড়ার নলে টান দিলেন, তারপর বললেন—ঠাকুরমশাই, জানি কিছু প্রশ্ন আছে যা করতে নেই। তবু কিছুতেই কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারছি না বলে মার্জনা করবেন। টিকিটটা বদলে দিলেন কেন?

বললাম-এর উত্তর দেওয়া মুশকিল। বিশেষ কোনও যে

কারণ আছে এমন বলতে পারি না, তবে অমরজীবনের বলা ছড়াটা একটা ছোটখাটো কারণ হলেও হতে পারে

দেবদর্শন সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন।

—আপনি কি ওই কবিতার মানে বুঝতে পেরেছেন?

—জানি না। বিলিতি লটারি খেলার ফল বেরুলে সেটা বোঝা যাবে। মুখুজ্যেমশাই, আপনি প্রবীণ এবং বুদ্ধিমান মানুষ, আপনাকে আগে থেকে মিথ্যা আশা দিয়ে ভোলাতে চাই না। একটা কিছু আন্দাজ করেই নিশ্চয় টিকিটটা বদলেছি। কিন্তু তা বলবার সময় এখনও আসেনি। ক খানিকক্ষণ কী ভেবে দেবদর্শন বললেন—ঠাকুরমশাই, আপনি কিছুদিন আমার কাছে থাকবেন তো? প্রয়োজনে কীভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হবে নইলে?

—সে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। প্রয়োজন ঘটলে আমি নিজেই ঠিক যোগাযোগ করে নেব। আমি বেশিদিন কোথাও একজায়গায় থাকি না মুখুজ্যেমশাই, কিছু মনে করবেন না। বাড়িতেও মন বসেনি বলেই বেরিয়েছিলাম—

মুখুজ্যেমশাই সংযত ব্যক্তিত্বের মানুষ, এ নিয়ে বারবার অনুরোধ করে আমাকে বিব্রত করলেন না। আমার অন্য গল্প আরম্ভ করলাম। উনি আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে চাইলেন। তোমরা তো জানো, সেসব পুরোনো দিনের প্রসঙ্গ একবার উঠলে আর শেষ হতে চায় না। মানুষ আগ্রহ করে শোনে, আমারও বলতে ভাল লাগে। দুপুরে খাওয়ার সময় বাদ দিয়ে সেদিনটা পুরোই গল্পে গল্পে কেটে গেল। বৈষয়িক কাজকর্ম সেদিন আর কিছুই হল না। কাছারি থেকে আমলারা ডেকে ডেকে ফিরে গেল। একসময় দেবদর্শন নায়েবমশাইকে ডেকে বললেন—আজ আর কাছারিতে বসব না। কাল ঠাকুরমশাই চলে যাবেন, আজকের দিনটা ওঁর সঙ্গে একটু গল্প করে নিচ্ছি। আপনি আজ একাই চালিয়ে নিন, আর ওদের বলে দিন বারবার যেন ডেকে বিরক্ত না করে–

তোমরা ভাবছ একই কথা এতবার বলছি কেন, কিন্তু সত্যিই এমন চমৎকার আর হৃদয়বান, উদার অতিথিপরায়ণ মানুষ আমি কমই দেখেছি। বেশিদিন তো নয়, আজ থেকে বড় জোর পঁচিশ কী তিরিশ বছর আগেকার কথা। তবু মনে হয় যেন স্বপ্নের কাহিনী, এই তিরিশ বছরে পৃথিবী ততটাই বদলে গিয়েছে। বাংলার গ্রামে আজকাল আর সেই

আতিথেয়তা পাবে না।

কিশোরী বলল—গ্রামের মানুষকে দোষ দিয়ে কী হবে? এই ভয়ানক যুগের কথা ভেবে দেখুন। আপনি যে সময়ের কথা বলছেন তখন সরু পাটনাই বালাম চালের দাম সাড়ে চার কী পাঁচ টাকা, সরষের তেল পাঁচআনা সের, খাঁটি দুধ টাকায় কুড়ি সের, বড় মাপের জোড়া ইলিশ ছ-আনা। এগুলোর দাম এখন কী দাঁড়িয়েছে ভেবে দেখুন। জনসংখ্যা বাড়ছে হু হু করে, মানুষ কি ইচ্ছে করলেও আগেকার দিনের মত অতিথিপরায়ণ হতে পারে?

তারানাথ হেসে বলল—এ যুক্তি আমি অনেক শুনেছি। বাজে যুক্তি—

কিশোরী একটু রেগে বলল—বাজে যুক্তি? কোনটায় ভুল বলেছি দেখান তো–

–উত্তেজিত হচ্ছ কেন? উত্তেজিত হওয়া তর্কে পরাজয়ের লক্ষণ।

—বেশ তো, আমার যুক্তির ফাঁক দেখান

তারানাথ বলল দেখ, দিনকাল খারাপ পড়েছে ঠিকই, দ্রব্যমূল্যও আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে সে কথাও ঠিক। কিন্তু সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় তা হল মানুষের সদিচ্ছা। ভালবাসা আর সদিচ্ছা থাকলে অনেক সমস্যা পার হওয়া সম্ভব। আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নির্দেশ আছে কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যদের জন্য রান্না না করে অন্তত বাড়তি একজনের জন্য আহার্য প্রস্তুত রাখার। নিজে রান্না করে শুধু নিজে খেলে তাকে পামর বলে। ভাব তো, দিনকাল যতই কঠোর হোক, দ্রব্যমূল্য যতই বেড়ে থাকুক, একজনমাত্র মানুষকে খাওয়াতে কি খুব বেশি খরচ পড়ে? চার-পাঁচজনের সংসারে একজন অতিথির জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয় না, ওর মধ্যেই হয়ে যায়। তা নয়, আসলে আমরা ক্ষুদ্রচেতা হয়ে পড়েছি। এটাকে যুগধর্মও বলতে পারো। কলিযুগে অন্নময় শরীর-কেবল আমি খাব, আমি পরব এই মানসিকতা। মহাভারত ভাল করে পড়েছ? দ্বৈপায়নের তীরে ভীম যখন দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করলেন, তখন অন্যায়যুদ্ধ করেছেন বলে ভীমকে হত্যা করবার জন্য বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে শান্ত করে কৃষ্ণ বললেন—দাদা, আপনি অকারণে ভীমের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করছেন। গ্রহবিপ্রদের ডেকে গণনা করে দেখুন, আজ থেকে দশদিন আগেই দ্বাপর শেষ হয়ে

কলি শুরু হয়েছে। কলিতে নিয়ম হচ্ছে—যেমন করে হোক যুদ্ধ জয় করো, যা চাও তা ছিনিয়ে নাও, দয়ামায়া-উদারতা যেন তোমার আকাঙক্ষার বাধা না হয়। সেদিক দিয়ে ভীমসেন যুগধর্ম পালন করেছেন মাত্র, সেজন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না। যুগপুরুষ কৃষ্ণের কথাই সত্য, আমিও একালের মানুষকে দায়ী করছি না। কিন্তু একথা ঠিক যে, মানুষ ক্ষুদ্রচেতা হয়ে পড়েছে, তা সে যে কারণেই হোক।

সেদিনটা দেবদর্শনের সঙ্গে গল্প করেই কাটল। ভদ্রলোক কলেজের ছাপমারা ছাত্র নন বটে, কিন্তু সাহিত্য আর ইতিহাসের খবর রাখেন প্রচুর, সেসব শুনতে আরম্ভ করলে আর থামা যায় না।

বোধহয় পরের দিন চলে যাব বলেই দুপুরে দেবদর্শন খাওয়াদাওয়ার বিপুল আয়োজন করেছেন। ওঁর আর আমার একসঙ্গেই আহারের আয়োজন করা হয়েছে ভেতরবাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায়। খেতে বসে আমার চক্ষুস্থির! পূজোর পরাতের মত বিশাল কাসার পদ্মকাটা বগিথালায় চূড়ো করা সাদা ধপধপে তুলাইপাঞ্জি চালের ভাত। ভাতের চূড়ায় ছোট্ট কাঁসার বাটিতে গাওয়া ঘি, জমবে না—ভাতের গরমে তরল থাকবে। আলাদা রেকাবিতে নুন-লেবু-লঙ্কা। জিরে জিরে করে

কাটা আলুভাজা, এঁচোড়ের ডালনা, নারকেলের কুচি দেওয়া ঘন মুগের ডাল, বাঁশসলা ধানের চিড়ে দিয়ে রান্না পাকা রুইমাছের মুড়িঘন্ট, একহাত লম্বা চিতলমাছের পেটির তেলঝাল—সে পেটির লম্বা কাঁটা দিয়ে উলবোনা যায়। তারপর এল তেলকই, এক একখানা কই একবিঘত লম্বা, তেমনটি তোমরা আজকাল আর শহরবাজারে দেখবে না। কারুকে বিশ্বাস করতে বলছি না, কিন্তু এ সমস্ত পদই আমি বেশ ভাল পরিমাণে খেয়ে ফেললাম। ভাত নিলাম দুবার। তুলাইপাঞ্জি চালের ভাত খেয়েছ কখনও? তাহলে বুঝতে, এখানে রান্না করলে গলির মোড়ের লোক জানতে পারে। এই পর্ব চুকলে এল ঘনদুধের সর, ক্ষীর আর পাকা মর্তমান কলা। তাও খেয়ে ফেললাম অনেক অনেক।

মধ্যাহ্নভোজনের পর বৈঠকখানায় বসে তামাক খেতে খেতে বললাম—লোকে আপনাকে রাজাবাবু বলে সে মিথ্যে কথা নয়। রাজবাড়ি ছাড়া এমন রান্নাবান্না হয় নাকি?

দেবদর্শন বললেন—এবার তো কিছু করতে পারলাম না ঠাকুরমশাই, একটু হঠাৎ হয়ে গেল কিনা। সত্যি যদি আবার আসেন, তখন আমাদের এই অঞ্চলের কিছু ভাল রান্না আপনাকে খাওয়াব। কত রান্না তো আমরা ভুলেই গিয়েছি,

বাড়ির মেয়েরা অত ঝামেলা আর করতে চায় না। পদ্মচিনি খেয়েছেন কখনও? গয়নাবড়ি ভাজা? কিম্বা তিলজাউ? সব খাওয়াব, আমার বাড়ির মেয়েরা পারে—

দু-চারবার জোরে জোরে গড়গড়ার নলে টান দিয়ে দেবদর্শন বললেন—যদি পারেন তো পূজোর সময় আসবেন। এখন অবশ্য আর সেই পুরনো দিনের জাঁকজমক কিছুই নেই, তবু নয় নয় করেও মুখুজ্যেবাড়ির দুর্গোৎসব আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলে বিখ্যাত। বংশানুক্রমে আজ দুশো বছর ধরে একই কুমোর ঠাকুর তৈরি করে, একই পুরোহিতবংশ পূজো করে, একই ঢাকিরা ঢাক বাজায়। প্রতিমার সামনে অষ্টমীর দিন রাত্তির থেকে কবির গান, যাত্রা—এসব হয়। যদি ভাগ্য ভাল থাকে, তাহলে সন্ধিপূজোর সময় গড়ের তোপও শুনতে পাবেন–

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—গড়ের তোপ কী জিনিস?

মুখুজ্যেমশাই বললেন—এটা আমাদের পরিবারে প্রচলিত একটা পুরোনো প্রবাদ। এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মুকুটশিলা গ্রামে আমার মামাবাড়ি। আমার প্রপিতামহীও ওই গ্রামেরই মেয়ে ছিলেন। তার বাপেরও ছিল বিশাল ভূসম্পত্তি,

নদীর ধারে চওড়া উঁচু পাঁচিল দেওয়া এতবড় বাড়ি যে লোকে বলত ‘গড়’। সে বাড়িতে বিখ্যাত দুর্গোৎসব হত, দীয়তাং ভুজ্যতাং চলত পনেরোদিন ধরে। সন্ধিপূজোর সময়ে চারদিক কাঁপিয়ে কামান দাগা হত। লোকে বলত গড়ের তোপ। বিয়ের পর আমার প্রপিতামহী বাপেরবাড়ি যাওয়ার খুব একটা সুযোগ পেতেন না, সেকালে যেমন হত আর কি। একবার সকলকে বলে রাজি করিয়ে পূজোর সময় তিনি মুকুটশিলা যাবেন স্থির হল, কিন্তু পূজোর দশবারোদিন আগে বিষম সান্নিপাতিক জ্বরে প্রপিতামহী একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লেন। সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, এখন যান তখন যান। কিন্তু সেই বিকারের মধ্যেও একটু জ্ঞান ফিরলেই বলতেন—আমার বাপেরবাড়ি যাওয়া হল না, পূজো দেখা হল না।

দীনদয়াল ভট্টাচার্য ছিলেন সে সময় আমাদের কুলগুরু। প্রপিতামহীর আক্ষেপ শুনে তিনি বলেছিলেন—মা, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না, এইখান থেকেই তুমি সন্ধিপূজোর দিন মুকুটশিলা গ্রামের গড়ের তোপ শুনতে পাবে। এইখান থেকেই তুমি প্রণাম জানিও।

সবাই ভেবেছিল দীনদয়াল মুমূর্ষ রোগীকে সান্ত্বনা দিলেন মাত্র, কিন্তু প্রপিতামহ কথাটা আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বাস

করেছিলেন। সন্ধিপূজোর সময় তিনি বসে রইলেন স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে। গভীর রাত্রিতে ঠিক সন্ধিলগ্নে বহুদূর থেকে মাঠ বন খাল বিল পেরিয়ে ভেসে এল গড়ের তোপের শব্দ। গ্রামাঞ্চল তো, তারপর সেকালের ব্যাপার, হুহু করে ঘটনাটা রটে গেল চারদিকে। এখন জিনিসটা কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁচেছে। প্রতি বছরেই নাকি কেউ কেউ শুনতে পায় গড়ের তোপের আওয়াজ–

বললাম—তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? শোনাই তো যেতে পারে–

দেবদর্শন আমার দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বললেন—না, তা যেতে পারে না। আগে বলিনি বোধহয়, জয়তলা থেকে মুকুটশিলার দূরত্ব চল্লিশ মাইল।

চুপ করে রইলাম। সত্যিই তো, যতই নির্জন আর শান্ত পরিবেশ হোক, চল্লিশ মাইল দূর থেকে কামানের আওয়াজ শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়।

জিজ্ঞাসা করলাম–আপনি কখনো শুনেছেন?

মুখুজ্যেমশাই বললেন—বাল্যে দু-একবার শুনতে পেয়েছি বোধহয়, পরিষ্কার স্মৃতি কিছু নেই। বড় হবার পর তেমনভাবে কখনও নয়—

—তেমনভাবে নয় বলতে কী বোঝাচ্ছেন?

–সেভাবে কানখাড়া করে কখনও বসে থাকিনি তো। বড় হতে আরম্ভ করলে কিছু কিছু বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে যায়। তবে দু-একবার যেমন আমার বিয়ের বছর-হঠাৎই শুনতে পেয়েছিলাম তোপের শব্দ। অন্যমনস্ক ছিলাম, নইলে হয়ত আরও স্পষ্ট শুনতে পেতাম। গ্রামের লোকেদের মধ্যে কিন্তু এ প্রসঙ্গে গভীর বিশ্বাস আছে, তারা অনেকেই শুনেছে গড়ের তোপ। তবে তাদের কথা আমি ধরি না, অতিরিক্ত বিশ্বাসে আর ভক্তিতে মানুষ অনেক কিছু দেখে বা শোনে যার কোনও বাস্তব মূল্য নেই।

দেবদর্শন প্রবীণ জমিদার বটে, কিন্তু সেকেলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ নন, তাঁর মনের মধ্যে বেশ উদার আলোহাওয়া খেলে।

গল্পে গল্পে সেদিনটা ভালই কেটে গেল। পরের দিন

আবার বেরিয়ে পড়লাম পথে।

পথটাই আমার ঠিক জায়গা, ঠিকঠাক খাপ খেয়ে যায়। চিন্তাহীন, মুক্ত আনন্দে ভরা দিনগুলো। কখনও ঝড়-বৃষ্টি, কখনও নীল আকাশে ডানা ছড়ানো চিলের ওড়াউড়ি। পড়ন্ত বেলায় রাস্তার ধারের লতাপাতার ঝোপ থেকে মন-কেমন-করা কটু গন্ধ ওঠা। গ্রামের মুদিখানা থেকে মুড়ি আর মুড়কি কিম্বা বাতাসা কিনে খাওয়া, যেখানে-সেখানে রাত্তিরের আশ্রয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। তোমরা যারা সংসারী মানুষ তারা এ জীবনটাকে ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। তবে আবার বলছি—মনে বল আর সাহস থাকা চাই, দুর্বল পুতুপুতু মনের লোক এ আনন্দ পাবার যোগ্য নয়।

কয়েকমাস ঘুরে বেড়ালাম বহু জায়গায়, অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও হল। তার মধ্যে একটা তো জমিয়ে গল্প বলার মত। কিন্তু সেটা আজ বলব না, আজ বরং মুখুজ্যেবাড়ির গল্পটা শেষ করি।

শরৎকাল এসে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গাপুজো আসছে। একটা কালীবাড়ির নাটমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম সে রাত্তিরে। বেশ পরিচ্ছন্ন জায়গা, মশাটশা বিশেষ নেই,

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম ঘুম ভাব ঘনিয়ে এল। সারাদিন পথশ্রমের পর ঘুম আসার অনুভূতি ভারি আরামের।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে কানের কাছে কে যেন বলল কাল সকালেই রওনা হও। মুখুজ্যেবাড়ির পূজোয় এবার তোমার থাকা দরকার।

চমকে উঠে বসলাম–কে? কে বলল কথাটা? তারার আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে নাটমন্দির। কই, জনপ্রাণীও তো নেই কোথাও! অথচ আমি পরিষ্কার শুনেছি–

উঠে একবার চারপাশটা ঘুরে দেখে এলাম। না, সত্যিই কেউ কোথাও নেই। তাহলে?

তারপরেই হঠাৎ একটা ধাক্কার মত মনে হল—এই গলার স্বরের অধিকারীকে আমি চিনি! তার নাম অমর। অমরজীবন। আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের পর্বে পর্বে সে জড়িয়ে গিয়েছে। রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা তার পরিচয়, আকাশের নক্ষত্রদের মত সে প্রাচীন। তার নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে।

অনেক রাত্তির অবধি নাটমন্দিরের মেঝেতে থু হয়ে বসে রইলাম। গলাটা শুনতে পেয়ে মনে কোনও ভয় বা আশঙ্কা হল না, বরং মৃদু তৃপ্তি আর শান্তিতে মন ভরে গেল। যেন কয়েকবার হারিয়ে যাওয়া কোন বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি। ঠিক করলাম পরের দিনই রওনা দেব জয়তলায়।

ঘুরতে ঘুরতে দেড়খানা জেলা পার হয়ে চলে এসেছিলাম, কাজেই ফিরতে বেশ সময় লাগল। খুব প্রাণপণ হেঁটেও পূজো আরম্ভ হবার আগে মুখুজ্যেবাড়ি পৌঁছতে পারলাম না। সপ্তমীর দিন সন্ধেবেলা পৌঁছলাম দানাবাড়ি নামে একটা গ্রামে, সেখান থেকে জয়তলা বারো মাইল পথ। খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়লে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

পরের দিন মহাষ্টমী। অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে উঠে মুখহাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যে গোয়ালবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম সে বাড়ির কর্তাও আমাকে এগিয়ে। দেবার জন্য গল্প করতে করতে অনেক দূর এল। শরৎকালের ভোর, বাতাসে সামান্য হিমের স্পর্শ। গ্রামের সীমানায় একটা বাড়ির উঠোনে গাছের তলায় আলো করে ছড়িয়ে। আছে শিউলি ফুল। তার পবিত্র গন্ধ সে জায়গার বাতাসকে আমোদিত করে রেখেছে। এখান থেকেই আমার সঙ্গী উদ্ধব ঘোষ প্রণাম করে

বিদায় নিল। আমিও জোরে পা চালালাম।

পথে বারদুই সামান্য বিশ্রাম করে ঠিক বেলা দুপুরে জয়তলা পৌঁছলাম। দূরে মুখুজ্যেবাড়ির পূজোর ঢাক বাজছে। গ্রামের রাস্তাতেও খুব বেশি লোক নেই, দল বেঁধে সবাই জমিদারবাড়ি পূজো দেখতে গিয়েছে। পথের বাঁক ঘুরেই সামনে মুখুজ্যেমশাইয়ের। বাড়ি। কাছারি আর অন্দরমহলের মাঝখানে বিরাট উঠোনে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তার নিচে অন্তত শ-তিনেক লোক হাতজোড় করে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বসে। আমি মণ্ডপে ঢুকতেই সমস্ত কোলাহল থেমে গিয়ে অতবড় আসরে স্তব্ধতা নেমে এল। সন্ধিপূজা সমাগত।

আসরের একেবারে অপর প্রান্তে ঠাকুরদালানে প্রতিমার সামনে একশো আটখানা পেতলের প্রদীপ ধকধক করে জ্বলছে। পুরোহিত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন লোহার বেড়ের ওপর বসানো নতুন জলভরা মাটির হাঁড়ির দিকে। তার তলার ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। সমস্তটা জল বেরিয়ে গেলে সন্ধিপূজো শুরু হবে। ভাল সময়ে পৌঁছলাম মুখুজ্যেমশাইয়ের বাড়িতে।

ওপাশ দিয়ে ক-খানা বারকোশ হাতে করে রঘু কোথাও

যাচ্ছিল, সে আমাকে দেখতে পেয়ে একগাল হাসল, তারপর আসরের সামনে যেখানে দেবদর্শন বসে আছেন সেখানে গিয়ে নিচু হয়ে বাধহয় আমার কথা বলল। দেবদর্শন চমকে উঠে মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

তাঁর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হওয়ামাত্র দূর থেকে ভেসে আসা মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট কামানের গর্জন শুনতে পেলাম। আসরের সব মানুষই নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিল, জয়ধ্বনি দিয়ে তারা একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল সামিয়ানার তলায়। গড়ের তোপ! গড়ের তোপ শোনা গিয়েছে!

কেবল পুরোহিতমশায় অবিচল। হাঁড়ির জল শেষ হওয়ামাত্র তিনি হাত তুললেন। মেঘের গর্জনের মত গুড়গুড় করে বেজে উঠল ঢাক।

সন্ধিপূজো শুরু হল।

অষ্টম

শাঁখ আর ঘণ্টা বেজে উঠল

শাঁখ আর ঘণ্টা বেজে উঠল, ঢাক তো বাজছেই। বাড়ির আর সমাগত গ্রামের মেয়েরা উলু দিচ্ছে। কামারের হাতে ঝকঝকে খাড়া উঠছে নামছে, এঁটেল আর বালিমাটি মিশিয়ে তৈরি বেদীর ওপরে পরপর বলি হয়ে যাচ্ছে একশো আটটা চালকুমড়ো, কলা, আখ, সুপুরি। মুখুজ্যেবাড়ির পূজো হয় দেবীপুরাণ অনুযায়ী, পশুবলি এ বাড়িতে নিষেধ। তার। মধ্যে সুপুরি বলি ব্যাপারটা দেখার মত। মাটির বেদীতে রাখা ওইটুকু একটা জিনিসের ওপর অতবড় ভারি খাড়া নির্ভুলভাবে নামিয়ে আনা রীতিমত কঠিন কাজ। সুপুরি শক্ত এবং গোল জিনিস, খাঁড়া যথেষ্ট ধারালো এবং কামার যথেষ্ট কুশলী না হলে ফলটা ফকে পাশে সরে যাবে। তা হলে মহা অকল্যাণ।

কিন্তু বলি হয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে।

সন্ধিপূজো শেষ হল। মেয়েরা গলবস্ত্র হয়ে ঠাকুরপ্রণাম করছেন, লোকজন সব উত্তেজিত হয়ে গড়ের তোপের প্রসঙ্গ আলোচনা করছে। এতদিনের কিম্বদন্তী, কিন্তু সেভাবে কেউ শোনেনি কামানের শব্দ। গ্রামের সরল বিশ্বাসী মানুষের মনে আলোড়ন তৈরি করবার মত ঘটনা এটা। মুখুজ্যেবাড়ির দুর্গোৎসবের মাহাত্ম্য নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হল।

দেবদর্শন প্রণাম সেরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার চোখে জল।

–শুনলেন ঠাকুরমশাই?

—শুনলাম। আপনার নিমন্ত্রণ রেখে ভালই করেছি।

—চলুন, আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসি। রঘু, আমাদের তামাক দে-আর প্রসাদ। নিয়ে আয়।

উৎসব উপলক্ষে বাড়ি সাজানো হয়েছে দেখলাম। বৈঠকখানার দরজায় ঝুলছে আমপাতা আর শোলার

কদমফুল। ভেতরে তক্তাপোশে গদির ওপর নতুন ধপধপে ফরাস পাতা, ধারে ধারে কটা মোটা গির্দা। আমরা গিয়ে বসার একটু পরেই রঘু দুজনকে তামাক দিয়ে গেল। পেছনে এল পুরোহিতের তন্ত্রধার, তার হাতে দুখানা কাঠের বারকোশে পূজোর প্রসাদ। দেবদর্শন বললেন—প্রসাদ খেয়ে আপাতত চালান ঠাকুরমশাই। দুপুরে খেতে কিন্তু দেরি হবে। লোকজন সব এতক্ষণ সন্ধিপূজো দেখছিল, এইবার রান্না চাপাবে

বললাম—তা হোক, আমার কোনও তাড়া নেই।

—আমাদের কিন্তু দেবীপুরাণ মতে পূজো, এই কদিন নিরামিষ খাওয়া চলছে, সেই বোধনের দিন থেকে। একেবারে দশমীর দিন বিসর্জন সেরে এসে রাত্তিরে লুচি-মাংস খাওয়া হবে সকলে মিলে। আপনার হয়ত কষ্ট হবে

—কিছু অসুবিধে হবে না। ভালমন্দ জিনিস খেতে খুব ভালবাসি ঠিকই, আবার নুনভাত খেতেও ভালই লাগে। স্বাদ জিনিসটা জিভে নয় মুখুজ্যেমশাই, হৃদয়ে।

দু-একজন করে গ্রামের বৃদ্ধ প্রতিবেশী বৈঠকখানায় এসে বসতে শুরু করলেন। সাধারণ মানুষেরা প্রসাদ খেয়ে

সামিয়ানার নিচেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গল্পগুজব করতে লাগল। সবাই দুপুরে খেয়ে বাড়ি যাবে, সন্ধেবেলা এসে আরতি দেখবে, এবং আবার রাত্তিরের খাওয়া সেরে ফিরবে। সমস্ত গ্রামটায় উৎসবের আবহাওয়া এবং সেটা মুখুজ্যেবাড়িকে কেন্দ্র করে।

দেবদর্শনের বাড়ির একটা সুন্দর প্রথা দেখলাম। যেমন, দুপুর আর রাত্তিরের সামুদায়িক ভোজ। সবাই মিলে সামিয়ানার নিচে সারি দিয়ে বসে একই খাবার খাওয়া হচ্ছে। জমিদার বলে দেবদর্শন আলাদা বসেন নি, বা তাকে আলাদা করে বিশেষ কোনও খাবারও দেওয়া হচ্ছে না। রান্না হয়েছে মোটা লালরঙের আউশ চালের ভাত। কী মিষ্টি তার স্বাদ! সঙ্গে কলাইয়ের ডাল, কাঁচকলা ভাজা, আলু-বেগুন-কুমড়ো-ঝিঙে-আঁটাশাকগুড়িকচু দিয়ে অনবদ্য একটা ঘাট, আমড়ার চাটনি আর পাতলা পায়েস। কোনও জমিদারবাড়ির পক্ষে নিতান্তই সামান্য আয়োজন, কিন্তু সমবেত মানুষজন সোনা হেন মুখ করে আনন্দের সঙ্গে তাই খাচ্ছে। প্রথম কারণ, জমিদারবাবুর প্রতি ভালবাসা। দ্বিতীয় কারণ, একসঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দ। দুটো কারণই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

খেতে খেতে দেবদর্শন বললেন-রাত্তিরে হবে লুচি, আলু-

কুমড়োর তরকারি আর পায়েস। পায়েসটা একটু জোলো লাগছে, না? কী আর করা যাবে বলুন, এতগুলো মানুষের জন্য আয়োজন। আমাদেরও তো সে দিন আর নেই। তবে হ্যাঁ, আগামীকাল দুপুরে আপনাকে একটা জিনিস খাওয়াব। সামান্য জিনিস, তবে খেতে ভারি ভাল

বললাম-কী জিনিস?

—আমরুল পাতা, রাঙাআলু আর আম-আদা দিয়ে তৈরি চাটনি। আমাদের এই অঞ্চল ছাড়া জিনিসটার চল দেখিনি বিশেষ কোথাও–

সরল মানুষ দেবদর্শন, আনন্দে পূর্ণ মনের মানুষ। এই নিয়ে মাত্র দুবার ওঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ, তবু যেন একটা আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করলাম। সকলের সঙ্গে আনন্দ করে পূজোর বাকি দুটো দিন কেটে গেল। দশমীর দিন দুপুরের পর থেকে বৌঝির দল ভিড় করে ঠাকুরবরণ করতে শুরু করল। দু-থাক তক্তা দিয়ে প্রতিমার সামনে উঁচু মঞ্চের মত করে দেওয়া হয়েছে, তার ওপরে দাঁড়িয়ে মেয়েরা ঠাকুরের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে, মুখে চুইয়ে দিচ্ছে সন্দেশ। নিজেদের মধ্যে এ-ওর কপালে সিঁদুর লেপে দিচ্ছে,

শাঁখা আর নোয়ায় মাখিয়ে দিচ্ছে। এই লোকাচারের নাম সিঁদুর খেলা। আমাদের সমাজে মেয়েদের সমস্ত উৎসব-আনন্দই প্রায় পর্দার আড়ালে পালিত হয়। এই একটা দিন তারা অসঙ্কোচে বেরিয়ে আসে বাইরে। দেখতে ভারি ভাল লাগে তাদের স্বতোৎসারিত। আনন্দের প্রকাশ। বুঝতে পারা যায় আড়ালে থাকা এই বিপুল নারীশক্তির বলেই ঠিকঠাক চলছে সমাজটা।

সারা গাঁয়ের লোক মিছিল করে প্রতিমা নিয়ে বেরুল বিকেলবেলায়। তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে। ছায়া গাঢ় হচ্ছে আম-জামবাগানের ফাঁকে ফাঁকে। বাতাসে হিমের ছোঁয়া, কার্তিক মাসের প্রথম দিকের স্নিগ্ধ হিম। হেমন্তকাল আসতে আর দেরি নেই।

বাঁশের ওপর পাশাপাশি তক্তা সাজিয়ে শক্ত করে বেঁধে তার ওপর ঠাকুর রেখে কাঁধে নিয়েছে বাহকেরা। হাতে তাদের মশাল, সন্ধে আর একটু গাঢ় হলেই জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। নাচতে নাচতে আর দেবীর নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে পুরো দলটা এসে দাঁড়াল নদীর ঘাটে। সেখানে ভাসানের জন্য পাশাপাশি দু-খানা নৌকো বেঁধে চওড়া বেদীর মত করা হয়েছে। ঠাকুরসুদ্ধ তক্তা রাখা হল সেই নৌকোর ওপরে, সঙ্গে

উঠল দশ-বারোজন বলিষ্ঠ লোক আর ছ-জন ঢাকি। ঘাট থেকে ছেড়ে ধীরগতিতে নৌকো মাঝনদীতে গিয়ে দাঁড়াল। তখন অন্ধকার নেমেছে ঘোর হয়ে, নৌকোর ওপর জ্বলে উঠেছে মশাল। হঠাৎ সবগুলো ঢাক বেজে উঠল দ্রুততালে, নদীর পারে আর নৌকোর ওপরে লোজন চিৎকার করে উঠল —আবার এসো মা, আবার এসো! আস্তে আস্তে দু-দিকে সরে গেল দুই নৌকো, প্রতিমাবাহকেরা মাঝখানের বাঁধনের দড়ি কেটে দিয়েছে। সোজাসুজি দাঁড়ানো অবস্থায় জলে ডুবে গেল দেবীপ্রতিমা। পাগলের মত বাজছে ঢাক, পাগলের মত চেঁচাচ্ছে মানুষ। ধকধক করে জ্বলছে মশাল। বিসর্জন হয়ে গেল।

পুরো দলটা আবার ফিরে এল মুখুজ্যেবাড়ির পূজোপ্রাঙ্গণে। মূর্তিহীন বেদীতে মিটমিট করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। অতগুলো মানুষ ফিরে এল, কিন্তু পরিবেশে কীসের যেন একটা হাহাকার। কী একটা খুব আনন্দের জিনিস যেন এই একটু আগেও ছিল, এখন আর নেই। ঢাক থেমে গিয়েছে, পুরোহিত সুধীর ভট্টাচার্য ঘটে আম্রপল্লব ডুবিয়ে সবার মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। দেবদর্শনের কাছে শুনেছি এই সুধীর ভট্টাচার্যেরই পূর্বপুরুষ হচ্ছেন দীনদয়াল ভট্টাচার্য, মুখুজ্যেবাড়ির তৎকালীন পুরোহিত,

যিনি গড়ের তোপ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

বারবাড়ির উঠোনে পরপর পাঁচখানা উনুনে রান্না চেপেছে। লোহার চাদর দিয়ে তৈরি বিশাল কড়াইতে মাংস কষা হচ্ছে। দেবদর্শনের কাছে শুনলাম চারমণ মাংস রান্না হচ্ছে, আর দেড়মণ ময়দার লুচি। নিবারণ ময়রাকে বায়না দেওয়া হয়েছিল, সে দু-মণ কড়াপাকের ছানার গজা বানিয়ে দিয়েছে। যারা বিসর্জনের মিছিলে গিয়েছিল তারা আর ফিরে যায়নি, সামিয়ানার নিচে বসে গল্পগুজব করছে। এখন একটু একটু করে আরও মানুষ এসে জড়ো হচ্ছে। খাওয়াদাওয়া মিটলে মাঝরাত থেকে কবিগান হবে। নবদ্বীপ থেকে রাম গোস্বামীর দল এসে পৌঁচেছে বিকেল নাগাদ, এখন তারা এক কোণে গোল হয়ে বসে তামাক খেতে খেতে বিশ্রাম করছে। পাশে তাদের যন্ত্রপাতি রাখা আছে। উৎসাহী মানুষেরা তাদের কাছে ঘুরঘুর করছে আলাপ জমানোর জন্য, কিন্তু তারা খুবই গম্ভীর লোক, বাজে আলাপ করে নিজেদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে রাজি নয়। চোখ বুজে ঝিমোনোর ভান করছে।

আর একটা পাসিং শো ধরিয়ে তারানাথ বলল—আমার গল্প একটু ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে, না? তবু মন দিয়ে শোনো, এসব দিনকাল চলে যাচ্ছে, তোমরা আর

দেখতে পাবে না। শুনে রাখো, পরে ছেলেপুলেদের গল্প বলতে পারবে। বাংলার উৎসব ক্রমেই চেহারা বদল করছে। তাছাড়া আড্ডার তো এই নিয়ম, ধরাবাঁধা পথে গল্প। এগোয় না। আচ্ছা তোমরা একটু বোসো, আমি ভেতরবাড়ি থেকে আর একবার চায়ের কথা বলে আসি–

এখান থেকে হাঁক দিয়েই চায়ের ফরমাশ করে দেওয়া যায়, তারানাথ সচরাচর তাই করে থাকে। কিন্তু সে বিচক্ষণ মানুষ, আমরা তার সামনে ধূমপান করি না, তাই সে মাঝে মাঝে এটা-ওটা অছিলা করে উঠে যায়। আমরাও বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেয়ে আসি। তারানাথ উঠে ভেতরে যেতে কিশোরী বলল—চল হে, চটপট একটু ধোঁয়া টেনে আসি–

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা সিগারেট ধরালাম। মট লেনের একটু ভেতরদিকে তারানাথের বাড়ি। বড় রাস্তা থেকে খুব দূরে নয়, কিন্তু রাস্তার কোলাহল এপর্যন্ত এসে পোঁছয় না। প্রাচীন কলকাতার একটা শান্ত, স্নিগ্ধ কোণে তারানাথ থাকে। পলস্তারা খসে যাচ্ছে, নোনা-ধরা দেওয়াল, সদর দরজার কাঠ জীর্ণ হয়ে ফাঁক দেখা দিয়েছে। তবু তারানাথের গল্পের মত পুরনো দিনের চাদর মুড়ি দিয়ে বাড়িটা দাঁড়িয়ে। আধুনিক যুগ

একে না ছুঁয়ে পাশ দিয়ে এড়িয়ে চলে গিয়েছে।

কিশোরী বলল—চার-পাঁচ বছর আগেও তারানাথ চক্কোত্তিকে আমরা চিনতাম না। মনে আছে, আমিই তোমাকে প্রথম নিয়ে আসি? তুমি তো বুজরুক ভেবে প্রথমে আসতেই রাজি হওনি। আর আজ? হপ্তায় অন্তত একটা দিন না এলে মন ছটফট করে।

—ঠিক বলেছ।

–আসলে কী জানো, লোকটা গল্প বলে দারুণ সুন্দর। গল্পটা সত্যি না মিথ্যে, সে প্রশ্ন মনেই আসে না। ও একটা সম্মোহনের মত ব্যাপার–

সিগারেট শেষ করে দুজনে ভেতরে এসে বসলাম। একটু পরেই তারানাথও ফিরে এল। গলাখাঁকারি দিয়ে বলল—ঠাণ্ডা মত লেগেছে, আদা দিয়ে চা করতে বললাম। সেদিন ছেলেটার একটু সর্দিজ্বর মত হয়েছিল, গলির মোড়ের ভূপেন ডাক্তার এসে জেফরল নামে কাশির সিরাপ দিয়ে গেল। অবশ্য আমার কাছ থেকে ভিজিট বা ওষুধের দাম নেয় না, ওর ছেলের কোষ্ঠী আমি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওইসব রঙচঙে

ডাক্তারি জল খাওয়ার চাইতে খুচখাচ অসুখে দেশী টোটকায় কাজ হয় অনেক বেশি। সর্দিকাশি হলে আমি আদা দিয়ে চা খাই, বড়জোর মুখে দু-একদানা কাবাবচিনি রাখি। তাতেই দিব্যি সেরে যায়। কাবাবচিনি চেন তো? ওই যে, ছোট্ট ল্যাজওয়ালা গোলমরিচের মত দেখতে–

চা এসে গেল। সুরুৎ করে চুমুক দিয়ে তারানাথ বলল—আঃ! আদা-চায়ের কি তুলনা আছে? হ্যাঁ, গল্পটা যেন কোন পর্যন্ত বলেছিলাম?

কিশোরী বলল—মুখুজ্যেবাড়িতে চার মণ মাংস রান্না হচ্ছে—

-হ্যাঁ। তারপর রাত সাড়ে-দশটা নাগাদ সামিয়ানার নিচে সারি সারি পাত পড়ে। গেল। যজ্ঞিবাড়িতে পরিবেশন করবার জন্য পাড়াগাঁয়ে একদল দক্ষ লোক থাকে। এখানেও তেমন কিছু লোক কোমরে লাল গামছা বেঁধে কাজে নেমে পড়েছে। বড় কড়াইতে কলকল করছে ঘি, উঁচলো-মুখ বাঁখারির আগায় গেঁথে ভোলা হচ্ছে লুচির গোছা। গরম ঘি আর সদ্য ভাজা লুচির গন্ধে সমস্ত জায়গাটা আমোদ করেছে। এক একজন লোক যে পরিমাণ লুচি খাচ্ছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস

করা কঠিন। দেড়মণ ময়দায় শেষপর্যন্ত কুলোবে কিনা কে জানে। এখনকার তুলনায় সে ছিল অনেক সস্তাগণ্ডার বাজার, গাওয়া ঘি-তে লুচি ভেজে খাওয়াটা কোনও আহামরি ব্যাপার ছিল না। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের সের তখন দশ আনা কী বারো আনা, ভাবতে পারো? তবু একথা সত্যি যে, গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ ছিল গরীব। যতই সস্তা হোক, গাওয়া ঘিয়ে ভেজে লুচি খাওয়া তাদের কাছে স্বপ্ন ছিল। এসব দামী খাওয়া-দাওয়া একটু উচ্চবিত্ত পরিবারের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকত। পালেপার্বণে জমিদারবাড়িতে নেমন্তন্ন পেলে এরা কোমরের কষি ঢিলে করে খেতে বসে। খাওয়ার পর্ব চুকতে চুকতে রাত প্রায় সাড়ে বারোটা হল। একটা থেকে আরম্ভ হল কবিগানের আসর। সামনের সারিতে একটু কোণের দিকে আমাকে নিজের পাশে বসালেন দেবদর্শন। বললেন—ঠাকুরমশাই, কালকের দিনটাও থেকে যাবেন কিন্তু–

বললাম—শুধু কাল নয়, আমি আরও তিনদিন থাকব, লক্ষ্মীপূজো দেখে তারপর ফিরব–

কী একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও করলেন না দেবদর্শন। বললেন—খুব ভাল কথা, বেশ তো, বাঃ!

কবিগান হয় দুই বিরোধী পক্ষ নিয়ে। দুই পক্ষের তুমুল লড়াইতে আসর জমে ওঠে। রাম গোস্বামীর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। তারা নিজেদের মধ্যেই দুটো দল করে নেয়। তারপর চলতে থাকে চাপান-উতোর। প্রথমে মনে হয় নিজেদের ভেতরে সাঁটে গাইছে, এ কি আর তেমন জমবে? কিন্তু কিছুদূর এগুনোর পর দু-পক্ষের হুঙ্কার আর তেড়ে ওঠা দেখে বোঝা যায় ভেতরে আপোস থাকুক আর নাই থাকুক, আসর এবং গান জিনিসটা তারা ভালই বোঝে। তখনকার দিনে গ্রামাঞ্চলে হাততালি দেবার রেওয়াজ ছিল না, তার বদলে মানুষ হরিধ্বনি দিত। এখন ঘন ঘন 'হরি হরি' শুনে বুঝলাম আসর জমে গিয়েছে।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, সে সময়ে আসরে আলো করত কী দিয়ে? বিদ্যুতের তো প্রশ্নই ওঠে না, হ্যাজাক বা ডে-লাইটও বোধহয় আসেনি। অন্ধকারে নিশ্চয়। গান হত না—

তারানাথ বলল—ভাল প্রশ্ন করেছ। আলোর বিষয়টা সমস্যা ছিল ঠিকই, তবে ব্যবস্থা যা হত তা মন্দ নয়। মুখুজ্যেবাড়িতেই দেখেছি, সামিয়ানার নিচে বড় ঝাড়লণ্ঠন গোটাকতক ঝুলিয়ে দেওয়া হত। পঞ্চাশ, একশো বা দুশো

কাচের পাত্রের মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হত। এমন দু-খানা ঝাড়ে যেখানে অভিনয় বা গানবাজনা হচ্ছে সেই মঞ্চ যথেষ্ট আলোকিত হত। দর্শকদের বসবার জায়গার মাথার ওপরে বড় বড় কাচের ফানুস টাঙানো থাকত, তার ভেতরে জ্বলত তেলের বাতি। পরবর্তীকালে মোমবাতি বাজারে আসায় এবং ক্রমে সুলভ হওয়ায় মোমবাতিও জ্বলত। তোমরা ভাবছ এতে আর এমন কী আলো হত, আসরের কাজ চলত কী করে? ব্যাপার কী জানো, আজকাল ইলেকট্রিক আলো দেখে দেখে তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ, তুলনামূলকভাবে সেকালের এইসব আলোর আয়োজন তোমাদের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হবে। কিন্তু তখন গ্রামের মানুষ রাত্তিরে ঘরের কাজ করত রেড়ির তেলের প্রদীপে, তাও বেশি তেল খরচ করার সামর্থ্য কারোরই ছিল না। সন্ধের পর খাওয়া সেরে সবাই শুয়ে পড়ত। সাড়ে-আটটায় গভীর রাত। উৎসবে অনুষ্ঠানে ধনীর বাড়ি নেমন্তন্ন পেয়ে সেখানে গিয়ে এই আলোর বাহার দেখেই তারা মুগ্ধ হয়ে যেত—যা তোমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হচ্ছে। আমার বাবার কাছে শুনেছি, তার ছোটবেলায় প্রথম কেরাসিন তেলের বাতির ঔজ্জ্বল্য দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এ তো তবু ভাল, বলা যেতে পারে রীতিমত আধুনিক যুগ। আজ থেকে আশি-পঁচাশি বছর আগে কি হত জানো? আসরের চারদিকে কলাগাছের। মাথা কেটে মাটিতে

পুঁতে দেওয়া হত, তার ওপরে বসানো থাকত মাটির সরা। যাত্রা বা পালাগান আরম্ভ হলে সেই সরায় ধুনোর আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হত। ধুনোর আগুন বড় সাজ্ঘাতিক, রাত্তিরে পথ হাঁটার জন্য ধুনোর মশালও তৈরি করার রেওয়াজ ছিল। ওই সরাগুলোতে আগুন জ্বলে উঠত দাউ দাউ করে, আলোয় আলো হয়ে যেত চারদিক। কয়েকজন তোক বগলিতে ধুনো নিয়ে আলোর তদারক করে বেড়াত। কোথাও আগুন কমে এলে বগলি থেকে মুঠো করে ধুনো তুলে সরায় ছুঁড়ে দিত, আবার আগুন জ্বলে উঠত আগের তেজে।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলেছে তারানাথ, এবার দম নেবার জন্য থেমে সিগারেট ধরাল। মৌজ করে কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে বলল—তোমরা আলোর কথা তুললে, কিন্তু অত বড় আসরে দর্শক-শ্রোতারা গায়ক বা অভিনেতার গলা শুনতে পেত কী করে সে কথা জিজ্ঞাসা করলে না। আজকাল দেখছি বাজারে লাউডস্পীকার বলে যন্ত্র উঠেছে, সে যন্ত্রের সামনে মুখ রেখে কথা বললে চোঙের মধ্যে দিয়ে বিকট আওয়াজ বেরোয়। সে যুগে স্বপ্নেও এমন কাণ্ডের কথা কেউ ভাবেনি। তখন কী করত মানুষ?

বললাম-এটা তো সত্যিই তেমন করে ভাবিনি। কী

করত তারা?

তারানাথ হেসে বলল—তোমরা ভাবছ তারানাথ চক্কোত্তি আবার একখানা অসম্ভব। কিছু কলাকৌশলের কথা বলবে, শুনে সবার তাক লেগে যাবে। না হে, তেমন কোনও উপায় ছিল না সেকালে। কবিয়াল বা যাত্রার অভিনেতার গলার জোরে দর্শকদের সংলাপ শোনাতে হত। আমি তেমন কয়েকজনকে দেখেছি। বাপরে, কী তাদের চেহারা, কী তাদের সাগরের গর্জনের মত গলার আওয়াজ! নৃপেন সেন্নাম ছিল আমাদের ছোটবেলার নামকরা অভিনেতা। সে যখন রাবণের ভূমিকায় নেমে হুঙ্কার ছাড়ত, আসরে বসে থাকা মায়েদের কোলে ঘুমন্ত বাচ্চারা জেগে উঠে তারস্বরে কান্না জুড়ে দিত। বুকের কাপড় সরিয়ে মায়েরা ছেলের মুখে ইয়ে গুঁজে দিয়ে তবে তাদের শান্ত করত। শুনেছি আসরে বাচ্চারা বেশি কাঁদলে বিরক্ত শ্রোতারা তাদের কান্না থামাবার সহজ উপায়টা একযোগে চিৎকার করে মায়েদের বাতলেও দিত।

প্রায় শেষরাত্তিরে আলো ফোটবার কিছু আগে আসর ভাঙলো। দেবদর্শন আর আমি পূজোমণ্ডপ থেকে হেঁটে আসছি কাছারিবাড়ির দিকে, মাঝখানে জমিটুকু ঘন অন্ধকার, হঠাৎ দেউড়ির ওপারে দেবদর্শনের ভদ্রাসনের দিকে তাকিয়ে একটা

অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। এ সমস্ত বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে একটা মৃদু শান্ত নীল আলোর আভা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। লক্ষণ, প্রতিলক্ষণ, দৈব, কূটপ্রসার—এসব নিদর্শন বিচার করেই আমাদের চলতে হয়। নীল আলোটা দেখে বুঝলাম এই বাড়িকে ভগবান আশীর্বাদ করেছেন। এখানে কিছুদিনের ভেতর খুব ভাল কিছু একটা ঘটবে।

নবম

আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে

আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে দেবদর্শনও দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হল ঠাকুরমশাই? দাঁড়িয়ে পড়লেন যে?

বুঝলাম নীল আলোটা উনি দেখতে পাচ্ছেন না। না পাওয়ারই কথা।

বললাম—কিছু না। আজ শুক্লপক্ষের একাদশী পড়ে গিয়েছে, চাঁদের আলো সামান্য হলেও থাকা উচিত ছিল। এত অন্ধকার হল কীভাবে?

দেবদর্শন বললেন-চাঁদ আকাশে আছে ঠাকুরমশাই। পশ্চিমে হেলে পড়েছে কিনা, আমবাগানের আড়ালে বলে দেখতে পাচ্ছেন না—

–বড় অন্ধকার, তাই না?

—যা বলেছেন। নিজের বাড়িটাই দেখতে পাচ্ছি না—

এই জিনিসটা বরাবর আমাকে অবাক করেছে। স্পষ্ট, সুন্দর নীল আলোয় উদ্ভাসিত। হয়ে আছে মুখুজ্যেবাড়ি। কিন্তু আমি ছাড়া কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না। আমার মানসিক শক্তি খানিকটা দেবদর্শনের মধ্যে সঞ্চারিত করে ওঁকে আলোটা দেখাতে পারতাম, কিন্তু এ ধরণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মুখখামুখি হওয়ার জন্য কিছুটা পূর্বপ্রস্তুতি দরকার। নইলে উনি ভয় পেয়ে যেতেন।

বৈঠকখানায় বসে দেবদর্শন বললেন—সারারাত তো জেগে, তাছাড়া কয়েকদিন ধরে আপনার পরিশ্রমও কম যাচ্ছে না। একটু ঘুমিয়ে নেবেন নাকি?

তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত। পূব আকাশে প্রাক্-ঊষার হালকা

আভাস। বৈঠকখানার পাশে একটা বড় জগডুমুর গাছের ডালে ভোরের প্রথম দোয়েলপাখি ডাকতে শুরু করেছে। রাত্তিরে না ঘুমোলেও ঠিক এইসময়টায় আর কোনো জড়তা থাকে না, ঈশ্বরের আশীর্বাদ। হয়ে মনের ভেতর পবিত্রতা জেগে ওঠে, সকালের আলো ফুটে ওঠে। বললাম—না মুখুজ্যেমশাই, এখন আর শোব না—

–বসুন তাহলে, গল্প করা যাক। আমিও শোবো না। রঘু, তামাক দিয়ে যা–

দুপুরে খাওয়ার পর দেবদর্শন বললেন—মাছ ধরার নেশা আছে?

—খুব। আমার গ্রামে আমি ছোটবেলা থেকে মেছো তারানাথ বলে বিখ্যাত। কেন বলুন তো?

—চলুন, কাল তাহলে রাণীদীঘিতে মাছ ধরা যাক। আমার শ্বশুরবাড়ির কয়েকজন আত্মীয়েরও আসার কথা আছে, সবাইকে কাল রাত্তিরে লুচি আর মাছের কালিয়া খাওয়াবো–

বললাম–রাণীদীঘি কোথায়?

—বেশীদূর নয়। ওই আমবাগানটার পেছনে। বেশ গাছপালার ছায়ায় ঢাকা সুন্দর পরিবেশ। মনের মত পরিবেশ না হলে মাছ ধরে সুখ নেই, বলুন ঠাকুরমশাই?।

এই শেষের দফায় আমি দেবদর্শনকে একজন পাকা মেছুড়ে বলে চিনতে পারলাম। অনেক মাছ ধরাটা বড় কথা নয়, পরিবেশ এবং মাছ ধরার উদ্যোগটাই বড় কথা।

বললাম–ঠিক বলেছেন। দীঘিতে ভাল মাছ আছে? টোপে ঠোকরায়?

দেবদর্শন হাসলেন, বললেন—প্রচুর মাছ আছে। ও দীঘি জমিদারবাড়ির নিজস্ব সম্পত্তি, বাইরের কেউ ব্যবহার করে না। পালে-পার্বণে জাল ফেলা হয়, প্রয়োজনমত সামান্য মাছ রেখে বাকি আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। এমন অনেক মাছ আছে যাদের ওজন বিশ-ত্রিশ সের, গায়ে শ্যাওলা গজিয়ে গিয়েছে। তবে টোপে ঠোকরাবে কিনা সে তো অনেকটা কপালের ব্যাপার–

—জাল ফেলে দরকারমত মাছ ধরে নিতে পারেন তো?

ছিপে যদি না আসে?

–না, আত্মীয়দের বলেছি নিজে মাছ ধরব। এখন জাল ফেলাটা—

বুঝলাম এখন কিছু মাছ অন্তত নিজে না ধরলে শ্বশুরবাড়ির মানুষদের কাছে তাঁর সম্মান থাকবে না। একটু ভাবনাও হল। শরৎকালের এই সময়টায় চারে মাছ আসবে কি? এটা ঠিক মাছ ধরার সময় নয়। দেবদর্শন মানুষটি বড় ভাল, নিজে মাছ ধরে আত্মীয়দের খাওয়াবেন—এই সামান্য সাধটুকু পূর্ণ না হলে মনে ভারি দুঃখ পাবেন। কী করা যায়?

বিকেলের ছায়া গাঢ় হয়ে এলে গ্রামের পথে একটু বেড়াতে বের হলাম। শরৎসন্ধ্যার একটা আলাদা স্নিগ্ধ রূপ আছে। ঝোপঝাড় থেকে কেমন সুন্দর মিষ্টি গন্ধ বের হয়, মাথার ওপর দিয়ে পাখিরা বাসার দিকে উড়ে যায়। মাঠে-প্রান্তরে হাল্কা কুয়াশা জমে, ঈষৎ হিমের ছোঁয়া আর বেলাশেষের আলো হঠাৎই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। একটা জিনিস কখনও লক্ষ্য করেছ? সন্ধ্যের সময় যত পাখি আকাশে ওড়ে তারা সব পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়, উল্টোদিকে খুব একটা কাউকে যেতে দেখবে না। অর্থাৎ

কোনও অজ্ঞাত কারণে পাখিরা দিনের বেলা নিজেদের বাসার পূর্বদিকে ঘোরাফেরা করে। কী করে তারা দিক চিনতে পারে কে জানে!

পথের বাঁকে একজায়গায় একটা বড় আকন্দগাছ প্রায় আমার মাথা ছাড়িয়ে লম্বা। বড় বড় চ্যাটালো, ফ্যাকাসে সবুজ পাতায় ভরপুর প্রাণশক্তি প্রকাশিত হয়েছে। সে গাছ থেকে বুড়ো আঙুলের মত মোটা আর কড়ে আঙুলের মত লম্বা কিছুটা ডাল ভেঙে নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখলাম। যাক, কাজ অন্তত কিছু এগিয়ে রইল।

সন্ধ্যে গাঢ় হতে মুখুজ্যেবাড়ি ফিরে এলাম। দেউড়িতে বসে বাতির কঁচ পরিষ্কার করছিল রঘু, তাকে বললাম—হাতের কাজটা শেষ করে আমাকে একটা নরুণ এনে দিতে পার?

—আজ্ঞে, নরুণ? নখ কাটবেন বুঝি? কাল সকালে নলিন পরামাণিককে পাঠিয়ে দেব?

—কারুকে পাঠাতে হবে না। তুমি একটা নরুণ আমাকে দিয়ে যাও—

কিছুক্ষণ পরে রঘু অতিথিশালার ঘরে এসে একটা চকচকে নরুণ দিয়ে গেল।

রাত্তিরে খাওয়ার পরে বসে বসে নরুণ দিয়ে আকন্দগাছের ডাল থেকে একটা ছোট্ট গণেশমূর্তি কুঁদে বের করলাম। আকন্দকাঠ নরম, তাই অসুবিধে হল না। দেখতে বেশ ভালই হল। গণেশমূর্তি বানানোর একটা সুবিধে আছে, নাদা পেট আর সামনে শুড় দুলিয়ে দিলেই গণেশ। খুব বড় শিল্পী হওয়ার দরকার পড়ে না। মোটামুটি আদল আনতে পারলেই জিনিসটা কী তা বোঝা যায়।

পূজো উপলক্ষ্যে কাছারি এখন বন্ধ। নায়েবমশাইকে বলেছিলাম একটা নীলের বড়ি আমাকে জোগাড় করে দিতে। উনি কাছারির দরজা খুলে লেখার কালি বানাবার একখানা বড়ি এনে দিয়েছিলেন বিকেলে। মাটির ভাঁড়ে কুঁজো থেকে জল ঢেলে তাতে বড়ি গুলে গাঢ় নীল কালি বানিয়ে তাতে গণেশমূর্তি ভিজিয়ে রাখলাম কিছুক্ষণ। যখন তুললাম তখন সাদা আকন্দকাঠ রঙ টেনে কটকটে নীল হয়ে গিয়েছে।

তারানাথ সিগারেট ধরাবার জন্য থামল। জিজ্ঞাসা করলাম—নীল গণেশ দিয়ে কী হয়?

—নীল গণেশ খুব শুভকারী দেবতা। সঠিক আরাধনা করতে পারলে ওকে দিয়ে করানো যায় না এমন কাজ নেই। তোমাদের আগেও নীল গণেশের কথা বলেছি, তোমাদের মনে নেই।

যাই হোক, পরদিন সকালে জলখাবার খাওয়ার পর মুখুজ্যেমশাইয়ের ডাক এল। সরঞ্জাম তৈরি, এবার মাছ ধরতে যাওয়া হবে। কাছারিবাড়ির সামনে দেখি দেবদর্শন ব্যস্ত হয়ে কর্মচারীকে কী করতে হবে বোঝাচ্ছেন। একজন ভৃত্য পাঁচ-ছ'গাছা ছিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে, মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে নানামাপের কৌটো আর ভঁড়। তা থেকে মনোমুগ্ধকর। সব গন্ধ বের হচ্ছে। হঠাৎ সম্মিলিত গলার কোলাহল শুনে দেখি কয়েকজন ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এদিকে আসছেন। বুঝলাম এঁরাই দেবদর্শনের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়, এঁদের সামনেই তিনি মাছ ধরে দেখাতে চান।

রাণীদীঘি সত্যিই একটা বিশাল জলাশয়। এপার থেকে ওপারে দাঁড়ানো মানুষকে ভাল চেনা যায় না। যেখানে মাছ ধরতে বসা হবে সেখানে বাড়ির মেয়েদের স্নান করার জন্য বাঁধানো ঘাট, কয়েকখানা প্রাচীন আমকাঠালের ছায়ায় স্নিগ্ধ

হয়ে আছে। দু-চারটে কলাপাতা পেতে দেবদর্শন মাছ ধরতে বসে গেলেন। একটু উঁচুতে পৈঠার ওপর শতরঞ্জি ভাঁজ করে বসলেন অতিথিরা। সকাল-বিকেলে সামান্য হিমের ভাব থাকলেও বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে রোদ্র বেশ চড়বড় করে বেড়ে ওঠে। কিন্তু এখানে সারাদিনই ছায়া থাকবে মনে হয়।

চুপ চুপ শব্দ করে জলে চার ছড়াচ্ছেন দেবদর্শন, গন্ধে চারদিক মম করছে। পুরুষ্টু কেঁচো দিয়ে টোপ গাঁথা হল, শক্ত মুঠোয় ছিপ ধরে তীক্ষ্ণ চোখ করে বসলেন বটে, কিন্তু জমিদারমশাই আজ কতটা সফল হবেন সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রইল। গত কুড়ি বছর ধরে মাছ ধরে আসছি, শরতের সকালে টোপে মাছ ঠোকরাতে খুব একটা দেখিনি।

দেবদর্শন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন-ঠাকুরমশাইও একটা ছিপ নিয়ে বসে যান না, শুধু দেখবেন কেন?

–না, আজ আপনিই ধরুন! আজ আর হাত লাগাতে ইচ্ছে করছে না।

মাছ ধরতে ইচ্ছে করছিল না এমন নয়, কিন্তু ভাগ্যবশে ওঁর বদলে আমার ছিপে মাছ উঠলে উনি দুঃখ পেতেন। আর

সত্যিকারের মেছুড়ে মাছ ধরা দেখতেও ভালবাসে। উনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন না। আমিও দেবদর্শনের পেছনে একখানা কলাপাতা পেতে বসে পড়লাম।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটতে চলল। দুপুরে খাওয়ার সময় পর্যন্ত একটা মাছও চারে এল না। একসময় ছিপ গুটিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে দেবদর্শন বললেন—চলুন, খেয়ে আসা যাক। তারপর আবার বসা যাবে। ততক্ষণ চার আর একটু জমুক–

আত্মীয়ের দলটিও একটু উসখুস করছিল, তারাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিচু স্বরে বললাম—চিন্তা নেই। খেয়ে এসে বসুন, মাছ পাবেন–

দেবদর্শন চমকে আমার দিকে তাকালেন, মুখে কিছু বললেন না, আমি একটু হাসলাম।

প্রথম হেমন্তের বেলা চট করে পড়ে আসে। খাওয়ার পরেই আর দেরি না করে। আবার রাণীদীঘির পাড়ে ফিরে আসা হল। ছিপ মুঠো করে বসে গেলেন দেবদর্শন।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম জমিদারমশাইয়ের সব আত্মীয়েরা এখনও এসে পৌঁছোয় নি। যারা এসেছেন তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন, এদিকে কারো তেমন মনোযোগ নেই। আমি ধুতির ভাঁজে লুকিয়ে রাখা নীল গণেশের মূর্তিটা বের করে দেবদর্শনের মাথার ওপর দিয়ে দীঘির জলে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম-শ্বেতর্ক নির্মিতং গণনাথং পঞ্চান্তকং ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা।

দেবদর্শন চমকে উঠে ফিরে তাকালেন, তাঁর চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি। বললেন—কে কী ফেলল জলে? এঃ, মাছ পালিয়ে যাবে যে! এতক্ষণে হয়ত চার একটু জমে আসছিল–

—ভাবনা নেই। ও আমি একটা জিনিস ফেলেছি—

–আপনি! সে কি! কী জিনিস?

উত্তরে বললাম—ঘুরে বসুন মুখুজ্যেমশাই। বাঁদিকের ছিপের ফাতনা কাঁপছে।

বড় মাছ। দু-তিনবার কেঁপে ফাতনা একেবারে নিতলি হয়ে গেল।

হর্ষধ্বনি করে আত্মীয়ের দল উঠে দাঁড়াল। ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে ছিপ, মাছ ছুটেছে দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণ লক্ষ্য করে। কিরকির আওয়াজ করে ঘুরে যাচ্ছে হুইল। গতকাল তামাক খেতে খেতে তার মাছ ধরার সরঞ্জাম দেখিয়েছিলেন দেবদর্শন। কলকাতায় তোক পাঠিয়ে অনেক খরচ করে কিনে আনা মূল্যবান বর্মী বাঁশের ছিপ, বিলিতি হুইল আর বঁড়শি—খাঁটি ইস্পাতের তৈরি। শক্ত মুগার সূতো, মথুরা থেকে আনানো ময়ূরের পাখার ফাতনা—যত বড় মাছই হোক, একবার গাঁথলে আর সহসা ছাড়া পাবার উপায় নেই।

প্রায় পৌনে একঘণ্টা খেলাবার পর হুইল গুটিয়ে ঘাটের কাছে মাছটা টেনে আনলেন দেবদর্শন। তাঁর গা বেয়ে ঘাম ঝরছে। কিন্তু মুখ উজ্জ্বল। বড় মাছ গেঁথেছে এ খবর রটে যাওয়ায় রাণীদীঘির পাড়ে ভিড় জমে গিয়েছে। অনেকক্ষণ লড়ে যদিও মাছটা নির্জীব হয়ে পড়েছে, তবু জলের ভেতর ও জিনিস বাঘের মত শক্তি ধরে। রঘু এবং আরও তিনজন লোক জলে নেমে পাঁজাকোলা করে জাপটে মাছটা ওপরে তুলে এনে ঘাটের পৈঠায় শুইয়ে দিল। অস্ফুট শব্দে ভিড় ঝুঁকে পড়ল সামনে।

চোদ্দ-পনেরো সের ওজনের বিশাল লালচে রুই। একটা বাছুরের মত বড়।

সবাই নানারকম প্রশংসাসূচক কথা বলছে, কেউ ফিতে এনে মাছটা মাপার কথা বলছে। আমি তাকিয়েছিলাম দেবদর্শনের দিকে। তিনি ভারি খুশি হয়েছেন। মানুষটির মনের মধ্যে কোনো ঘোরপ্যাচ নেই, এইটুকু কৃতিত্বতেই ভদ্রলোক তৃপ্ত।

বললাম—এতে হবে তো? না আর একখানা ধরবেন?

দেবদর্শন বললেন—না, না, এতেই খুব হয়ে যাবে। আজ তো কেবল বাড়ির লোক আর এই এঁরা, সবমিলিয়ে ধরুন তিরিশজন। মুড়ো আর আঁশ-টাশ বাদ দিয়ে যদি দশ কী এগারো সের মাছও পাই, তাহলেও ভেসে যাবে। আর ধরা উচিত হবে না, কোনো কিছুর অপচয় করতে নেই।

তারপর বললেন–সুন্দর মাছটা, বলুন? এর মুড়োটা কিন্তু আজ আপনাকে খেতে হবে–

—সে কী! আমি কেন? নিয়ম জানেন না? মাছ যে

ধরেছে মুড়ো তাকেই খেতে হয়?

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেবদর্শন বললেন—সেইজন্যই তো মুছোটা আপনি খাবেন। নিয়ম জানি বলেই তো এ কথা বলছি–

আমরা দুজন কয়েকমুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আমি হেসে বললাম—বেশ তো, মুড়ো খেতে হয় খাব। কিন্তু মাছটা আপনিই ধরেছেন।

সবকিছু বাদ দিয়ে মোট সাড়ে বারোসের মাছ পাওয়া গেল। পেটভরে মাছ খেয়ে সবাই ভারি খুশি। কেবল খেতে খেতে দেবদর্শন হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

পরের দুটো দিন ভালই কাটল। খাই-দাই আর গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াই। সত্যি বলতে কী, এ ক'দিন আরামে থেকে থেকে আমার অভ্যেসটাই খারাপ হয়ে গেল। আর বড় জোর দুদিন, তারপর আবার বেরিয়ে পড়তে হবে পথে।

বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে যে পথটা বেঁকে নদীর দিকে চলে গেল, সেই পথে সন্ধ্যের দিকে রোজ হাঁটতাম। দুদিন

পরে পূর্ণিমা, রাঙা চাদটা পূব দিগন্তের একটু ওপরে ভেসে থাকে দেবতাদের দেওয়া আকাশপ্রদীপের মত। আমবাগানের ওপারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে শেয়ালের দল একসঙ্গে ডেকে ওঠে। বর্ষা চলে যাবার পর জোনাকির ঝক বিদায় নিয়েছে, তবু দেরি করে রয়ে যাওয়া দু-দশটা গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে জ্বলেনেভে। বাংলার পল্লী অঞ্চলের এই পরিবেশ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শহুরে চালচলন আর ভাবধারা ঢুকে পড়েছে গ্রামে। তোমরা যারা দেখেছ তারা জানো, তোমাদের সন্তানেরা হয়ত এ জিনিস আর পাবে না।

লক্ষ্মীপূজোর দিন খুব ভোরে উঠে শিশিরভেজা ঘাসের পথে হেঁটে নদীতে স্নান করতে গেলাম। হেমন্তের সকালে অবগাহন স্নান ভারি আরামের, একটা পবিত্রতার বোধ এনে দেয়।

স্নান করে ফিরতে রঘু এসে বলল—ঠাকুরমশাই, কর্তাবাবু বৈঠকখানায় এসে বসেছেন। আপনাকে ডাকছেন। আপনি আজ ওখানেই জলখাবার খাবেন।

বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে আলবোলার নলে টান দিচ্ছেন দেবদর্শন। এই সকালেই তাঁরও মান হয়ে গিয়েছে। আমাকে দেখে বললেন—বসুন। ওরে রঘু, ঠাকুরমশাইকে তামাক দিয়ে যা।

তামাক এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জলখাবার। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা খাস্তা পরোটা, বেগুনভাজা এবং একথাবা সর—তার ওপরে মোটা করে চিনি ছড়ানো। বললাম—একি! আমার একার জন্য কেন? আপনার কই?

—আমি এখন খাব না। কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমায় আমি সারাদিন নির্জলা উপোস করি। রাত্তিরে একেবারে পূজোর পর অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ নেব। আপনি সঙ্কোচ বোধ করবেন না, শুরু করুন।

তারপর তামাকের নলে গোটাদুই লম্বা টান দিয়ে বললেন—আজ আপনাকে একটা মজার জিনিস খাওয়াব

—আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে কেবলই তো নানারকম খাবার খাচ্ছি। আজ আবার কী?

—আজকেরটা ঠিক খাবার বলা যায় না, বরং পানীয় বলতে পারেন–

একটু অবাক হয়ে বললাম—পানীয়! তার মানে–কিন্তু আপনি তো-ইয়ে, কী পানীয়ের কথা বলছেন?

দেবদর্শন হাসলেন, বললেন—ভয় নেই, কড়া কোনও পানীয় নয়। আপনাকে গড়গড়ির জল খাওয়াব–

—গড়গড়ির জল! সে আবার কী?

মুখ থেকে নল নামিয়ে দেবদর্শন বললেন—একমাত্র শীতকাল ছাড়া আমাদের দেশে তেমন ঠাণ্ডা খাবার জল পাওয়া যায় না। গরমকালে মাটির জালায় রাখা হলে কিছুটা ঠাণ্ডা হয় ঠিক, কিন্তু একেবারে বরফজলের মত তো আর হয় না। আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে বরফ পাওয়াও যায় না, তাই কোনো ঘরোয়া উৎসবে অতিথিদের দাঁত শিরশির করা কনকনে জল খাওয়াবার ইচ্ছে হলে আমি গড়গড়ির জলের ব্যবস্থা করি।

—সে তো বুঝলুম, কিন্তু জিনিসটা কী?

—মোগল আমলে সম্রাটেরা এই পদ্ধতিতে জল ঠাণ্ডা করতেন। একটা বড় পেতলের হাঁড়ির মধ্যে অর্ধেক ভর্তি করে জল ঢেলে তাতে বেশ কিছুটা সোরা মিশিয়ে দেওয়া হয়। কালীপূজো আসছে, গ্রামের ছেলেপুলেরা অনেকেই আতসবাজি তৈরি করে, তাই এ সময়টায় সারের দোকানে সোরা পাওয়া যায়। একটা কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে ভাল করে খুঁটে দিলে জলটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এবার একটা জলভর্তি সরু গলা ধাতুর পাত্র ওই হাঁড়ির মধ্যে বসিয়ে দিলে আধঘণ্টার ভেতর সে জলও কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভরপেট খাবার পর ঠাণ্ডা জল ভারি তৃপ্তিদায়ক, বলুন?

বলবার আর বিশেষ কী ছিল, দুপুরে আহারাদির পর গড়গড়ির জল খেয়ে হাতেনাতে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। দেবদর্শনের সব অতিথিরাই সে জল খেয়ে অবাক।

দুপুরের পর থেকে মেয়েরা বসে গেলেন পূজোদালানের মেঝেতে চালবাটা দিয়ে আলপনা দিতে। এই জিনিসটা আমাকে চিরকাল মুগ্ধ আর বিস্মিত করে। বাঙালীর জীবনে যতই বারো মাসে তেরো পার্বণ হোক, মাসে পনেরোদিন তো আর মেয়েদের আলপনা দেবার জন্য বসতে হয় না। তাহলে

নিয়মিত অভ্যাস ছাড়া তারা এত সুন্দর আর নিখুঁত আলপনা দেন কী করে? পরিষ্কার মেঝেতে যেন জাদুবনে ফুটে উঠছে ছোট ছোট কুটির, তার দুপাশে কলাগাছ, সামনে সরু পথ—সে পথে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা। তাছাড়া ধানের গোলা, ধানের ছড়া। পাশেই বসে রয়েছে গম্ভীরমুখ পাচা। বড় বড় কানওয়ালা সে পাচারা আসল প্যাঁচার চাইতেও দেখতে অনেক ভাল।

সূর্য অস্ত গেল। পুরোপুরি অন্ধকার নামবার আগেই পূবদিগন্ত বেয়ে উঠে এল সোনালি রঙের পূর্ণিমার চাঁদ। আমাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে দেবদর্শন স্নান করতে গিয়েছিলেন। এবার স্নান সেরে গরদের ধূতি আর চাদর পরে এসে তিনি বললেন—চলুন ঠাকুরমশাই, পূজোর সময় হয়েছে—

আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই হঠাৎ বাইরে কীসের একটা হই-চই শোনা গেল। ঘরে এসে ঢুকল রঘু, নায়েবমশাই এবং আরও কয়েকজন লোক। তারা সবাই খুব উত্তেজিত, সবাই একসঙ্গে কী একটা বলতে চাইছে। দেবদর্শন অবাক হয়ে বললেন—কী হয়েছে? কী ব্যাপার?

তারা কিছু বলবার আগেই ভিড়ের পেছন থেকে এগিয়ে এল একজন মানুষ। সেও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

লোকটি ভূষণ রায়।

দেবদর্শন বললেন—একি ভূষণ! কী হয়েছে? গোলমাল কীসের?

দশম

ঘরের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠিত নীরবতা

ঘরের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠিত নীরবতা। কিন্তু দেবদর্শনের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম ভূষণ রায় কিছু বলার আগেই উনি উত্তরটা জেনে গিয়েছেন।

ভূষণ রায় বললেন–রাজাবাবু! আপনি বিলিতি ডার্বির সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছেন! আশি হাজার টাকা। এই একটু আগে টেলিগ্রামে খবর এসেছে।

বলতে বলতে ভূষণ রায় উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ে দুইহাতে নিজের মাথা ধরে রইলেন। হঠাৎ

দেখলে মনে হবে তিনি এক্ষুণি একটা ভয়ানক খারাপ খবর পেয়েছেন। আসলে চরম শোক আর চরম উল্লাসের প্রকাশ অনেকটা একই রকম।

বাইরে একটা সম্মিলিত গলার কোলাহল শুরু হল। এসব খবর বাতাসের মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যারা পূজো দেখতে আর প্রসাদ পেতে এসেছে তারা সবাই চেঁচাচ্ছে—জয় রাজাবাবু! জয় মা লক্ষ্মী! যারা দেরী করছিল তারাও খবর পেয়ে দলে দলে এসে ভিড় বাড়াচ্ছে। মানে ভূষণ রায় আসবার পথে খবরটা ছড়াতে ছড়াতে এসেছেন।

দেবদর্শন আমার হাতদুটো একবার চেপে ধরলেন। তার চোখে বিস্মিত কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি। তারপর বললেন—একটু বসুন। আমি একবার ভেতর থেকে আসছি। বাইরে গোলমাল শুনে ওঁরা হয়ত ভয় পাচ্ছেন।

একটা বাদেই বাড়ির ভেতর থেকে উলুধ্বনি আর শাঁখের আওয়াজ ভেসে এল। বুঝলাম দেবতার কাছে পারিবারিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে।

ভূষণ রায় এখনও মাটিতেই বসে আছেন। মানুষটি

এমনিতে নম্র আর নিরীহ হলেও বেশ বুদ্ধিমান। কথা বিক্রি করে যাদের খেতে হয় তাদের বোকা হলে চলে না। কিন্তু বাস্তব ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি বর্তমানে কেমন যেন থতিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে বিগলিত অর্থহীন হাসি হাসছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার বিক্রি করা টিকিটে এর আগে কখনও প্রাইজ উঠেছে?

মাথা নেড়ে ভূষণ রায় বললেন—নাঃ। কক্ষণো না। এই প্রথম–

—ছোটখাট প্রাইজও ওঠেনি কখনও? দু-পাঁচশো কিম্বা অমনি কিছু?

—না ঠাকুরমশাই। প্রাইজের টাকার কমিশন কখনও চোখে দেখিনি, কেবল টিকিট বিক্রি করলে টাকায় ছ-পয়সা করে পাই। তাতে কি সংসার চলে? আমার ছাতা আর জামা-জুতোর তালি দেখুন, বাড়ি গিয়ে ডিগডিগে ছেলেপুলেগুলোকে দেখে আসুন এবার পুজোয় কারও জামাকাপড় হয়নি ঠাকুরমশাই।

—এই টাকা থেকে আপনি কত পাবেন?

–কোম্পানী থেকে বেশি নয়। বেশির ভাগটাই নিয়ে নেবে কলকাতার যে আসল এজেন্ট, সে। আমাকে হাজার দুয়েক দেবে বোধহয়। কী আর করব? যা দেয় তাই অনেক। তবে রাজাবাবু মানুষ খুব ভাল, উনি কি আর কিছু দেবেন না? নিশ্চয় দেবেন—উনি আমাকে ভালবাসেন–

দেবদর্শন ভেতর থেকে ফিরে এলেন। তক্তাপোষে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে প্রথমেই বললেন—ভূষণ, এর থেকে পাঁচ হাজার টাকা আমি তোমাকে দেব। তোমার জন্যই তো প্রাইজটা পেলাম—

ভূষণ রায় তার দিকে তাকিয়ে বললেন-আমার জন্য নয়, এই যে এই ঠাকুরমশাইয়ের জন্য। আমার টিকিটে কিছুই পেতেন না, ইনি বেছে দিয়েছিলেন বলেই–

—সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক। যাক, তোমরা এখন সবাই পুজোর মণ্ডপে যাও। আমিও আসছি–

উপস্থিত লোকেরা টিকিট পছন্দ এবং বদলানোর ব্যাপারটা কিছুই জানে না। তারা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে

আছে। ভূষণ রায় বললেন—চল, চল হে। পুজোর জায়গায় চল। রাজাবাবু বিশ্রাম করে আসছেন—

ভূষণ রায় গপ্পে লোক, বুঝলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই টিকিট বদল করে দেবার ঘটনাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এও বুঝলাম যে, হয় কাল, নয় পরশু সকালে আমাকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভূষণ রায়ের গল্প শুনলেই মানুষের স্রোত শুরু হবে—কারও সন্তান হয়ে বাঁচে না, কারও অম্লশূলের ব্যথা, কারও ভাই মামলা করেছে, কেউ বা আবার হঠযোগ শিখতে চায়। পালানো ছাড়া গতি নেই।

কিশোরী বলল-পালাবেন কেন? আপনি কি এসবের প্রতিবিধান করতে পারেন না?

একটু চুপ করে থেকে তারানাথ বলল-হয়ত পারি। বিশ্বের যাবতীয় দুঃখকষ্ট দূর করার ক্ষমতা যদি আমার থাকত তাহলে আমি অন্য সব কিছু ছেড়ে সেই কাজে লেগে পড়তাম। তা নয়। আসলে মধুসুন্দরী দেবী আর বীরভূমের শ্মশানের মাতু পাগলী আমাকে কিছু সাধারণ ক্ষমতা দিয়েছিলেন, খুব মাঝারি সিদ্ধাই গোছের জিনিস। তা দিয়ে চটজলদি ভেলকি দেখানো যায়, কিন্তু তার চেয়ে বড় মাপের

কিছু হয় না। এককালে টাকা উপার্জন করার জন্য তাও করেছি। সে সময়টা তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়নি। আমার বাড়ির সামনে মাড়োয়ারীদের মোটরগাড়ির ভিড় লেগে থাকত। বেশি ব্যবহারে আর। অপব্যবহারে সে শক্তি চলে গেল, তারপর থেকেই এই খারাপ সময় যাচ্ছে–

খারাপ সময় যে যাচ্ছে তাতে আর সন্দেহ কী? প্রথম যেদিন আমরা আলাপ করতে এসেছিলাম, সেদিন আমাদের পাওনাদার ভেবে তারানাথ প্রথমে বাইরে আসেনি। তার ছেলে এসে আমাদের কী প্রয়োজন জেনে ভেতরে গিয়ে খবর দিতে তারপর তারানাথ। বেরিয়েছিল। মানুষ হিসেবে তার চরিত্র আদর্শ বা প্রশংসনীয় হয়ত নয়, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের একটা আশ্চর্য আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। তার গল্প বিশ্বাস হোক বা না-ই হোক, শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠে আসার উপায় থাকে না।

তারানাথ আবার বলতে শুরু করল।

উজ্জ্বলমুখে বাড়ির ভেতর থেকে ফিরে এলেন দেবদর্শন। বললাম-কী, কেমন লাগছে?

মানুষটি অত্যন্ত সংযমী! যে খবর তিনি একটু আগে

শুনেছেন অন্য কেউ সে সংবাদ পেলে কী যে করত তার ঠিক নেই। কিন্তু দেবদর্শন বাইরে কোনও উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে সবাইকে বললেন–যাও, তোমরা পুজোর জায়গায় যাও। আমি আসছি—

তাপোষের একপাশে বসে তাকিয়ায় কনুই রেখে হেলান দিয়ে দেবদর্শন, তারপর বললেন—ঠাকুরমশাই, টাকাটা তাহলে পাইয়েই দিলেন?

হেসে বললাম—আমি কেন? টিকিট বিক্রি করেছে ভূষণ রায়, কিনেছেন আপনি। ঘোড়া দৌড়েছে বিলেতে, খবর এসেছে ডাকবিভাগের টেলিগ্রামে—আমি কী করলাম?

দেবদর্শন মিষ্টি করে হাসলেন। তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপটাই মিষ্টি।

—ওসব কথা থাক, আপনি কী করেছেন আমি তা জানি। কেবল কয়েকটা জিনিস ঠিক বুঝতে পারছি না–

—যেমন? কী জিনিস?

—আবছা আবছা বুঝতে পারছি অমরজীবনের ছড়ার সঙ্গে টিকিটের নম্বরের একটা কিছু যোগ আছে। নইলে ভূষণ রায়ের পছন্দ করে দেওয়া টিকিট আপনি বদলাতে বলবেন কেন? ছড়াটার মানেই বা কী?

বললাম—মুখুজ্যেমশাই, অমরজীবন ছড়ার মধ্যে যে সংকেত ব্যবহার করেছিল সেটা একটা পুরনো ধাঁধা। আমাদের ছোটবেলায় দেশে ঘরে খুব প্রচলিত ছিল। নানারকম চেহারায় এই ধাঁধা বাসরঘরে কিংবা বাড়িতে জামাই এলে তাকে ঠকানোর জন্য ফিরে ফিরে দেখা দিতো। ছোটবেলায় ধারাপাত পড়েছেন তো? ধারাপাতের প্রথম দিকে একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ’ কবিতাটা মনে পড়ছে কি? অমরজীবনের ছড়ার মূল সংকেতও ওই ধারাপাতের কবিতা।

দেবদর্শন বললেন—ঠিক বুঝতে পারছি না ঠাকুরমশাই। আর একটু খুলে বলবেন?

বললাম—কবিতাটা মনে করুন। দিকে দিকে সাগরেতে ভাই, চোখে চোখে চাদ খুঁজে পাই। দিক কখানা? চারটে তো? পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ। তাহলে দুবার ‘দিক’—অর্থাৎ ৪-৪, ঠিক আছে? পরের কথা সাগরেতে। সাগর কটা? না,

সপ্তসমুদ্র। তাহলে এ পর্যন্ত কী হল? দিক, দিক, সাগর— ৪-৪-৭। পরের লাইনে ছড়ায় বলেছে—চোখে চোখে চাদ খুঁজে পাই। তিনে নেত্র, অর্থাৎ পরপর দুটো তিন হবে। আর চাদ তো একটা। কাজেই পুরো সংখ্যাটা দাঁড়ালো ৪ ৪ ৭ ৩ ৩ ১। আপনি এর চারখানা আগের নম্বরের টিকিট নিচ্ছিলেন। নিলে একটুর জন্য প্রাইজটা হাতছাড়া হয়ে যেত। আমি কেউ না, মুখুজ্যে মশাই। পুরস্কারটা আপনার ভাগ্যই পাইয়ে দিয়েছে—অমরজীবনের মাধ্যমে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন দেবদর্শন। তারপর বললেন—অমরজীবন কে?

বললাম-আমি জানি না মুখুজ্যেমশাই। এ প্রশ্ন আপনি আগেও করেছেন, উত্তর জানা থাকলে আমারও আনন্দ হতো। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর না জানাই থাক না। তাতে জীবন সরস থাকে, জীবনে বিশ্বাস থাকে, আনন্দ থাকে। সব জেনে ফেলতে নেই। চলুন, পুজোর সময় হলো, আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে–

দেবদর্শনকে পুজোমণ্ডপে আসতে দেখে সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠে দাঁড়াল। সেদিনকার পুজোর পরিবেশই আলাদা।

অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া কোনও অলৌকিক ঘটনা, অন্তত আমরা সঠিক ব্যাখ্যার অভাবে যাকে অলৌকিক বলে মনে করি, তা মানুষের মনে বিশ্বাস আর ভক্তির জোয়ার এনে দেয়। সেদিনও তাই হয়েছিল–

বললাম—তাতে আর অন্যায় কী? রোজকার জীবনে যা ঘটে না, তেমন অদ্ভুত কিছু চোখের সামনে ঘটতে দেখলে মানুষ তো আপ্লুত হবেই, তাই না? এ একটা পাসিং শো ধরিয়ে তারানাথ বলল—সাধারণভাবে কথাটা ঠিক, কিন্তু ওই বিশ্বাস আর আবেগের প্রকৃত কোনও মূল্য নেই–

কিশোরী বলল—কেন, একথা বলছেন কেন? হয়ত আশ্চর্য বা অলৌকিক কিছু দেখে। বিশ্বাস বা ভক্তির ভাব জেগে উঠেছে, কিন্তু তাতে ওই বিশ্বাস কি মিথ্যে হয়ে যাবে? এ যুক্তি আমার ঠিক বলে মনে হচ্ছে না—

যা তারানাথ বলল—মিথ্যে হয়ে যাবে এমন কথা বলছি না, কিন্তু সরল বিশ্বাসের মূল্য। তার সারল্যেই। কিছু পাব বলে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে ভাল লাগে বলেই তা করি। যদি কেউ অন্যরকম করে, তবে তা দোকানদারি। বাবার সম্পত্তি পাব, তাই বাবাকে ভালবাসি

—এ কেমন কথা?

কিশোরী বলল—সে আশা কি মনের কোণে একটু থাকে না?

–থাকলে সে কেমন ভালবাসা তুমিই ভেবে দেখ। জানি, যে কোনও ভালবাসাই শেষ পর্যন্ত স্বার্থের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে থাকে—মাও যে শিশুকে ভালবাসেন, তা ওই ভালবাসার পরিবর্তে বাৎসল্যের রসঘন তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি হয় বলেই। তবু নিছক বৈষয়িক স্বার্থের চেয়ে কি তা ভাল নয়? কোন না কোন আসক্তি যদি জীবনে থাকতেই হয়, তাহলে ঈশ্বরে নিষ্কাম আসক্তি থাকুক–

আলোচনার গতি দেখে ভেতরে ভেতরে ক্রমাগত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলাম। কিশোরীটা চিরকালের বুদ্ধিহীন কুতার্কিক, বেশ জমাট গল্পের স্রোত বয়ে চলেছে, হঠাৎ এর মধ্যে নৈয়ায়িক আচার্যের সদসৎ বিচার না আনলেই কি চলত না? এখন তর্ক জমে উঠলেই গল্প ডুবে যাবে। বললাম—সে তো ঠিকই, খুব ন্যায্য কথা। যাই হোক, অমরজীবন-রহস্য কি শেষ পর্যন্ত ভেদ হয়েছিল?

তারানাথ বলল—না। অমরজীবনের কাহিনী এখনও চলছে।

একটু বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালাম। তারানাথ ও-প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না বটে, কিন্তু কেমন করে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সে কী বলতে চায়। মানবসভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে বোধ করি অমরজীবনের গল্পটা মিশে রয়েছে, হঠাৎ কোথাও তো তা শেষ হবার নয়।

বললাম—এ গল্পের তাহলে এখনও অনেক বাকি?

—অনেক। আজকে তো শেষ হবেই না, যতদিন বাঁচব একটু একটু করে বলে গেলেও শেষ হবে না। তা সে যাই হোক, আপাতত দেবদর্শন মুখুজ্জের অংশটুকু বলে শেষ করি। তারপর আবার আর একদিন হবে। তোমরা পানিফল তো খেয়েছ নিশ্চয়, পুকুরে পানিফলের ঝাক দেখেছ কখনও?

হঠাৎ হঠাৎ তারানাথ এরকম কথার গতি পরিবর্তন করে থাকে। হেসে বললামদেখেছি। আমারও তো গ্রামেই বাড়ি। কেন?

–পানিফলের ঝক অর্ধেক পুকুর ছেয়ে থাকে, কিন্তু যে কোন একটা জায়গা ধরে টান দিলে সবটা একসঙ্গে নড়ে ওঠে। আমাদের বেঁচে থাকাও ঠিক তাই। আলাদা ঘটনা বলে কিছু হয় না। সবকিছু সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি তুমি দেবদর্শন অমরজীবন জীবন মৃত্যু হাসি কান্না—সব। তোমাদের এখনও বয়েস অল্প, পরে নিজেরাই সব বুঝবে।

ছাইদানি হিসেবে ব্যবহৃত নারকেলের মালায় সিগারেটের দগ্ধাবশিষ্টটুকু গুঁজে দিয়ে তারানাথ শুরু করল।

–পূর্ণিমার আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। তেমন জ্যোৎস্না তোমরা শহরে কখনও দেখবে না। পাখিরা সকাল হয়ে গিয়েছে মনে করে ডাকতে আরম্ভ করে। ঈষৎ শীত-শীত। ভাব পরিবেশে, অথচ পুরো ঠাণ্ডা পড়েনি। এখানে ওখানে কাশের গুচ্ছ চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে যেন রূপোর মেঘ। পুজোমণ্ডপে বড্ড ভিড়, তাছাড়া আজ দেবদর্শনের প্রাইজ পাওয়ার ব্যাপারটা সর্বত্র উত্তেজনা তৈরি করেছে। ভূষণ রায় আর আমাকে দেখলেই লোকে কথা বলবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ছে। তার চেয়ে ভিড় থেকে দূরে আপনমনে থাকাই ভাল।

মুখুজ্জেবাড়ির বাঁদিকে নদীতে যাবার পথের মুখে একটা পুরনো ভাঙা মন্দির। জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে যেন হালকা জলরঙে আঁকা ছবি। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ডানা মেলে একটা বেশ বড় সাদা লক্ষ্মীপ্যাচা উড়ে গিয়ে মন্দিরের চূড়ায় বসল। মন্দিরটা মুখুজ্জে-পরিবারের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে আর্থিক কারণে কিছুটা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হলেও একজন পুরোহিত সেখানে নিত্যপূজা করে আসেন, সন্ধেবেলা আরতি হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠিতা দেবী বিশালাক্ষী। কালো পাথরের মূর্তি, ভারি প্রশান্ত মুখ। ঠিক আজকের দিনেই বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের ওপর লক্ষ্মীপ্যাঁচার উড়ে বসাটা একটা সুলক্ষণ।

মৃদু পায়ের আওয়াজ শুনে পাশে তাকিয়ে দেখি কখন দেবদর্শন এসে দাঁড়িয়েছেন, হাতজোড় করে প্রণাম করছেন মন্দিরের দিকে মুখ করে। তাঁর মুখ উদ্ভাসিত।

বললাম-প্রণামটা কি প্যাচাকে?।

দেবদর্শন হেসে বললেন—না, দেবীকে। তবে ঈশ্বরের প্রকাশ সর্বজীবেই, প্যাচাকে প্রণাম করলে অন্যায় কী?

–অন্যায় আর কী! যে স্তরে উঠলে ওই উপলব্ধি হয়, সেখানে পেঁছলে সবাই সমান। আর পাচা প্রাণীটিও বেশ সুন্দর।

দেবদর্শন কেবলমাত্র উঁদে বৈষয়িক জমিদার নন সেকথা তো আগেই বলেছি। মানুষটার ভেতর কবিত্ব আর সৌন্দর্য মিশে গিয়ে চমৎকার একটি স্নিগ্ধ রসায়ন তৈরি করেছে। তিনি বললেন—পুজোমণ্ডপে বেজায় ভিড় জমেছে। আপনাকেও দেখতে পেলাম না। ঠিক। বুঝেছি আপনি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই আমিও চলে এলাম। কী অপূর্ব জ্যোৎস্না ফুটেছে দেখছেন! এই দেখ, ইনি আবার একা চললেন কোথায়?

জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে এক ঘোমটা দেওয়া বৌ মানুষ পায়ে চলা সঁড়ি পথটা দিয়ে বিশালাক্ষী মন্দিরের দিকে চলেছেন। বোধহয় মুখুজ্জেগিন্নী, মন্দিরে প্রণাম করে তারপর পুজোর জায়গায় যাবেন। বললাম—বৌঠান না?

দেবদর্শন বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু একা যাচ্ছেন কেন? বাড়ির বাকি মেয়েরা কই? পেছনে সব আসছে বোধহয়—

দেবদর্শনের স্ত্রী কিন্তু মন্দিরের পৈঠায় বা চালাতে দাঁড়িয়ে প্রণাম সারলেন না, সিঁড়ি বেয়ে উঠে মন্দিরে ঢুকে গেলেন। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বেরুবার সময় উনি আমাদের দেখতে পাবেন, ওঁর অস্বস্তি হতে পারে সেকথা ভেবে আমি বললাম—চলুন মুখুজ্জেমশাই, নদীর দিক থেকে একটু ঘুরে আসি

আবার বলছি, সে-সব দিনের কথা ভাবলে এখনও বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে। জ্যোৎস্না এত সাদা ধপধপে যে, নদীর ধারের সাদা বালির চরে দাঁড়িয়ে সময়টা দিনের বেলা বলে ভুল হয়। খুব হাল্কা বাতাসে চরে গজিয়ে ওঠা কাশগুচ্ছ দুলছে, কট কটু করে ডাকছে কী একটা নিশাচর পোকা। বয়েস অল্প, পৃথিবী বিশাল, শরীর নীরোগ, প্রকৃতি সুন্দর, ঈশ্বর তার সিংহাসনে আসীন—এবং দুনিয়ার সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। তখন অমর ছিলাম, পৃথিবীতে কোনও গ্লানি ছিল না, কালো রঙ ছিল না, বুকভরা অকারণ আনন্দ ছিল, মৃত্যু ছিল আবছা জনশ্রুতি। সে বাংলাও আর নেই—আমার এই কথাকে জীবনের পেছনদিকে ফিরে তাকিয়ে প্রৌঢ়ের স্বাভাবিক হাহাকার মনে কোরো না—তখন দিনকাল সত্যিই অন্যরকম ছিল। মনের ভেতরের সেই আনন্দ মিশিয়ে শরৎরাত্রি অপরূপ হয়ে উঠত।

যুগ যুগ ধরে শারদ পূর্ণিমার রাত্রির সঙ্গে উৎসবের একটা সম্পর্ক আছে বলেই কিনা জানি না, এই রাত্তিরটার একটা মায়াময় রূপ আছে। দেবদর্শনের বড় গুণ, তিনি অকারণে কথা বলে পরিবেশের গাম্ভীর্য নষ্ট করেন না। কাশফুলে ঢাকা জ্যোৎস্নামাখা সাদা বালির চরে দুজনে বেশ কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম, কিন্তু দেবদর্শন কথা বলে পরিবেশের মাধুর্য নষ্ট করলেন না। কিছুক্ষণ পরে আমিই বললাম—চলুন, এবার ফিরে যাই। পুজো এতক্ষণ শেষ হয়ে এলো।

ফেরবার সময় আমাদের ডানদিকে বাঁশঝাড়ের পাশে বিশালাক্ষী মন্দিরটা পড়লো, তার ওধারে মুখুজ্জেবাড়ি। আর বাঁদিকে পথ থেকে একটু ভেতরে পুজোমণ্ডপ। পুজোর জায়গায় ঢোকবার মুখে দেবদর্শন থমকে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ি থেকে আসার পথের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক গলায় বললেন—এ কী! এদের আজ হল কী! বারবার কোথায় যাওয়া-আসা করছে?

তাকিয়ে দেখলাম মুখুজ্জেগিন্নী বাড়ির অন্য মেয়ে-বৌদের সঙ্গে চলেছেন পুজোমণ্ডপে। মানে তিনি বিশালাক্ষী মন্দিরে

প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন, এখন আবার সবাইকে নিয়ে পুজো দেখতে যাচ্ছেন।

পুজো শেষ হয়ে গেল, পুরোহিত শান্তিজল আর চরণামৃত দিলেন সবাইকে। ওদিকে কয়েকজন কর্মচারী প্রসাদ বিতরণ শুরু করেছে। ছোট ছোট চেরা কলাপাতার টুকরোয় বাতাসা আখের টিকলি শসা পানিফল বাতাবিলেবু আর ভেজা আতপচাল কলা দিয়ে চটকে মাখা। খিচুড়ি-ভোগ একটু বেশি রাত্তিরে শুরু হবে। বাচ্চারা সামিয়ানার নিচে ছোটাছুটি করছে, বয়স্করা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে ব্যস্ত। আমরাও বৈঠকখানায় ফিরে এলাম। কোনও কারণে দেবদর্শনের ভ্রূ কুঁচকে রয়েছে, কিছু একটা ভাবছেন ভদ্রলোক।

রঘু তামাক দিয়ে গেল। তামাক টানতে টানতে এটা-সেটা গল্প করছি, কিন্তু দেবদর্শনের মুখের গম্ভীর ভাবটা যাচ্ছে না। হঠাৎ উনি বললেন—ঠাকুরমশাই, আমার স্ত্রী যখন প্রথমবার এক বিশালাক্ষী মন্দিরে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, তখন তার হাতে কিছু ছিল কি?

অকস্মাৎ এই প্রশ্নে একটু অবাক হয়ে বললাম—হাতে? আমি তো ঠিক—দাঁড়ান, একখানা ডাঁটাওয়ালা পদ্ম ছিল

বোধহয়, তাই না?

দেবদর্শন বললেন—আর দ্বিতীয়বার?

—যখন বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আসছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তখন তো হাতে পুজোর ডালা ছিল। কেন, এ প্রশ্ন করছেন কেন?

দেবদর্শন যেন কিছুটা আপনমনেই বললেন—তাহলে পদ্মটা উনি কোথায় রেখে এলেন? পরে তো হাতে ছিল না—

এই সামান্য ব্যাপারে দেবদর্শন ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বুঝতে পারলাম না। বললাম—ডালাতেই রাখা ছিল হয়ত, পাশ থেকে দেখা যায়নি–

-তাই? তা হবে হয়ত, অন্ধকারে বুঝতে পারিনি। নইলে আর যাবে কোথায়?

মানুষের একটা না একটা বাতিক থাকেই, ভেবে মজা লাগল। দেবদর্শনের মত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান লোক এই সামান্য একটা বিষয় নিয়ে এতক্ষণ মাথা ঘামাচ্ছেন!

নিমন্ত্রিতদের খাওয়া মিটতে মিটতে অনেক রাত্তির হয়ে গেল। এ পরিবারের নিয়ম, বাইরের কারও খাওয়া বাকি থাকতে বাড়ির কেউ খেতে বসবেন না। আমরা বৈঠকখানাতে বসেই তামাক খাচ্ছিলাম, রাত একটা কী দেড়টা নাগাদ রঘু এসে দেবদর্শনকে বলল—চলুন কর্তামশাই, খাবার জায়গা হয়েছে—

ভেতরবাড়ির বারান্দায় খেতে বসলাম দুজনে। কলাপাতায় করে খাওয়া, মুখুজ্জেবাড়ির রীতি অনুযায়ী পুজোর প্রসাদ ধাতুপাত্রে পরিবেশন করা হয় না। খিচুড়ি, পাঁচভাজা, পাঁচমিশেলি একটা ঘণ্ট—তার মধ্যে আলু কচু বেগুন থোড় পালংপাতা চালকুমড়ো সবই আছে, তারপর লুচি আর পায়েস। একটা জিনিস বরাবর দেখেছি, পুজোর ভোগ হিসেবে যে খিচুড়ি রান্না হয় তার স্বাদ অদ্ভুতভাবে আলাদা। বর্ষার দিনে গরম খিচুড়ি আর ডিমভাজা খাবার ইচ্ছে হয়েছে? বেশ তো, বেঁধে খাও। চড়ইভাতি কিম্বা পোষলায় খিচুড়ি রান্না হয়েছে? বেশ তো, পেট ভরে খাও। রান্না নিশ্চয় ভাল হবে,

কিন্তু সে অন্যরকমের ভাল, পুজোর ভোগের স্বাদ তাতে পাবে না।

কিশোরী বলল—তার কারণ আমাদের মনের ধর্মভাব। বৃষ্টির দিনে বা পৌষলায় রান্না করা হয় মনে একটা আড্ডা বা হুল্লোড়ের ভাব নিয়ে, আর পুজোর ভোগ রাঁধবার সময় মনে পবিত্র ধর্মীয় সচেতনতা জেগে থাকে—তাই পার্থক্য। নইলে একই চাল-ডালমশলায় তৈরি খাবারে অন্যরকম স্বাদ হবে কেন?

তারানাথ বলল—তাই হবে হয়ত। যাক, গল্পটা শোন।

মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছি, বুঝতে পারছি রান্নাঘরের দরজার পাশে মুখুজ্জেগিন্নী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অতিথির খাওয়ার সময় গৃহকর্ত্রীর উপস্থিত থাকা বনেদি বাড়ির নিয়ম। হয়ত তিনি কথা বলবেন না, কোন ছোট মেয়ে বা কর্মচারীর মাধ্যমে কী লাগবে তা জিজ্ঞাসা করে নেবেন, কিন্তু নিজে আড়ালে দাঁড়িয়ে সমস্ত সময়টা তদারক করবেন। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য পরিস্থিতি একটু অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরপর দুবার কিছুদিনের ভেতর এসে অতিথি হওয়ায়, মুখুজ্জেগিন্নীর সহজ মাতৃত্বপূর্ণ চরিত্রের জন্য, আর লটারির

প্রাইজ পাবার টিকিটটা যে আমিই বেছে দিয়েছি সে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে পড়ায় বাড়ির সকলেই আমাকে একান্ত আপনজন বলে ভাবতে শুরু করেছে।

খেতে খেতে দেবদর্শন বললেন—বিশালাক্ষী মন্দিরে প্রণাম করে আবার ফিরে গিয়েছিলে কেন? সবাইকে নিয়ে একবারেই তো গেলে পারতে–

দরজার আড়ালে একটুখানি বিস্মিত নীরবতা। তারপর মুখুজ্জেগিন্নী একটু অবাক গলায় বললেন—বিশালাক্ষী মন্দিরে? সেখানে আমি যাইনি তো!

খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলে তাকালেন দেবদর্শন।

–যাওনি! কী বলছ তুমি!

—ঠিকই বলছি। বাড়ির মেয়েরা মিলে যখন পুজোর জায়গায় যাচ্ছি তখন তো তোমার সঙ্গে দেখাই হল, তুমি আর ঠাকুরমশাই মিলে নদীর ধারের পথ দিয়ে ফিরছিলে। আমাদের দেখে বাঁশঝাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে ওঁকে কী যেন বললে। তার আগে আবার কোথায় গেলাম?

—তার একটু আগে তুমি একা যাওনি বিশালাক্ষী মন্দিরে প্রণাম করতে?

-না তো! আমি, রাজুর মা, বিরাজপিসি আর ছেলেপুলেরা মিলে একবারই বেরিয়েছিলাম। কেন জিজ্ঞাসা করছ বল তো? কিছু হয়েছে নাকি?

পাত থেকে হাত তুলে ফেলেছেন দেবদর্শন।

–না, হয়নি কিছু। কিন্তু আমি যে স্পষ্ট—মানে তোমার হাতে একটা—

আমি একটু কেশে বললাম—ওটা বোধহয় ভুল দেখেছেন মুখুজ্জেমশাই।

দেবদর্শন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—সে কী! আপনিও তো–

আমি জোর দিয়ে বললাম—সে-সব কথা পরে হবে এখন। চাঁদের আলোয় অত ভাল করে কিছু দেখা যায় না,

কাকে দেখতে কাকে দেখেছেন-

দেবদর্শন কেমন হকচকিয়ে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ আগেই ওঁর সঙ্গে এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে, ওঁর মত আমিও যে বউঠাকরুণকে বিশালাক্ষী মন্দিরে ঢুকতে দেখেছি তা বলেছি— কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার এই উল্টো কথা বলায় উনি খুবই বিস্মিত হয়েছেন সন্দেহ নেই।

দেবদর্শন বললেন—কিন্তু আপনিই যে—

ফের খেতে শুরু করে নিচু গলায় বললাম—খেয়ে নিন, পরে কথা হবে।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বেশিরভাগ পূর্ববঙ্গেই পালিত হয়। দেবদর্শনের জমিদারি ঠিক পূর্ববঙ্গে নয়, বরং বেশ খানিকটা দূরেই বলতে হবে। কিন্তু উৎসব আর আনন্দ করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এত প্রবল যে তা কোন প্রথা কিংবা দেশকালের সীমা মানে না। উৎসব করার সুযোগ পেলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে আঁকড়ে ধরে। মুখুজ্জেবাড়ি ছাড়াও এই অঞ্চলে অনেক জায়গাতেই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো হতে দেখলাম।

এই লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে ঘুমোতে নেই, সারারাত জেগে তাস-পাশা খেলে, গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দিতে হয়। কোনও কোনও পরিবারে আবার নিজেদের মধ্যে জুয়াখেলারও রীতি আছে। মুখুজ্জে-পরিবারে জুয়াখেলাটা হয় না, কিন্তু আড্ডা দিয়ে রাত জাগা হয়। সেই উদ্দেশ্যে কয়েকজন গ্রামবৃদ্ধ দেবদর্শনের বৈঠকখানায় এসে জড়ো হয়েছেন দেখলাম। আগেই বলেছি, রঘু জমিদারের কেতাদুরস্ত কর্মচারী, সে অতিথিদের তামাক দিয়ে গেল। তাকিয়া হেলান দিয়ে তারা জমিয়ে বসলেন। দেবদর্শনও বসতে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম —চলুন না, বাইরে একটু ঘুরে আসি, কী চমৎকার চাদের আলো ফুটেছে। তাছাড়া দেরি করে খাওয়া হল তো-হাঁটাচলা করলে হজম হবে।

দেবদর্শন আমার কাণ্ডে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কোনও দ্বিধা না করে বললেন—চলুন।

তারপর অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার বসুন, তামাক খান। আমি এই এক্ষুণি আসছি—

রাত তখন প্রায় আড়াইটে। রূপোর চাকার মত চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে বিশাল পাকুড়গাছের পেছনে।

মৃদু হিমের ছোঁয়া বাতাসে, কী যেন কী কত কথা মনে পড়ে যায়। স্বার্থ হিংসা আর হানাহানির মধ্যেও মনে হয় আকাশ মধু, বাতাস মধু। মনে হয় মৃত্যু আর অন্ধকার সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য মুক্ত জীবনের আনন্দ।

দেবদর্শন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বললাম–মুখুজ্জেমশাই, কেবল লটারির টাকা পাওয়া নয়, আপনার পরিবারের ইতিহাসে আজ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে–

—কী ঘটেছে ঠাকুরমশাই?

—আসুন আমার সঙ্গে। দেখাচ্ছি—

দেবদর্শনকে নিয়ে বিশালাক্ষী মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

একাদশ

দেবদর্শন উদগ্রীব হয়ে আমার সঙ্গে আসছেন

দেবদর্শন উদগ্রীব হয়ে আমার সঙ্গে আসছেন, যদিও আমি নিজেই জানি না ঠিক কী দেখাতে তাঁকে নিয়ে চলেছি। তবে আমি দেখেছি কোনো অলৌকিক প্রত্যক্ষণ বিষয়ে আমার পূর্বানুভূতি সচরাচর নির্ভুল হয়।

বিশালাক্ষী মন্দির পর্যন্ত মাটির সঁড়ি পথটায় দেখার মতো কোনো কিছু নেই, তারপর থেকেই পথ ভাগ হয়ে একটা চলে গেল নদীর দিকে। আর একটা পুজোর মণ্ডপের দিকে। এই দুই পথের সংযোগস্থলেই বিশালাক্ষী মন্দির। ভাগ হওয়ার জায়গাটা থেকে মন্দিরের দিকে এগোতেই চোখ পড়ল

সারি সারি পায়ের ছাপ, সাদা রঙের কিছুতে পা ডুবিয়ে হাঁটলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। বাড়ির মেয়েরা চালবাটা কিম্বা খড়িমাটি গুলে যেমন মা লক্ষ্মীর পা আঁকে, অনেকটা সেরকম। পার্থক্য এই—পুজোর জন্য আলপনা হিসেবে আঁকা পায়ের ছাপ জোড়া জোড়া, মানে পাশাপাশি হয়। দেখলে মনে হয় যেন কেউ কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করার জন্য দাঁড়িয়েছিল। আর এই যা ছাপ দেখছি, এ নকল ছাপ নয়। এ হল সত্যিকারের কোনো হেঁটে যাওয়া মানুষের পা। দু'জনে নিঃশব্দে মন্দির পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে দেখলাম কেবল মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢোকবার দরজার সামনে পায়ের ছাপ এক জোড়া। অর্থাৎ যাঁর তিনি এইখানে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করেছিলেন।

সিঁড়ি বেয়ে আমরা দুজন মন্দিরের চাতালে উঠেছিলাম। শেষ জোড়া পায়ের ছাপের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার দিকে মুখ তুললেন দেবদর্শন। তার চোখে জল। বললেন—ঠাকুরমশাই, আমি যা ভাবছি তাই কি সত্যি?

—ঠিক তাই মুখুজ্জেমশাই। শুধু আপনার নয়, আমার জীবনও ধন্য।

পশ্চিমদিগন্তে হেলে পড়েছে চাঁদ। এবার রাত ফুরিয়ে আসছে। হেমন্তের শেষরাত্তিরে আকাশবাতাস আর পৃথিবী যেন কেমন এক রূপকথার দেশে পরিণত হয়। বাঁশপাতার ফাঁক দিয়ে আসা রাত্রিশেষের জ্যোৎস্না ঈষৎ শীতের ছোঁয়া আর পুজোমণ্ডপ থেকে দেবীবাড়ি ফেরা লোকজনের গলার মৃদু গুঞ্জন পরিবেশকে অবাস্তব আর অপার্থিব করে তুলেছে। এখন প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম আর বলবৎ নয়, এখন সবকিছুই ঘটতে পারে।

মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছেন দেবদর্শন। বললাম—সব মানুষ ভাগ্যবান নয়, কোন কোন মানুষ ভাগ্যবান। ক্ষমতা, টাকাপয়সা এসব অনেকেরই থাকে, কিন্তু আপনার জীবনে আজ যা ঘটল তা খুব কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটে। যাঁকে আজ দেখেছেন তিনি আপনার স্ত্রী নন। তিনি–

আমি চুপ করতে দেবদর্শন বললেন—কে তিনি? বলুন ঠাকুরমশাই–

—তিনি স্বয়ং দেবী। আপনি আজ দেবীর আশীর্বাদ পেয়েছেন।

দেবদর্শন বললেন—এখান দিয়ে তিনি হেঁটে গিয়েছেন। এই তাঁর পদচিহ্ন! আমার স্ত্রীর রূপে তিনি দেখা দিলেন কেন? তবে, তবে কি–

এর আর কী উত্তর দেব? বললাম—মায়েরা সকলেই দেবী।

হাতের হালকা ছোঁয়ায় দেবদর্শন মন্দিরের দরজা খুললেন।

মাটির পিলসুজের ওপর মাটির তৈরি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে মন্দিরের ভেতর। অন্যদিন ছছাটমাপের রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে, সেটিও পাশেই রাখা আছে। সন্ধ্যেবেলা নিত্যপূজার পর জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। এখনো তা জ্বলছে। সেই স্নিগ্ধ আলোয় দেবীর প্রস্তরময়ী প্রতিমা যেন মুখে সত্যিকারের হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। এবং–

এবং দেবীর মূর্তির ডানহাতে একটি উঁটিওয়ালা তাজা পদ্ম।

এরপরে আর কোন প্রশ্ন থাকে না। আমি এবং দেবদর্শন করজোড়ে দেবীকে প্রণাম জানালাম।

দু'হাতে কড়া ধরে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলেন দেবদর্শন। তারপর পেছন ফিরেই বললেন—এ কি!

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মন্দিরের চাতালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সাদা সেই পদচিহ্ন আর নেই। শুধু চাতালেই নয়, সিঁড়ির ধাপে ধাপে এবং সঁড়িপথে শ্বেতসঙ্কেতে আঁকা সেই দেবীর পায়ের ছাপ আর কোথাও নেই। দেবী আমাকে এবং গৃহস্বামীকে জানিয়ে দিতে এসেছিলেন যে, তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল।

না ঘুমিয়েই রাত শেষ হয়ে গেল। সকালে নদী থেকে স্নান করে এসে বৈঠকখানায় বসলাম। একটু পরে দেবদর্শনও ভেতরবাড়ি থেকে এসে বসলেন। তারও স্নান হয়ে গিয়েছে। রঘু এসে তামাক দিয়ে গেল। দেবদর্শনের মুখেচোখে দিব্যানুভূতির উদ্ভাস, ইনি যেন আর ঠিক কালকের সেই মানুষ নন। আজ যেন তিনি অনেক বেশি সৌম্য, অনেক বেশি গভীর।

বললাম-এবার যে আমাকে যেতে হবে মুখুজ্জেমশাই। অনেকদিন হয়ে গেল, আবার। পথ ডাকছে–

দেবদর্শন চমকে উঠে বললেন—সে কী! চলে যাবেন। কেন?

হেসে বললাম—পরিব্রাজকের এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে নেই, তাতে আসক্তি জন্মায়। এই যে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়, বন্ধুত্ব—এই পর্যন্তই ভাল। এর চেয়ে বেশি গভীরতা হলে তা বন্ধন হয়ে পায়ে জড়িয়ে যাবে।

দেবদর্শন চুপ করে তামাক খেতে লাগলেন।

বললাম—কথাগুলো একটু নিষ্ঠুর শোনাচ্ছে, না?

দেবদর্শন কিছু বললেন না।

-রাগ করবেন না। জীবনে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা রূঢ় হলেও সত্য। এক জায়গায় থেকে জীবন কাটাবো এমন ইচ্ছে থাকলে তো বাড়িতেই থাকতাম, মাকে কাঁদিয়ে গৃহত্যাগ করতাম না। ভালবাসা, বন্ধুত্ব, প্রীতির সম্পর্ক—এসব খুব ভাল

জিনিস, কিন্তু যে মোহ আবরণ মহত্তর সত্য থেকে আমাদের আড়াল করে রেখেছে তার থেকে মুক্তি পেতে হলে যতই কষ্ট হোক পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমি আপনাদের ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ছি। এবার যেতে হবে–

দেবদর্শন তামাক খেয়ে যেতে লাগলেন।

খোলা দরজা দিয়ে সকালের আলোয় উজ্জ্বল আমবাগান-বাঁশবাগান দেখতে পাচ্ছি। সঁড়িপথটা দিয়ে জাল কঁাধে গান গাইতে গাইতে একজন জেলে এবং তার পরে-পরেই একজন রাখাল কয়েকটা গরু নিয়ে মাঠের দিকে গেল। আজকালকার ছেলেদের ইস্কুলের পড়ার বইতে যেমন পাড়াগাঁর বর্ণনার সঙ্গে কবিতা থাকে—রাখাল গরুর পাল লয়ে যায়। মাঠে’—ঠিক তেমনি। আজকাল ছাত্রদের ছবি এঁকে আর কবিতা লিখে বোঝাতে হয় গ্রাম কেমন ছিল, বাঁশঝাড় কাকে বলে না, হেসো নাসত্যিই তাই। কলকাতা শহরে মোটরগাড়ি চেপে মানুষ হয়েছে এমন বড়লোকের ছেলেপুলেরা কেউই গ্রাম দেখেনি। মজার কথা কী জানো, এদের অনেকেরই আদি বাড়ি কিন্তু গ্রামে। এক বা দুই পুরুষ আগে এদের বংশের কেউ একজন হয়তো বেশি উপার্জনের লোভে বা অন্য কোন সুবিধের জন্য গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছিল শহরে বাস

করতে। তার দেখাদেখি আরো অনেকে। এদের গ্রামের প্রাচীন ভদ্রাসন ভেঙে পড়ছে, কার্নিসে বট-অশ্বথের চারা আর উঠোনে আগাছা জন্মাচ্ছে, কবজা থেকে দরজা ভেঙে ঝুলছে—কিন্তু দরজার কড়ায় তালা এখন আটকানো। এসব বংশের ছেলেপুলেরা এখন বড়বড় চাকরি করে, কেউ বালিগঞ্জে কেউ ভবানীপুরে বাড়ি করেছে। মজা ডোবা আর ম্যালেরিয়ায় ভরা গ্রামে তারা আর কেউ বাস করতে ফিরে যাবে না।

কিশোরী বলল—আমি কিন্তু একটি পরিবারকে জানি যারা প্রতিবছর নিয়ম করে অন্তত একবার গ্রামের বাড়ি যায়—

তারানাথ হেসে বলল—ওরকম দু'একটা উদাহরণ দিলে তো সত্য বদলাবে না। আমিও জানি কেউ কেউ আছে যারা সাধারণত দুর্গাপুজোর আগে গ্রামের বাড়িতে বছরে একবার করে ফিরে যায়, তোক লাগিয়ে আগাছা বা বনজঙ্গল পরিষ্কার করায়। সম্ভব হলে একবার হালকা চুনকাম করায়। তারপর ধূমধামে দুর্গাপুজো করে দেওয়ালির পর আবার কলকাতায় ফিরে আসে।

এবার আমি বললাম-সে তো ভালো কথাই, এতে নিন্দের কী আছে? বছরে অন্তত একবার হলেও তো তারা

দেশের বাড়ির টানে ফিরে আসে।

তারানাথ বলল—জিনিসটা অত হালকাভাবে দেখো না। এরা সবাই যে জন্মভূমির টানে ফিরে যায় এমন নয়। কেউ কেউ গরিব গ্রামবাসী আর শরিকদের কাছে নিজের ঐশ্বর্য আর বৈভব দেখাতে যায়।

একটু থেমে একটা পাসিং শো ধরালো তারানাথ। মৃদুমন্দ টান দিয়ে সিগারেটের একচতুর্থাংশ শেষ কবে নারকেলের মালায়, ছাই ঝেড়ে সে বলল—আগে মানুষ অনেক বেশি ধর্মভীরু ছিল। শত দুঃখকষ্টেও ভদ্রাসন ছেড়ে যেতে চাইতো না। এখন আর ওসব। আবেগকে কেউ প্রশ্রয় দেয় না। উপার্জনের লোভে কোথাকার মানুষ কোথায় চলে যাচ্ছে কারো কোনো শেকড় নেই। সমাজ দিনে দিনে শিথিল হয়ে পড়ছে।

কিশোরী বলল—কিন্তু সামাজিক মানুষের এসব চলাচল না হলে পৃথিবীর উন্নতি হবে কী করে? সভ্যতা এগুবে কী করে? ভেবে দেখুন–

তারানাথ হাত তুলে তাকে থামিয়ে বলল—দাঁড়াও হে,

ওসব যুক্তি আমি অনেক শুনেছি। যন্ত্রপাতি কলকারখানা রেলগাড়ি—এসব দরকার মানুষের উন্নতির জন্য। এখন তো শুনছি এরোপ্লেন না হলেও সভ্যতা অচল। ভবিষ্যতে আরও কত কী হবে কে জানে! আমি সে-সব দেখেও যেতে পারবো না। কিন্তু কথাটা হচ্ছে—এসবে কী মানুষের শান্তি বাড়ছে? হৃদয়ের নরম অনুভূতির যে-সমস্ত প্রকাশকে আমরা সভ্যতা বলি। তার কি কোন উন্নতি হচ্ছে? পকেটে অনেক টাকা। কিন্তু মনে শান্তি নেই, এমন অবস্থা কি কেউ চায়? এর চেয়ে কি সেই পাখিডাকা ফুলফোটা পাড়াগাঁই ভালো ছিল না? যাক, আসল গল্প ছেড়ে বড্ড বেশি তত্ত্বকথায় ঢুকে পড়েছি। গল্পটা শোন।

তারানাথ আবার শুরু করল।

আলবোলার নল মুখ থেকে সরিয়ে দেবদর্শন জিজ্ঞাসা করলেন—কবে যাবেন ঠিক করেছেন?

—দেখি, কাল তো আর হবে না, পরশু নাগাদ রওনা দেব। আজ একটু বাদে থেকেই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ পড়বে। কোথাও যাওয়ার পক্ষে এটা ভাল তিথি নয়। দ্বিতীয়া পড়তে পড়তে কাল দুপুর গড়িয়ে যাবে। বিকেলের দিকে আর

কোথায় যাব? দু'মাইল হাঁটতে না হাঁটতে অন্ধকার নেমে আসবে। হেমন্তকালের ছোট দিন।

দেবদর্শন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—যাক, কালকের দিনটা তো অন্তত

আছে। ক জিজ্ঞাসা করলাম-ভূষণ রায়ের কথামতো লটারির টাকাটা বোধহয় মাসখানেকের মধ্যেই হাতে পেয়ে যাবেন। টাকা দিয়ে কী করবেন কিছু ঠিক করলেন?

—এখনো পাকাপাকি ভাবে কিছু ঠিক করিনি। তবে প্রথমে তো বাড়িটা মেরামত করব। বাড়ির মায়া বড় মায়া। পিতৃপুরুষের এতবড় বাড়ি, সবটা ভালোভাবে সারাতে পারবো না। পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকায় যতটা হয়—একটু হালকা মেরামত আর কী—যাতে আবার দেড়-দু' পুরুষ অন্তত চলে যায়। তারপর উত্তরাধিকারীদের ভাবনা তারাই ভাববে। হাজার তিরিশেক টাকা জমা রাখব আমার স্ত্রীর নামে, তার সুদ জমতে থাকবে। আমার অবর্তমান ঘটলে তার কোনো অসুবিধে হবে না। তিনিও গত হলে ছেলেরা সে টাকা নিয়ে যেমন বুঝবে করবে। ভূষণ রায়কে দেব পাঁচ হাজার। বাকি টাকা সম্বন্ধে এখনো কিছু ভাবিনি, আগে হাতে তো আসুক।

তবে কয়েক জায়গায় আমি সাহায্য করব বলে প্রতিশ্রুত, কী করে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব তাই ভাবছিলাম। যারা চেয়েছে তারাও খুব অসহায়। বিশ্বাস করুন, ঠাকুরমশাই, টাকা পেয়ে এইটেই আমার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হয়েছে। ঈশ্বর আমার মুখ রক্ষা করলেন

—ছেলেদের কিছু দেবেন না?

—না ঠাকুরমশাই, সেভাবে কিছু দেব না। আমার সংসারে ওদের কোনো অভাব নেই, আর আমি না থাকলে সবই ওদের দুজনের। তবে দুজনকেই আমি নবদ্বীপে রেখে আচার্য স্তর পর্যন্ত ন্যায়-কাব্য-ব্যাকরণ পড়িয়েছি। শীগগিরই হয়তো ওরাই বাড়িতে টোল খুলবে। অর্থের গৌরব নিম্নমানের এবং ক্ষণস্থায়ী, আমি চাই ওদের পাণ্ডিত্যের গৌরব হোক

পরের দিন দুপুরে খাওয়ার সময় আমাদের দুজনকে পরিবেশন করলেন স্বয়ং দেবদর্শনের স্ত্রী। সেই পরাতের মত বিশাল কাঁসার থালায় ভুরভুরে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের গন্ধওয়ালা পোলাও, ঘন মুগের ডাল আর বেগুন ভাজা। তার সঙ্গে চাররকমের মাছের পদ।

বললাম—করেছেন কী মুখুজ্জেমশাই! এত কি খাওয়া যায়? আতিথেয়তারও তো সীমা আছে

দেবদর্শন বললেন—কিছু নয় ঠাকুরমশাই—আবার কবে আসবেন তার তত ঠিক নেই—বাড়ির এঁরা আপনার জন্য আজ যত্ন করে করেছেন, খেয়ে নিন–

মুখুজ্জেগিন্নীকে এর আগে ভাল করে কখনও দেখিনি। আমি স্বাভাবিক সঙ্কোচের জন্য সরাসরি কখনও তাকাইনি, তিনিও বাঁহাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাথার কাপড় একটু টেনে ধরে রাখতেন। আজ খেতে খেতে কেন যেন মুখ তুলে হঠাৎ তার দিকে একবার তাকালাম। তাকিয়েই অবাক হয়ে গেলাম। পদ্মপলাশাক্ষী কথাটা সংস্কৃতে দেবীদের স্তবে প্রচলিত আছে, বাঙলার অখ্যাত এক পাড়াগাঁর পড়ন্ত জমিদারবধূর যে এমন দেবীর মত আয়ত পদ্মপলাশ লোচন হবে তা কে জানত! অতসী ফুলের মত গায়ের রং, কোঁকড়া চুল, সূর্যের গোলকের মত উজ্জ্বল সিঁদুরের টিপ, আর তার নীচে গভীর মাতৃত্বেপরিপূর্ণ ঐ দুটি টানাটানা বিশাল চোখ! হ্যাঁ, জগদ্ধাত্রীর মত রূপ বটে! তিনিও ক্ষণিকের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বাৎসল্যের মৃদুহাসি হাসলেন।

পরক্ষণেই আমি লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম।

একটু দেরি করে হলেও সেদিন চাঁদ উঠল ভারি চমৎকার। নদীর ধারে বেড়িয়ে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে বিশালাক্ষী মন্দিরের খোলা দরজা দিয়ে একবার দেবীকে প্রণাম করে মুখুজ্জে বাড়িতে এলাম। বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছেন দেবদর্শন। আমাকে দেখে বললেন—আসুন ঠাকুরমশাই, বসুন। ওরে রঘু, ঠাকুরমশাইকে তামাক দিয়ে যা–

তামাক এল। টান দিতে দিতে বললাম—আগামীকাল এই সময় কোথায় আছি কে জানে। সত্যি, মায়া পড়ে যাবার আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল।

দেবদর্শন বললেন—যাবেন তো কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে, তার এখন একটা রাত আর একটা বেলা বাকি। এখন বলুন রাত্তিরে কী খাবেন? মাংস চলবে?

হেসে বললাম–ওকথাও এখন থাক। দুপুরে যা ঠেসে খেয়েছি, রাত্তিরে আর খেতে পিরবো মনে হয় না। রান্নাও হয়েছিল চমৎকার। সবই বুঝি বউঠাকরুণের রান্না?

দেবদর্শন একটা স্মিত হাসি হেসে বললেন-হা, আজ প্রায় সব রান্নাই অতিথির জন্য বিশেষ করে আমার স্ত্রী বেঁধেছেন—

বললাম—সবচেয়ে ভাল হয়েছিল পোলাওটা। গাওয়া ঘি আর মশলা সব দোকানেই পাওয়া যায়, যে কেউ কিনে আনতে পারে। কিন্তু সবাই কী এমন সুন্দর পোলাও রাঁধতে পারে?

দেবদর্শনের আলবোলা টানার শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি অবাক হয়ে বললেন—পোলাও! কিন্তু আজ দুপুরে তো পোলাও রান্না হয়নি। কী বলছেন আপনি! আমি তো আপনার পাশেই বসে খেলাম-

—আপনি কী খেলেন?

দেবদর্শন বললেন—কেন, সাদা ভাত! চালটা অবশ্য খুবই ভাল ছিল, রামচন্দ্রপুর থেকে আনানো এক নম্বর বাসমতী—কিন্তু তা সে যত ভাল চালই হোক, পোলাও তো

কোনোমতেই নয়—

—আপনি কী খেয়েছেন? সাদা ভাত?

—অবশ্যই-কারণ সাদা ভাত ছাড়া কিছু রান্নাই হয়নি।

হেসে বললাম-এবার পুজোর সময়টা ভালই কাটল মুখুজ্জেমশাই, বলুন? শুধু টাকার কথা বলছি না। লটারিতে অর্থাগম প্রতিবছরই কারো না কারো হয়। কিন্তু এবার আপনি গড়ের তোপ শুনলেন, স্বয়ং দেবীকে পায়ের ছাপ ফেলে হেঁটে যেতে দেখলেন। আর আজকের এই পোলাও-এর ব্যাপারটা-

দেবদর্শন মুখ থেকে নল সরিয়ে বললেন—আর অমরজীবনের ব্যাপারটা? তার তো কোন ব্যাখ্যা হল না। কোথা থেকে এসেছিল সে, কোথায়ই বা গেল, কীই-বা তার পরিচয়? আপনি কী কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন ঠাকুরমশাই?

-আন্দাজ করতে হয়তো পেরেছি, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

–কী আন্দাজ করেছেন?

—ঠিক বোঝাতে পারব না মুখুজ্জেমশাই। এই সৃষ্টির রহস্য বড় বিচিত্র, সেই বৈচিত্র্যেরই একটা অংশ অমরজীবন। কেন এই পৃথিবী আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছিল, সে কেউ কি জানে? তেমনিই অমরজীবনের পরিচয়—একটা আকস্মিক আবর্তের মত হঠাৎ সে সৃষ্টির ভেতর জেগে উঠেছে, তার কোনো কারণ নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে এটুকু বুঝেছি—তার অস্তিত্ব একটা বড় মাপের শুভশক্তির প্রকাশ

দেবদর্শন বললেন—কী রকম?

বললাম–সৃষ্টির মুহূর্তেই শুভ আর অশুভ দুরকম শক্তি তৈরি হয়েছিল, এ কথার সমর্থন পৃথিবীর সব ধর্মশাস্ত্র আর দর্শনে পাবেন। যেমন আলো আর অন্ধকার, মহত্ত্ব আর নীচতা। এও প্রকৃতির একটা সঠিক আইন, আসল বস্তু না থাকলে পরিপূরক এবং বৈপরীত্যের ধারণা আসবে কী করে? শাসকের অত্যাচার, ধর্মান্ধতা, ধনীদের দম্ভ, নিষ্ঠুরতা—এসবের ভেতর দিয়ে অশুভ শক্তি নিজেকে প্রকট করে। আর উলটো দিকে শুভ আর মহৎ বিশ্বশক্তি নিজেকে স্পষ্ট করে তোলে মহাপুরুষের বাণী, দেশপ্রেমীর আত্মোৎসর্গ, বৈজ্ঞানিকের

নিঃস্বার্থ কর্ম—এর মাধ্যমে।

দেবদর্শন বললেন—তার কী প্রয়োজন ছিল? এত জটিল ঝামেলায় না গিয়ে ঈশ্বর তো অবিমিশ্র ভালোও সৃষ্টি করতে পারতেন?

বললাম-এর উত্তর আমি দিতে পারবো না। তবে আমার বিশ্বাস দুনিয়ায় অকারণে কিছুই ঘটে না। কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু আমার সঙ্গে পরামর্শ করে জগৎ সৃষ্টি করেন নি, তাই সব রহস্যের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত। তবে একটা কথা বলি, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, ঈশ্বরে মতি স্থির রাখবেন। যে যাই বলুন, তিনি আছেনই।

পরের দিন সকালবেলা জলখাবার খাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের প্রান্ত অবধি এগিয়ে দিতে এলেন দেবদর্শন। আমি বারণ করেছিলাম, তিনি শুনলেন না। গ্রামের একেবারে শেষ সীমায়, একটা মহানিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাকে বললাম—আর নয়, এবার ফিরে যান। আবার দেখা হবে–

ব্যগ্রভাবে আমার হাতদুটো ধরে দেবদর্শন বললেন–দেখা

হবে বলছেন?

একটু ইতস্তত করে বললাম দেখা হবে। আর যদি কোন কারণে আমাকে খুব প্রয়োজন হয় তাহলে-

—কী তাহলে?

—তাহলে নির্জনে কোথাও দাঁড়িয়ে মধুসুন্দরী দেবীর নাম উচ্চারণ করে একান্তভাবে আমার দেখা পেতে চাইবেন। যেখানেই থাকি না কেন, আমি ঠিক জানতে পারব।

—ব্যস, এতেই হবে? মধুসুন্দরী দেবী কে?

বললাম—এতেই হবে। মধুসুন্দরী দেবী আমার আরাধ্যা। কী করে আপনার ডাক শুনতে পাবো আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, কারণ আমিও তার উত্তর জানি না।

আর পেছনে না তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

গল্প থামিয়ে তারানাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—আজ এই পর্যন্ত থাক। সামনে যেদিন আসবে সেদিন আবার

কিছুটা বলা যাবে।

কিশোরী বলল—গল্প শুনতে তো খুবই ভাল লাগে। কিন্তু চট করে ফুরিয়ে যাবে না তো?

তারানাথ হেসে বলল-ফুরিয়ে যাবে কী হে! এই তো সবে পানিফলের ঝকে টান দিয়েছি। পুরো ঝাক এক জায়গায় হতে এখনো দেরি আছে। আচ্ছা, সামনের দিন বলা যাবে বাকিটা।

দ্বাদশ

তারানাথের কাছ থেকে চলে আসার ঠিক পরে

সেদিন তারানাথের কাছ থেকে চলে আসার ঠিক পরে পরেই কোনও ছুটির দিন ছিল না। তারপর দুটো রবিবার আমি আর কিশোরী দুজনেই ব্যস্ত ছিলাম, ফলে গল্পের দারুণ আকর্ষণ থাকলেও তারানাথের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অবশ্য আমরা ইচ্ছে করেও মাঝে মাঝে ফাঁক দিই, বিশেষ করে একটু পুরনো আর লম্বা গল্প শোনার সময়। এ ধরনের গল্প একদিন বা দুদিনে শেষ হয় না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ডুব দিয়ে আমরা দেখতে চাই তারানাথ গল্পের খুঁটিনাটিতে কোনও গোলমাল করে ফেলে কিনা। আজ পর্যন্ত তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি, তিনমাস পরে ফের শুরু করলেও সব

সে ঠিকঠাক বলে। নামধাম ভুল করে না, তারিখ গুলিয়ে ফেলে না, কে কার কী হয় তা সঠিক মনে। রাখে। ফলে আমরা তার গল্প এখন প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, আগের মত কেবল গল্পের নেশা নয়, তার সঙ্গে মিশেছে বেশ কিছুটা শ্রদ্ধা। তবে এবার গল্পের খেই ধরতে একটু দেরি হল, কারণ যে কোম্পানিতে আমি কাজ করি তারা হঠাৎ মাসখানেকের জন্য আমাকে বদলি করল বিহার আর মধ্যপ্রদেশের সীমান্তে একটা জায়গায়। সেখানে কোম্পানির নতুন কারখানা হবে, দু-তিনটে জায়গা দেখা হয়েছে। আপাতত অফিসের একজন মেজকর্তা, সার্ভেয়ার আর আমি যাচ্ছি। ঘোর পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলে থাকতে হবে। রান্নাবান্না, জঙ্গল পরিষ্কার করা, জরিপের কাজে সাহায্য—এসবের জন্য জনপনেরো লোক স্থানীয় কোনও আদিবাসী গ্রাম থেকে জোগাড় করতে হবে। আমার কাজ হল তহবিল আর হিসেবপত্র রাখা, আর সাধারণভাবে সবকিছুর তত্ত্বাবধান করা।

বাঙালী বাড়ি ছেড়ে বেরুতে ভালবাসে না। বেশ আছি বাপু কলকাতায়, বাড়ি অবশ্য গ্রামে—তবু ইচ্ছে করলে দুই কী আড়াইঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে পারি। শহরে মেসে থাকি, মেস থেকে সকালে স্নান-খাওয়া সেরে পান মুখে দিয়ে

ধীরেসুস্থে সাড়ে ন'টায় বেরুলেও কোনও তাড়াহুড়ো না করেই দশটার ভেতর অফিসে হাজির হই। বিকেলে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে অন্য বোর্ডারদের সঙ্গে ব্রিজ খেলায় বসে যাই। রাত দশটায় খাওয়া, এগারোটার মধ্যে বিছানা আশ্রয়। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর একটা নিশ্চিত নির্ভরতা আছে, মসৃণ গতিতে এভাবে জীবন চলে গেলে কে আর যেচে জটিলতা আমদানি। করে? তারপর অফিস থেকে বলছে বটে একমাস, শেষপর্যন্ত সেটা কতদিনে গিয়ে ঠেকবে বলা কঠিন। কাজ শেষ না হলে আমার ভাল লাগছে না বলে বায়না করলে তো আর কোম্পানি কলকাতায় ফিরিয়ে আনবে না। বন্ধু আর আড্ডা ফেলে, সিনেমা থিয়েটার আর শহরের হরেক মজা ফেলে কি জঙ্গলে যেতে ইচ্ছে করে? অফিসের নির্দেশ জানিয়ে বাবাকে চিঠি লিখলাম, আশা ছিল বাবা যদি অত দূরে জনমানবহীন জায়গায় যাওয়া নিয়ে একটুও উদ্বেগ প্রকাশ করেন, তাহলে বাবার স্বাস্থ্য ভাল নয় এই অজুহাত দেখিয়ে অফিসে দরখাস্ত করে যাওয়া ঠেকাতে চেষ্টা করব। হায় রে! নিজের বাবাকে এতদিনেও কেন ঠিকঠাক চিনিনি তা ভেবে অবাক লাগল। বাবা লিখলেন—স্নেহের বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। কলিকাতার বদ্ধ বাঁচা হইতে এতদিনে কর্মের সূত্রে তোমার বাহিরে যাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে ইহার জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। এক

জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতিয়া পড়িয়া থাকিলে মনুষ্যত্বের সম্যক বিকাশ ঘটে না। ঈশ্বরের এই সুন্দর সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখিবার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমাদের যৌবনে এত সুযোগ ছিল না, আমার সারাজীবন পাড়াগ্রামেই কাটিল। যাহা আমি পারি নাই তুমি তাহা করিতে চলিয়াছ ভাবিয়া গর্বিত বোধ করিতেছি। আমার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিও না, আমি ভালই আছি। এখনও বেশ পরিশ্রম করিতে পারি। একমাস কেন, ছয়মাস তুমি বাইরে থাকিলেও ক্ষতি হইবে না। নিয়মিত পত্র দিয়া কুশল জানাইবে। ইতি, আশীর্বাদক–বাবা।

নাঃ, বাবাকে আর মানুষ করা গেল না। সুটকেস গোছাতে শুরু করলাম।

হাতে সময় বেশি ছিল না, ভেবেছিলাম যাওয়ার আগে একবার তারানাথের সঙ্গে দেখা করে যাব, কিন্তু তার আর সময় পেলাম না। কিশোরীকে বলে গেলাম সে যেন তারানাথকে জানিয়ে দেয় খবরটা। মেসে একমাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে গেলাম, ম্যানেজারকে জানিয়ে রাখলাম যদি একমাসেরও বেশি দেরি হয় তাহলে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাব, নইলে কিশোরী এসে দিয়ে যাবে। মেসে বহুদিন আছি, ম্যানেজারের সঙ্গে প্রায় বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে, তিনি হেসে

বললেন—অ্যাডভান্স না দিলেও চলত। এমনিই চলে যান না, বাইরে যাচ্ছেন, হাতে বাড়তি নগদ থাকা ভাল। আমি অবশ্য শুনলাম না, যেখানে যাচ্ছি সেই জঙ্গলে পয়সা খরচ করার কোনও সুযোগ নেই। খামোক বেশি টাকা হাতে রেখে কী করব?

রাত দশটা বেজে দশ মিনিটে হাওড়া থেকে রাউরকেল্লা এক্সপ্রেস ছাড়ে, সেই ট্রেনে রওনা দিতে হবে। পরদিন ভোররাত্তিরে রাউরকেল্লা নেমে বাস ধরে বিরমিত্রাপুর হয়ে সিমডেগা যেতে হবে। বনজঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে প্রায় ষাট মাইল রাস্তা। সিমডেগা বিহারের রাঁচি জেলায় অবস্থিত হলেও জায়গাটা বিহার উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশের প্রায় সংযোগস্থলে। বাঙালী আছে সামান্য কয়েকঘর, বেশিরভাগই বিহারী, মাড়োয়ারি আর হো মুণ্ডা ওরাঁও ইত্যাদি আদিবাসী। সিমডেগায় স্থানীয় অফিস হিসেবে একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সেখানে থাকবে আপাতত একজন মালিগোছের কর্মচারী, সে বাড়িঘর দেখাশোনা করবে আর পাহারা দেবে।

বাঙালী বাড়ির বাইরে যেতে চায় না, শুনেছি বেড়াতে যাবার সময় ঘোড়ার গাড়ি ডেকে তাতে মালপত্র তুলে দরজায়

তালা বন্ধ করবার সময় চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে সে মনে মনে ভাবে না গেলেই হত। আমারও প্রথম দিকে তাই হয়েছিল বটে, কিন্তু যাবার দিন সকাল থেকে মনের বিষণ্নতা কেটে গিয়ে বেশ একটা চনমনে ভাব মনের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। সত্যি বলতে কী, একবার পুরী আর একবার বৈদ্যনাথ ধাম ছাড়া সেভাবে বাইরে বেরুনো হয়নি কখনও। মনটা বিভক্ত হয়ে গিয়ে রক্ষণশীল ভাগটা বলছে—ঘরের নিরাপদ পরিবেশ ছেড়ে বেরুচ্ছ কোথায় বাপু? এসব ইচ্ছে তো ভাল নয়। আবার মুক্ত বাতাসলোভী তরুণ সত্তার অংশটা বলছে—বেরিয়ে পড়, এতবড় পৃথিবীটা শত বৈচিত্র্য নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে তোমারই জন্য। সে সব না দেখে কলকাতায় কেরানীগিরি করে মরবে!

জিতে গেল তরুণ সত্তা। ইতিহাসে চিরকাল তাই জিতেছে।

রাত্রি দশটার পরে ট্রেন, কাজেই মেস থেকে রাত্তিরের খাওয়া সেরেই বেরুলাম পৌনে দশটার মধ্যে রাউলকেল্লা এক্সপ্রেসের নির্দিষ্ট কামরার সামনে পৌঁছে গেলাম। সার্ভেয়ার সাহেব দেখি আগেই এসে গিয়ে দুখানা বেঞ্চিতে চাদর বিছিয়ে জায়গা অধিকার করে রেখেছেন। ট্রেনে বিশেষ ভিড় নেই,

অপর দুটি বেঞ্চির মধ্যে একটিতে মধ্যবয়েসী একজন অবাঙালী ভদ্রলোক পুটলি খুলে সামনে চাপাটির গোছা, সবজি আর আচার নিয়ে বসে গিয়েছেন। অপর বেঞ্চিটি এখনও খালি। সার্ভেয়ার ভদ্রলোকের নাম নির্মল কাঞ্জিলাল, তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নজর রাখছিলেন। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন—এই যে, এই কামরায়! চলে আসুন–

গাড়িতে উঠে সুটকেসটা বাঙ্কে তুলে দিয়ে হোল্ড-অল খুলে বেঞ্চিতে বিছানা পাততে পাততে বললাম—মেজকর্তা তো সেকেন্ড ক্লাসে যাবেন, তিনি এসেছেন তো?

-ওঃ, সে আমাদের আগে! মহা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, এরমধ্যেই দুবার এসে আপনি পৌঁছেছেন কিনা সে খোঁজ নিয়ে গিয়েছেন। একটু খামখেয়ালি, কিন্তু ভাল লোক— এ নির্মলবাবুর কথা শেষ হতে না হতে মেজকর্তা ফের এসে হাজির। জানালায় উঁকি দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—যাক্, এসে গিয়েছেন। আপনারা মশাই ইয়ং ম্যান, আপনাদের এত দেরি হয় কী করে বলুন তো?

সবিনয়ে জানালাম-খাওয়াদাওয়া করে বেরুতে একটু

সময় লেগেছে।

—এঃ হে, খেয়ে এসেছেন! ট্রেন জার্নির আদ্দেক মজাই তো মাটি করেছেন! শুকনো খাবার—যেমন পরোটা, রুটি, সামান্য সবজি, গুটিকয়েক কড়াপাকের সন্দেশ—এইসব নিয়ে ট্রেনে উঠবেন। গুটগুট করে ট্রেন চাবে, আর টুকটুক করে খাবেন। তবে না মজা! তারপর গলার স্বর নিচু করে ওদিকের বেঞ্চিতে ভোজনরত অবাঙালী ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন—ওই দেখুন একজন বুদ্ধিমান লোক। গলার স্বর আবার স্বাভাবিক করে হেসে বললেন—এই দেরি করে খাওয়া সারতে গিয়ে কত লোক ট্রেন মিস্ করে। যাক্, আবার যেন নামতে দেরি করবেন না। আলো ফোটবার আগেই গাড়ি রাউরকেল্লা ঢুকে যায়। বাঙামুণ্ডা পার হতে আরম্ভ করলেই জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবেন–

বললাম–ভয় কী। এ ট্রেন তো রাউরকেল্লা ছাড়িয়ে আর যাবে না–

মেজকর্তা হেসে বললেন—তা ঠিক। আর একটা কথা, টাটানগর ছাড়াবার পর লাইনের দুদিকের দৃশ্য খুব সুন্দর, কেবল পাহাড় জঙ্গল আর ঝর্ণা। চাঁদনি রাত এখন, দেখতে

খুব ভাল লাগবে। আজকে রাত দুটোর পর আর ঘুমোবেন না —

মানুষটার ওপর শ্রদ্ধা জন্মে গেল। অফিসের একঘেয়ে আর নীরস কাজের মধ্যে মেজকর্তার এই সরস ব্যক্তিত্বের দিকটা চোখে পড়ার কোনও সুযোগ ঘটেনি। বরং তার। খামখেয়ালিপনা নিয়ে আড়ালে আমরা সকলে হাসাহাসিই করেছি। কার মধ্যে যে কী। থাকে!

ট্রেন ছাড়ল। রেলের গুমটি, শান্টিং ইয়ার্ড ইত্যাদি ছাড়াবার পর গতি বাড়িয়ে ট্রেন জোরে ছুটতে শুরু করল। প্রথম থামবে একেবারে খঙ্গপুরে। কিন্তু এখন সত্যিই দুদিকে দেখবার কিছু নেই। অতি সাধারণ কিছু কুশ্রী জনপদ, দোকানপাট বন্ধ, পথে মানুষ প্রায় নেই। বিদ্যুতের আলো কম, তেলের বাতি জ্বলছে কোথাও কোনও বাড়ির বারান্দায়। বড় শহরের উপকণ্ঠ যেমন নিরানন্দ আর নীরস হয়। মেজকর্তার কথা মেনে রাত দুটোর পর জাগলেই হবে এখন। মাথার পেছনে দুইহাত দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে কামরার ছাদে কম পাওয়ারের বাতিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ট্রেনের দুলুনিতে আস্তে আস্তে ঘুম পেয়ে গেল।

ঘণ্টা আড়াই পরে ঘুমটা আপনিই ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখি রাত প্রায় একটা। তার মানে সামনে খড়গপুর আসছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। চাদের আলোয় ধোয়া মাঠপ্রান্তর দ্রুতবেগে পেছনদিকে ছুটে চলেছে, মৃদু আলোয় দৃশ্যমান। পরিবেশে ফুটে রয়েছে এক দৈবী মায়া। এখনও এক কী দেড়ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে উঠলেই হবে। আবার শুয়ে পড়তে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আকাশের অনেকখানি অংশে দীর্ঘ পথরেখা টেনে চন্দ্রালোকিত মাঠে এক বিশাল নীল উল্কা এসে পড়ল! আকাশে তার সঞ্চরণপথে এখনও আবছা নীল আভা জেগে রয়েছে। দুরন্ত গতিতে ছুটে এসে মাঠে পড়ার প্রচণ্ড অভিঘাতে বোধহয় উল্কাটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল, একরাশ নীল আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠল মাঠের বুক থেকে। স্কুলের পাঠ্যবইতে পড়েছিলাম প্রতিদিনই বহু উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, কিন্তু তার ভেতর খুব কমই মাটি পর্যন্ত পৌঁছায়। আমিও এই প্রথম কোনও উল্কা মাটিতে পড়তে দেখলাম। তাছাড়া উল্কা কি কখনও নীল রঙের হয়? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা—বহুদিন আগে তারানাথ কালভৈরবের উপাখ্যান শোনাবার সময় বলেছিল তার জন্মমুহূর্তে নাকি বিশাল এক নীল উল্কা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি চলে গিয়েছিল ঠিক এমনি পথরেখা

তৈরি করে। এবার যে গল্প অসমাপ্ত রেখে বাইরে যাচ্ছি—ফিরে নিশ্চয়ই বাকিটা শুনব—তাতেও তারানাথ একবার এই ব্যাপারটার উল্লেখ করেছিল বলে মনে পড়ল। এই দুটো ঘটনার কি কোনও যোগসূত্র আছে? নইলে আজই হঠাৎ নীল উল্কাপাত দেখলাম কেন?

অবশ্য একটা কথা ঠিক, এর আগে খুব একটা বাইরে বেরুই নি কখনও। গ্রামের পাঠশালা সাঙ্গ করে মহকুমা শহরে হোস্টেলে থেকে পড়তাম। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতার কলেজ, তারপর কলকাতাতেই চাকরি। আমি সত্যেন দত্ত বা নজরুলের কবিতার বাংলার দামাল ছেলে নই, সেভাবে দেখা হয়নি কিছু। জীবনে প্রথম গৃহপ্রাঙ্গণ পার হয়ে বেরুতে না বেরুতে একটা বিচিত্র জিনিস দেখে ফেললাম। এমনই অভিজ্ঞতার জনক!

আবার শুয়ে পড়তে যাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়ল ওধারের বেঞ্চের দিকে।

সেখানে একজন মানুষ শুয়ে ঘুমোচ্ছ। ঘুমোচ্ছে বললাম বটে, কিন্তু নিদ্রিত লোকের দেহে এক ধরনের অচেতন শিথিলতা থাকে-একে দেখে মনে হয় যেন এমনি এমনি চোখ

বুজে শুয়ে রয়েছে। বছর চল্লিশেক বয়েস হবে, পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া বা পিরাণ জাতীয় কিছু। মুখশ্রী শান্ত আর নিরীহ, সে মুখে এমন একটা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য বারবার তাকাতে ইচ্ছে করে। যদিও লোকটি একটু ওপাশ ফিরে শুয়ে থাকায় সম্পূর্ণ মুখটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু কথা হল, লোকটি ট্রেনে উঠল কখন? হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়ার সময় পর্যন্ত কামরায় আমি, নির্মলবাবু আর সেই ভোজনরত অবাঙালী ভদ্রলোক ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। গাড়িতে ঠিক গভীর ঘুম হয় না, আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে চাকার শব্দ, লাইনের ক্রসিং পার হবার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ, কামরার দুলুনি—সব অস্পষ্টভাবে টের। পাওয়া যায়। কাজেই আমি জানি ট্রেন মধ্যে কোনও স্টেশনে থামেনি। থামলে টের পেতাম। তা হলে?

অথবা থেমেছে নিশ্চয়ই, হয়তো মাঝখানে একটু গভীর ঘুম হওয়ায় বুঝতে পারিনি। নইলে আস্ত একটা মানুষ তো বাতাসে উড়ে এসে কামরার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েনি!

এইসব ভাবছি, গাড়ি ঢুকে পড়ল খঙ্গপুর স্টেশনে।

এত রাত্তিরে প্ল্যাটফর্মে ভিড় ছিল না। দু-একজন ঝিমন্ত চা-ওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই কামরায় কেউ উঠল না। নির্মলবাবু ঘুমের মধ্যেই একবার বিড়বিড় করে বললেন—কী স্টেশন?

বললাম-খড়গপুর।

'বাঃ বাঃ, বেশ!' বলে নির্মলবাবু পাশ ফিরে আবার গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ট্রেন ছাড়তে আমিও আরাম করে শুয়ে চোখ বুজলাম।

পরের বার ঘুম ভাঙল ট্রেন থামার সামান্য ঝাঁকুনিতে : রাত তখন সওয়া তিনটে। দেখলাম ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। আমাদের কামরার ঠিক সামনেই লোহার খুঁটির ওপর তেলের বাতি জ্বলছে, যদিও চমৎকার জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে, বাতির কোনও দরকার নেই, তবু সরকারী আইন—গাড়ি আসবার দশ-পনেরো মিনিট আগে স্টেশনের কুলি এসে বাতি জ্বেলে দিয়ে যায়। সারারাত টানা জ্বলে না, তাতে সরকারের অকারণ খরচ বাড়ে। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লাল কুর্তা পরা রেলের এক কুলি কামরার পাশ দিয়ে গম্ভীর

হেঁড়ে গলায় বলতে বলতে চলেছে—গৈলকেরা। গৈলকেরা-

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কী স্টেশন এটা, ও ভাই?

সে হাঁটতে হাঁটতেই বলল-গৈলকেরা, বাবুজি।

মেজকর্তা ঠিকই বলেছিলেন, ভারি অপূর্ব দৃশ্য তো এ লাইনের! স্টেশনের একেবারে গা ঘেঁষে একটা বনজঙ্গলে ভর্তি পাহাড় উঠে গিয়েছে ওপরদিকে। প্ল্যাটফর্মে জনমানব নেই, পরিবেশে কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই, কেবল চাদের আলোয় হাল্কা স্বপ্নের রঙ দিয়ে আঁকা একখানি দক্ষ শিল্পীর তৈরি ছবি আমার সামনে মেলে রাখা আছে। হঠাৎই নৈশ মগ্নতা ভেঙে সামনের পাহাড়ের জঙ্গল থেকে কর্কশ গলায় কী একটা প্রাণী ডেকে উঠল। অবাক হয়ে ভাবছি, জিনিসটা কী হতে পারে, এমন সময় আমার পেছন থেকে নির্মলবাবুর গলা ভেসে এল—ময়ুর! ওটা ময়ুরের ডাক-

পেছনে তাকিয়ে দেখি সার্ভেয়ার সাহেব ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন।

বললাম-হ্যাঁ। প্রথমে বুঝতে পারিনি, তারপরে মনে

পড়ল কলকাতার চিড়িয়াখানায় এই ডাক শুনেছি। শহরের লোক তো, একটু ধাঁধা লেগে যায়। আপনি কী করে বুঝলেন?

একটা হাই চেপে সার্ভেয়ার সাহেব বললেন—সিনেমা দেখে।

—সিনেমা দেখে। তার মানে?

—আরে মশাই, আমিও আপনার মত শহরের মানুষ, ময়ূরের ডাক রোজ শুনব কোথা থেকে? গত মাসে ভক্ত ধ্রুব ফিলিম দেখতে গিয়েছিলাম, তাতে একটা দৃশ্যে রয়েছে ধ্রুব জঙ্গলে চোখ বুজে বসে ধ্যান করছে, আর তার চারদিকে চরে রেড়াচ্ছে কটা ময়ূর। তারই মধ্যে একটা কয়েকবার ক্যাক ক্যাক করে ডাকল। কিন্তু সে আওয়াজে ধ্রুবর ধ্যান ভাঙল না, ডিরেকটার সেই ব্যাপারটাই দেখাতে চেয়েছিলেন। সেটা মনে পড়ে গেল–

নির্মলবাবু উঠে এসে আমার বেঞ্চিতেই জানালার ধারে বসলেন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন–নিন।

একসঙ্গে বাইরে বেরুলে একটা সহজ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে পদমর্যাদা কিংবা সামাজিক। অবস্থানের পার্থক্যটুকু মুছে দেয়। তবু অফিসে নির্মলবাবু আমার ওপরওয়ালা, উনি দিচ্ছেন বলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তুলে নেওয়া যায় না। সসঙ্কোচে বললাম-না, থাক–

—থাক কেন, নিন-ধরান একটা। এখন আমাদের বেশ কিছুদিন একসঙ্গে থাকতে হবে। লজ্জা ঝেড়ে না ফেললে চলবে কী করে? আপনি স্মোক করেন তা আমি জানি–

ক্যাভেন্ডার্স নেভিকাট একখানা ধরিয়ে মাথা সোজা করতেই প্রথম নজর পড়ল ওপাশের বেঞ্চিতে। অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

সেই মাঝপথে হঠাৎ উঠে আসা রহস্যময় লোকটি আর সেখানে নেই।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে নির্মল কাঞ্জিলাল একবার ওপাশে তাকালেন, তারপর বললেন—কী হয়েছে? ওদিকে অমন করে কী দেখছেন?

বললাম–না, মানে-ওই ওদিকের বেঞ্চিতে একজন লোক শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, সে গেল কোথায়?

নির্মলবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—মাঝে কোনও স্টেশনে নেমে গিয়েছে হয়তো। জিনিসপত্র কিছু নিয়েটিয়ে যায়নি তো? দেখে নিন ভাল করে, দিনকাল খারাপ পড়েছে–

—না, ঠিক তা নয়, মানে—

বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশি কথা বললে নির্মলবাবু হয়তো আমাকে বাতিকগ্রস্ত ভাববেন। কথার গতি বদলে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম —কী অপূর্ব দৃশ্য, তাই না? মেজকর্তা ঠিকই বলেছিলেন, বাকি রাতটুকু আর। ঘুমোনা উচিত হবে না–

নির্মল কাঞ্জিলাল মানুষ ভাল, কিন্তু একটু বাস্তববাদী নীরস প্রকৃতির। ক্যাভেন্ডার্সে একটা লম্বা সুখটান দিয়ে জানালা গলিয়ে অবশিষ্টাংশ বাইরে ফেলে আবার শোয়ার উদ্যোগ করতে করতে তিনি বললেন—আপনাদের মনে অসীম কবিত্ব, জেগে বসে প্রকৃতি দেখুন বরং, আমি আরও ঘণ্টাদুই ঘুমিয়ে নিই। রাউরকেল্লা ঢোকবার মুখে ডেকে দেবেন।

মেজকর্তা অমন করে বললেন, তাঁর মুখের ওপর তো আর 'না' বলা যায় না। কিন্তু আমার ঘুমই ভাল–

তিনি আবার লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ বুজলেন। অবাঙালী ভদ্রলোক সেই যে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়েছেন, সারারাত ট্রেনের দুলুনি ঝাঁকুনি বা আমাদের কথাবার্তার শব্দে। তার নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি। এসব নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ মানুষ দেখলেও হিংসে হয়।

রাউলকেল্লা পৌঁছনো পর্যন্ত সত্যিই আমার আর ঘুম হল না। শুক্লা নবমীর চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, সট সফ্ট পিছিয়ে যাওয়া বড় বড় গাছগুলোর দীর্ঘ ছায়া মাটিতে। হঠাৎই একটা কালো গ্রানাইটের টিলা লাইনের পাশেই, ক্ষীণধারা ঝর্না নেমে এসেছে তার গা বেয়ে। আর সবকিছুর ওপর সেই ম্লান হয়ে আসা শেষরাতের মায়াবী জ্যোৎস্না। সম্মোহিতের মত বাকি রাতটুকু জানালার পাশে বসে কাটিয়ে দিলাম।

ট্রেন যখন রাউরকেল্লা পৌঁছল তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। আমরা তিনজন যখন স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখনও মানুষজন জাগেনি, দু-তিনটে ছোট গুমটি দোকান আছে—বোধহয় চা বা খাবারের, সেগুলো বন্ধ। কেবল মাথায়

পাগড়ি জড়ানো এক বৃদ্ধ নলওয়ালা পেতলের কলসীতে করে চা বিক্রি করছে। তাকে ডেকে সবাইকে চা দিতে বলা হল। ভঁড়ে চুমুক দিয়ে মেজকর্তা বললেন–সিমডেগা থেকে জিপ নিয়ে লোক আসবার কথা ছিল, কী হল তাদের বুঝতে পারছি না তো–

প্রথম ভাঁড় শেষ করে মেজকর্তা চাওয়ালাকে বললেন–আর একবার করে দাও, এই এতেই দাও—

দ্বিতীয়বারের চায়ে যখন চুমুক দিচ্ছি, তখনই একটা রঙওঠা উইলির জিপ নানারকম শব্দ করতে করতে স্টেশন চত্বরে এসে ঢুকল। তার থেকে নেমে হহ করে আমাদের সামনে দাঁড়াল এক অদ্ভুত চেহারার মানুষ। অদ্ভুত বলছি এই কারণে যে, লোকটি কেবলই লম্বা—তার শরীরের অন্য কোনও মাত্রা নেই। সরু সরু কয়েক টুকরো বাঁশের ওপর পোশাক-আশাক জড়ালে যেমন দেখায়, একেও ঠিক তেমনি দেখতে। ছোটবেলায় পাঁকাটি আর তালপাতা দিয়ে তৈরি একরকমের খেলনা সেপাই মেলায় বিক্রি হতে দেখেছি, এই মানুষটিকে দেখে সে কথা মনে পড়ে গেল।

লোকটি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বারদুই প্রবল হোঁচট

খেয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে নির্ভুলভাবে মেজকর্তাকে দলপতি হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে বলল–নমস্কার। আমি জলধর পণ্ডা।

মেজকর্তা বললেন—নমস্কার। তুমি আমাদের সিমডেগা অফিসের ওভারসিয়ার?

—আইজ্ঞাঁ।

জলধর পণ্ডার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে সে কোন অঞ্চলের মানুষ তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে মানুষ ভাল তাও তার বিনীত কথা বলার ভঙ্গি আর আচরণে বোঝা যায়।

--ঠিক আছে। আমাদের মালপত্রগুলো জিপে ওঠাবার ব্যবস্থা করো। যেতে যেতে কথা হবে—

আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস কারোই খুব বেশি নেই, একটা করে তোরঙ্গ আর একটা করে বিছানার বাণ্ডিল। কেবল সার্ভেয়ার নির্মলবাবুর জরিপের কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তিনটে বড় কাঠের তালা-লাগানো বাক্সে চলেছে। দুরবীন-চেনথিওড়োলাইট এবং আরও কী কী সব। জিপের

সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসলেন মেজকর্তা। আমি, নির্মলবাবু আর জলধর পেছনের দু-সারি মুখখামুখি সিটে ভাগ করে। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করল তখন ভোরের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। জলধর। বলল—এখনও শহরের দোকানপাট কিছু খোলেনি। চলুন, কুড়ি-বাইশ মাইল গেলে বিরমিত্রাপুর বলে একটা ছোট জায়গা পড়বে। সেটা বিহার আর উড়িষ্যার বর্ডার, সেখানে। একটা খাবারের দোকানে সকালে খুব ভাল কচুড়ি আর জিলিপি ভাজে, বহু লোক ভিড় করে খেতে আসে। আমরাও ওই দোকানেই খেয়ে নেব। আপনাদের খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে নিশ্চয়–

সামনের সিট থেকে মুখ না ঘুরিয়েই মেজকর্তা বললেন —কচুড়ির সঙ্গে কী দেয়?

একটু অবাক হয়ে জলধর বলল—আইজ্ঞাঁ?

-বলছি কচুড়ির সঙ্গে সে দোকানে কী দেয়? ডাল, না তরকারি?

—অঃ, না তরকারি না—ডাল দেয়। বুটের ডাল—

একটা নিঃশ্বাস ফেলে মেজকর্তা বললেন—আমি ছোটবেলায় যে ইস্কুলে পড়তাম, সেই স্কুলের দারোয়ান শান্তি টিফিনের সময় ছেলেদের কাছে বিক্রি করার জন্য লুচি ভাজত।

লুচির সঙ্গে দিত আলু, কুমড়ো আর পেঁয়াজ দিয়ে রান্না একটা তরকারি। সত্যি কথা বলতে কী, ওই তরকারির লোভেই আমরা শান্তির লুচি কিনে খেতাম। সে স্বাদ এখনও মুখে লেগে রয়েছে। বড় বড় সাইজের লুচি, দু-পয়সা করে দাম নিত–

বললাম—এক একজন লোকের রান্নার হাত খুব ভাল হয়। ঠিকই বলেছেন–

মেজকর্তা বললেন—এক্ষেত্রে ব্যাপারটা শুধু ভাল রান্নার নয়। এখন বুঝতে পারি দুটো কারণে শান্তির রান্না আমাদের ভাল লাগত। প্রথম কারণ, তখন অল্প বয়েস, বাড়ির আটপৌরে রান্নার বাইরে অন্য কোনও ভাল খাবার খাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। সেই অনভিজ্ঞ রসনায় দোকান থেকে কিছু কিনে খেলেই তা মধুর লাগত। দ্বিতীয় কারণ, রান্নায় কুমড়োর সঙ্গে পেঁয়াজের ব্যবহার, আমাদের পরিবারে, বা সাধারণভাবে

বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে ছিল না। সেই নতুনত্বটাও আকর্ষণ করত।

একটু থেমে মেজকর্তা আবার বললেন—বছরদুয়েক আগে কী একটা কাজে আমার ছোটবেলার সেই ইস্কুলে একবার যেতে হয়েছিল। কাজ সেরে বেরুবার সময় হঠাৎ মনে হল একবার শান্তির খোঁজ করে যাই। স্কুলের বড় ফটকের পাশে দুখানা নিচু ধরনের টালির ঘরে সপরিবারে শান্তি বাস করত। ঘরদুটো দেখলাম একইরকম আছে। ডাকাডাকি করতে একজন নজদেহ বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল-কাকে খুঁজছেন?

বললাম—এই ঘরে শান্তি বলে একজন থাকত, এই স্কুলের দারোয়ান। অনেকদিন আগের কথা বলছি। সে এখন কোথায় থাকে বলতে পারেন?

কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা সেই বুড়ো অবাক হয়ে একটু তাকিয়ে থেকে বলল—আমিই তো শান্তি!

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, ছোটবেলায় যে শান্তিকে দেখেছি অনেকটা মিল আছে তার সঙ্গে। কিন্তু জরা

তার পূর্বের চেহারাকে গ্রাস করেছে। শান্তি বলল–আপনি কে বাবু? আমাকে কেন খুঁজছেন?।

বললাম—আমি এই স্কুলে অনেকদিন আগে পড়তাম। তুমি টিফিনের সময় লুচি ভাজতে, মনে আছে? লুচি খাবার জন্য পয়সা জমিয়ে রাখতাম। ওঃ, তুমি বড্ড বুড়ো হয়ে গেছ শান্তিদা–

শান্তি হেসে বলল—তা হব না? বয়েস পঁচাত্তর হল। তোমার নাম কী খোকাবাবু?

নাম বললাম, আমাদের ব্যাচের দু-একজন ছেলের নাম বললাম। সে ভাল চিনতে পারল না। কিন্তু পুরনো ছাত্র মনে করে দেখা করতে এসেছে, এতেই সে ভারি খুশি। আর চাকরির বয়েস নেই, কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ ভালবেসে পুরনো দুটো ঘরের মধ্যে একটায় তাকে থাকতে দিয়েছে। সেখানেই বাকি জীবনটা সে কাটিয়ে দেবে। আমাকে সে আবার যেতে বলেছিল। আর যাওয়া হয়নি।

বিরমিত্রাপুর এসে গেল। গরম কচুড়ি আর জিলিপি পেট ভরে খেয়ে আবার পথে। গাড়িতে ওঠবার আগে নির্মলবাবুর

মতই মেজকর্তাও বললেন—শুনুন ভাই, বাইরে কাজ করতে এসেছি, এখানে আর অফিসের ফর্মালিটি টেনে আনবেন না। সিগারেট খেলে ধরিয়ে ফেলুন—

সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে উঠলাম। পথের দুধারে প্রান্তর, কোথাও শ্যামল শোস্তীর্ণ, কোথাও প্রস্তরময়। কখনও বা নিবিড় বনভূমি, তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী নদী। পথ কখনও চড়াই ভেঙে উঠছে, কখনও আবার নেমে আসছে সমতলে। এই আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমার হবে।

পরের এক সপ্তাহের ভেতরেই উপলব্ধি করেছিলাম, তারানাথ আমার জীবনের সঙ্গে কতখানি জড়িয়ে গিয়েছে।

যাক, যেভাবে ঘটেছিল সেভাবেই ঘটনাটা বলি।

ত্রয়োদশ

সিমডেগা একটি প্রায় ঘুমন্ত নির্জন শহর

সিমডেগা একটি প্রায় ঘুমন্ত নির্জন শহর। ছাড়া ছাড়া কিছু বাড়িঘর কয়েকটা সরকারি অফিস, কিছু দোকানপাট, একটা ইস্কুল—এই নিয়ে পুরো জনপদ। মূল নগরসীমানার বাইরে আরণ্য পরিবেশে হো, ওরাওঁ বা মুন্ডাদের গ্রাম। একটিই মাত্র পাকা রাস্তা শহরের মাঝখান দিয়ে রাঁচির দিকে চলে গিয়েছে। এই রাস্তারই অপর প্রান্ত দিয়ে আমরা সিমডেগায় ঢুকলাম।

সামান্য এগিয়ে বাঁদিকে একটা মোরামে ঢাকা পথে ঢুকল গাড়ি। পথের দুপাশে বেগুনি-সাদা-কমলা ফুলওয়ালা

পুটুস গাছের ঝোপ। পাহাড়ি অঞ্চলের একটা বিশিষ্ট প্রভাতী আমেজ আছে, কড়া রোদ্র উঠে তা এখনো নষ্ট হয়নি। রাস্তার ধারে টালিছাওয়া পাকা দেওয়ালের একখানা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির সামনে এসে আমরা থামলাম। জলধর তাড়াতাড়ি করে গাড়ি থেকে নেমে হাতজোড় করে গৃহস্বামীর মত সবাইকে বলল—আসুন। বাবুরা, আসুন। থাকার ঘর সব এদিকে, ওদিকে রান্নাঘর, গোসলখানা আর ভাড়ার। আসুন–

আধঘণ্টার মধ্যে পোশাক বদলে হাতমুখ ধুয়ে তিনজনে এসে বসলাম বারান্দায় পাতা চেয়ারে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল গরম চা। কোম্পানি কাজের কোনও অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য রান্নার লোক, ঘরদোর পরিষ্কার বা বাজার করার কর্মী সব নিয়োগ করে রেখেছে। নিজের বাড়ি গ্রামে, থাকি কলকাতার মেসে, তার তুলনায় একে রাজকীয় আরাম বলা যেতে পারে। কাজ করি বিলিতি মার্কেন্টাইল ফার্মে মধ্যমবগীয় করণিকের পদে, সেটা এমন কিছু গৌরব করে বলে বেড়াবার মত কিছু নয়। কিন্তু সদর দপ্তরের বাঁধাধরা নিয়মনীতির বাইরে এখানে এসে এই প্রথম চাকরির একটা স্বস্তিজনক মৃদু আরাম অনুভব করলাম। বাংলোবাড়ির বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি, দুজন ওপরওয়ালার সঙ্গে সমানে সমানে আচরণ করছি, কাছে-দূরে শাল-সেগুনের

সারি, নীলচে পাহাড়শ্রেণী। আঃ! সুখের আর কী বাকি রইল!

জলধর পণ্ডার পেছনে যে লোকটি ট্রে-তে করে চা নিয়ে এসেছিল, সে বিনীত মুখে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেজকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন-তোমার নাম কী?

লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল—আমার নাম ডহরু লোহার।

বাঃ, বেশ। তুমি অনেকদিন আছ এখানে?

—আজ্ঞে, বাপ-পরদাদার সময় সময় থেকে আছি। বহুদিন হল–

জলধর বলল-এরা সব স্থানীয় লোক বাবু। চারদিকে সব পাহাড় দেখছেন না? ওই পাহাড়ের ভেতরে অনেক গ্রাম আছে। এরা সেই গ্রামে থাকে। তুমি তো মুন্ডা, না ডহরু?

ডহরু বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ–

তার কথায় হিন্দি বাংলা ওড়িয়া এবং আমাদের

অপরিচিত-সম্ভবতঃ মুন্ডারি ভাষার–মিশ্র একটা টান। জলধরকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি বাঙালীও আছে নাকি?

–আইজ্ঞাঁ, আছে কয়েক ঘর। সবকারি অফিসে কাজ করে। আর আছে বিশ্বাসবাবু, এখানকার ইস্কুলের মাস্টারমশাই। খুব ভাল লোক, আলাপ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে —

ভারতের যে কোনো দুর্গম প্রত্যন্ত প্রদেশের মতই সিমডেগাতেও কিছু বাঙালী এসে বাস করছে বুঝতে পারলাম। তাদের সংস্পর্শে এসে ডহরুর ভাষায় বাংলার টান লেগেছে।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, কাপ-ডিশগুলো আবার ট্রে-তে তুলে চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ডহরু বলল—জলধরদা, আজ সকালে আবার একটা মরা পাখি দেখলাম–

—আবার! কোথায় দেখলি?

সকালবেলা সবজি তুলতে বাগানে গিয়েছিলাম। খিড়কির

দরজার একেবারে সামনে মরে পড়েছিল। আমি তুলে বেড়ার বাইরে ফেলে দিয়েছি–

—কী পাখি? সেদিনের মত কাক?

—না, শালিক। দু-চারটে পালকও ছেড়া ছিল। সব গুছিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি।

—আচ্ছা, যা এখন তুই। ডাল, ভাজি আর আন্ডার ঝোল হবে দুপুরে—

ডহরু চলে গেলে মেজকর্তা বললেন—এই পাখি মরার ব্যাপারটা কী জলধর?

—আইজ্ঞাঁ, কিছু না। পরশুদিন বাড়ির ফটকের সামনে একটা কাক মরে পড়েছিল। আর আজকে নাকি একটা পেছনের বাগানে পেয়েছে। ও কিছু না বাবু, বেড়াল-কুকুরে কামড়ে মেরেছে আর-কি। পালক ছেড়া ছিল শুনলেন তো–

কথাটা সেইখানেই তখনকার মত চাপা পড়ে গেল। কিন্তু কেন যেন এই ধরনের কী একটা ব্যাপার আমি আগে শুনেছি।

সেখানে এমনই মরা পাখি দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের পর্ব শুরু হয়েছিল। কোথায়? কোথায়?

তারপরেই বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল তারানাথের কাছে শোনা সেই মাকালীর কৌটোর গল্প। সেখানেও চণ্ডিকাপ্রসাদ মিত্রের বাড়িতে ঢোকবার পথে মরা চড়ুই পাখি দেখে তারানাথ ভাবী অমঙ্গলের আভাস পেয়েছিল। অবশ্য–

অবশ্য সর্বদাই কোথাও পাখি মরলে সেখানে খারাপ কিছু ঘটবে এমন মনে করাটা যুক্তিসিদ্ধ নয়। পাখি তো মরেই, নইলে সমস্ত পৃথিবী পাখিতে ভরে যেত না!

কিন্তু যতই ভোলবার চেষ্টা করি না কেন, মনের কোণে চিন্তাটা রয়েই গেল। কাক বা শালিক খুব চতুর পাখি, হঠাৎ তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে পালক ছিঁড়ে মেরে ফেলা বেশ কঠিন কাজ।

মেজকর্তা বললেন—নির্মলবাবু, আজকের দিনটা আমরা ছুটি করি, কেমন? সকলেই ক্লান্ত, নতুন জায়গায় এসে খাপ খাইয়ে নিতেও একটু সময় লাগে। আজ শুয়ে বসে কাটিয়ে

কাল থেকে কাজ শুরু করা যাবে। জলধর, যে সাইট সার্ভে হবে সেটা এখান থেকে কতদূর?

—ছাব্বিশ মাইল আই। জিপে একঘণ্টা। পাহাড়ি পথ—

–সেখানে লোজন, তবু এসব পাঠাবার কী ব্যবস্থা করেছ? কাল আমরা সাইট দেখতে যাব, পরশু বা তার পরের দিন থেকে তো গিয়ে সেখানে বাস করতে হবে

–সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। তিনদিন আগে তোক পাঠিয়ে দিয়েছি, তারা জঙ্গল কেটে সাফ করে তাঁবু খাটিয়ে রাখবে। ইচ্ছে করলে কাল থেকেই থাকতে পারেন–

মেজকর্তা বললেন—দেখি।

সারাটা দিন আলস্যে কেটে গেল। বাড়িটায় পাঁচ-ছখানা ঘর, আমি একটা আলাদা ঘর পেয়েছি। কলকাতার মেসে চারসিটের ঘরে থাকার পর এটাও আমার কাছে বড় বিলাসিতা। দুপুরে খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, যখন উঠলাম তখন রোদুর পড়ে এসেছে। জলধর পণ্ডা এসে বলল —বাইরের বারান্দায় চা দিয়েছি বাবু। আর বিশ্বাসবাবু

এসেছেন আপনাদের কথা শুনে। আসুন বাবু–

চায়ের টেবিলের পাশে আর একখানা বেতের চেয়ার বাড়তি পাতা, তাতে ধুতিপাঞ্জাবি পরা একজন সৌম্য চেহারার মানুষ বসে আছেন। বয়েস বছর পঞ্চাশেক হবে, কিন্তু চেহারায় প্রৌঢ়ত্ব শুরু হবার বিশেষ কোনো ছাপ পড়েনি, রগের পাশে দু-একগাছা পাকা চুল ছাড়া। চোখের চাউনিতে বিবেচনার প্রকাশ।

মেজকর্তা বললেন—এই যে, আসুন। ইনিই হচ্ছেন বিশ্বাসবাবু, যাঁর কথা আজ জলধর সকালে বলছিল। এখানকার ইস্কুলের ইংরিজির মাস্টারমশাই—

নমস্কার এবং প্রতিনমস্কারের পর বসলাম।

বাইরের প্রান্তরে আর অরণ্যে একটু একটু করে দিনাবসানের ছায়া নামছে। সকাল আর দুপুরের ঝকঝকে আলোয় যে জায়গাটা উজ্জ্বল, কবিত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল, এখন তারই ওপরে যেন কেমন একটা ম্লান বিষণ্ণতা নেমে আসছে। কলেজজীবন থেকে কলকাতার জাঁকজমক আর বিদ্যুতের আলোর মধ্যে বাস করে অভ্যেস, সন্ধের মুখে

সিমডেগার রূপ মনকে একটু দমিয়ে দিল। দুপুরে খাওয়ার সময় জলধরকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি শহরে এখনো বিদ্যুৎ আসেনি, দু-একজন ধনী ব্যবসায়ী পরিবার জেনারেটর চালিয়ে নিজেদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বালায়।

বিশ্বাসবাবু বেশ অমায়িক আর মিশুকে মানুষ। চা শেষ করে টেবিলে কাপ নামিয়ে রেখে বললেন—অরিজিনালি আমার বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়। পানিপারুল নাম শুনেছেন? সেই পানিপারুলে আমার জন্ম হয়। এগরা নয়তো রামনগর দিয়ে যেতে হয়। কলকাতায় রিপন কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে এখানে কাজ নিয়ে চলে আসি। এক আত্মীয় ব্যবসার সূত্রে সিমডেগায় যাতায়াত করতেন, তিনিই যোগাযোগ করিয়ে। দিয়েছিলেন। তখন স্কুল নতুন হয়েছে, শহরেরও পত্তন হয়েছে সবে। সামান্য কিছু বাড়িঘর, দোকানপাট—এই। তারপর রাঁচি জেলার সাবডিভিশন হওয়ার পর থেকে চটপট বসতি গড়ে উঠল, ব্যবসা জেঁকে উঠল—

নির্মলবাবু জিজ্ঞেস করলেন—এখানে বেশ মন বসে গিয়েছে আপনার?

—তা গিয়েছে। এখন তো এই আমার দেশ, ঘরবাড়ি—

–কেন, মেদিনীপুরে আপনার বাড়িতে কেউ নেই এখন?

—কেউ না। বাবা-মা মারা গিয়েছেন, ভাই গুজরাটে চাকরি করে আজ বিশবছর, তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই বললেই চলে। ব্যস, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক মিটে গিয়েছে। তাছাড়া কী জানেন, হৈ-হট্টগোল থেকে দূরে থাকতে থাকতে একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এই বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত নির্জনতা আর পাখির ডাক-মানুষের আদি বাস তো এর মধ্যেই ছিল, তাই না? সেকথা যখন ভাবি তখন কোনো কষ্ট হয় না–

মেজকর্তা নিজে একটু ভাবুক ধরনের মানুষ, বিশ্বাসবাবুর কথাগুলো বোধহয় তার ভাল লাগল। তিনি বললেন—বাঃ, আপনি তো দেখছি রীতিমত একজন কবি! সুন্দর বলেছেন–

অসিত বিশ্বাস বললেন (নামটা একটু আগে জেনেছি)– না, না, কবি নই। তবে ঈশ্বরের এই অদ্ভুত সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখতে ভাল লাগে–

তারপর কথার গতি পরিবর্তন করে বললেন–আপনারা কি কালই কাজের জায়গায় যাচ্ছেন? যান, ভাল লাগবে, খুব সুন্দর জায়গা–

—সুন্দর বলতে কী অর্থে? আপনি গেছেন সেখানে?

—অনেকবার। এখান থেকে কাঠ-ব্যবসায়ীদের লরি যায়, তাতে চড়েই গিয়েছি। সুন্দর মানে রামরেখা পাহাড়ের রূপ দেখলে আপনারা মোহিত হয়ে যাবেন। নিবিড় জঙ্গল পাহাড়ের ঢালুতে, কোথাও জনমানব নেই, এত নিস্তব্ধ পরিবেশ যে পাতা খসে পড়ার শব্দ শুনতে পাবেন। সারাজীবন ধরে গল্প শোনাবার মত জায়গা–

মেজকর্তা একটু কী ভেবে বললেন—অসিতবাবু, আপনিও কাল চলুন না আমাদের সঙ্গে। প্রিয় জায়গায় আপনারও আর একবার বেড়ানো হয়ে যাবে, আমরাও একজন ভাল ভ্রমণসঙ্গী পাব। যদি খুব জরুরী কাজ না থাকে তাহলে–

অসিতবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বোঝা গেল বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি খুশি হয়েছেন। আমি বললাম–

চলুন না, আমার তাবুতে দুজনে ভাগাভাগি করে থাকা যাবে–

অসিতবাবু বললেন—বেশ তো, তাই হবে তাহলে। সামনের দু-দিন ইস্কুল ছুটি আছে, দরকার হলে আরও বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। ছুটি তো নেবার দরকার হয় না, জমে জমে পচে যাচ্ছে—

আমি মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলাম। মেজকর্তা আর সার্ভেয়ার সাহেব দুজনেই লোক ভাল, আমার সঙ্গে অত্যন্ত দ্র ব্যবহারও করছেন। কিন্তু হাজার হলেও তারা আমার ওপরওয়ালা, একেবারে খোলা মনে কাঁধে হাত রেখে কথাও বলা যায় না, পুরোপুরি সহজ হতেও বাধোবাধো ঠেকে। বিশ্বাসবাবু কবিপ্রকৃতির লোক, মাস্টারমশাই—ইনি সহজেই বন্ধু হতে পারবেন।

–কাল কখন রওনা হচ্ছেন আপনারা?

মেজকর্তা বললেন—সকাল আটটা নাগাদ। আপনি সাতটায় চলে আসুন, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরুনো যাবে–

অসিতবাবু সম্মতি জানিয়ে যাবার জন্য উঠলেন। বললাম চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

অসিতবাবু হেসে বললেন–আমাকে? আপনি তো এখানে নতুন লোক, ফেরবার সময় আবার আপনাকে পৌঁছে দিতে আমাকে না আসতে হয়। তা চলুন, মন্দ কী? টর্চ নিয়ে নেবেন একটা, ফেরবার সময় পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসবে।

গোধূলির শেষ পর্যায়। পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যাস্তের রঙ প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে। পাশ রাস্তায় উঠে কিছুদূর হেঁটে আবার বাঁদিকের কাচা পথে নামলেন বিশ্বাসবাবু। ওদিক থেকে কে যেন আসছে আমাদের দিকে, সাদা আলখাল্লার মত পোশাক পরা, লম্বা-চওড়া মানুষ। কাছে আসতে অসিতবাবু হাতজোড় করে বললেন-নমস্কার ফাদার। ভাল আছেন?

এবার বুঝলাম মানুষটি বিলিতি সাহেব, প্রায় সাড়ে ছ-ফিট লম্বা। পরণে ক্রীশ্চান ধর্মযাজকের পোশাক। তিনি নমস্কার করে বললেন—ভাল আছি। ইনি কে?

আলাপ করিয়ে দিয়ে অসিতবাবু বললেন—ইনি কলকাতা থেকে মাসখানেকের জন্য এসেছেন অফিসের কাজে, উঠেছেন

নাথমল শরফের বাংলোতে। আর ইনি হচ্ছেন ফাদার ও'ব্রায়েন, এখানকার সেন্ট বার্থোলোমিউ ক্যাথলিক চার্চের যাজক–

—যাজক বোলো না, বিশ্বাস, যাজক বোললা না। বল ঈশ্বরের কর্মী–

ও'ব্রায়েনের কণ্ঠস্বর মৃদু এবং ব্যক্তিত্ব-উষ্ণ। তিনি বললেন—আচ্ছা, চলি। আবার দেখা হবে।

হাঁটতে শুরু করে টর্চ জ্বালতেই পথের একপাশে চোখ পড়ে আমার মুখ দিয়ে বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। সেদিকে তাকিয়ে অসিতবাবুও বলে উঠলেন—আরে! এটা কী?

রাস্তার ঠিক ধারেই একটা ছাতারে পাখি মরে পড়ে আছে!

ও'ব্রায়েন আমাদের কথা শুনতে পেয়ে আবার ফিরে এলেন। কী হল? কী হয়েছে? তারপর টর্চের আলোকবৃত্তির মধ্যে মরা পাখিটাকে দেখতে পেয়ে বললেন-আঃ, পুওর

ক্রিয়েচার! বেশিক্ষণ না, একটু আগেই বেচারা মারা পড়েছে—

বললাম-কী করে বুঝলেন ফাদার?

ও'ব্রায়েন বললেন-বেশি আগে হলে কুকুরে কিম্বা শেয়ালে টেনে নিয়ে যেত। পাখির মৃতদেহ দেখলে আমার বড় খারাপ লাগে। জানেন, আমরা যারা ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিত, তারা পাখিদের দেবতার দূত বলে মনে করি। উইং অ্যাঞ্জেল–

এটা অবশ্য জানতাম না। বললাম-তাই নাকি?

-হ্যাঁ। সেন্ট ফ্রানসিস অফ আসিসির কথা জানেন তো? যাঁর নামে ব্রাদারহুড অফ দি ফ্রানসিসকান অর্ডার গড়ে উঠেছিল? তাঁর মৃত্যুর সময় পাখির দলের ছদ্মবেশে দেবদূতরা এসেছিলেন তাঁর আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে। পাখি মারা গেলে আমার বড় খারাপ লাগে–

বললাম—এখানে কিন্তু খুব পাখি মরছে। কোনো রোগ বা কিছু ওদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি তো?

অসিতবাবু সকালে জলধরের সঙ্গে আমাদের আলোচনার

ব্যাপারটা জানতেন না। তিনি অবাক হয়ে বললেন—আপনি কী করে জানলেন? আপনি তো আজ এসেছেন–

—আজ সকালে জলধর বলছিল। আমরা যেখানে আছি, সেই বাড়িটার পেছনের বাগানে, বেরুবার গেটের সামনে নাকি পরপর দুদিন দুটো মরা পাখি পাওয়া গিয়েছে মা আমার কথা শুনে ফাদার ও'ব্রায়েন কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—তার মানে এটা নিয়ে তিনটে হল। আরো হয়ত এদিক-ওদিক মরেছে, আমাদের কাছে খবর নেই। ভেরি, ভেরি ব্যাড ওমেন! জানতাম না এমন শুরু হয়েছে–

অসিতবাবু বললেন—আপনি কি এর আগে এরকম ঘটতে দেখেছেন?

—দেখেছি, একবার। বছর দশ-বারো আগে। তারপরেই স্মল-পক্সের মহামারী শুরু হয়। মনে আছে সেই এপিডেমিকের কথা? তখন তো আপনি এখানে এসেছেন–

বিশ্বাসবাবু বললেন-মনে আছে। কিন্তু এপিডেমিকের আগে পাখি মরার ব্যাপারটা জানতাম না!

ফাদার বললেন—যাই হোক, ঈশ্বর সব দুর্যোগ কাটিয়ে দেবেন। অপশক্তি যত বড়ই হোক, ঈশ্বরের শুভশক্তি তার চেয়েও বড়। আমি আজ থেকেই প্রার্থনা করব সকলের ভালোর জন্য–

ফাদার লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর দীর্ঘ চেহারা টর্চের সংক্ষিপ্ত আলোকবৃত্তের বাইরে মিলিয়ে এল। একটু এগিয়েই অসিতবাবুর বাড়ি, ভদ্রলোক বললেন— আসুন না ভেতরে, একটু বসে যান—

—নাঃ, আজ নয়। একটু কাজকর্ম বুঝে নিতে হবে কালকের জন্য। পরে একদিন বরং–

বাংলোতে ফেরবার পথে মনের ভেতর সকালের সেই প্রফুল্ল ভাবটা আর খুঁজে পেলাম না।

রাত্তিরে ভালই ঘুম হল। আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে বাইরের বারান্দায় এসে দেখলাম, কোথাও আশঙ্কার কোনো কালো ছায়া নেই, সব ঝকঝক করছে সকালের আলোয়। সার্ভে করার জিনিসপত্র, কুলিদের হাতিয়ার,

আমাদের বাক্স-বিছানা, সবার জন্য রসদপত্র আর কুলিরা যাবে বলে এবার জিপের সঙ্গে একটা লরিও যাচ্ছে। কুলিদের মধ্যে কিছু আগে চলে গিয়েছে, কিছু পথে একটা গ্রাম থেকে উঠবে। লরি এর মধ্যেই এসে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ডহরু আর হলধর মিলে মালপত্র তুলছে। বেশ একটা সাজো সাজো ভাব।

স্নান সেরে বারান্দায় এসে দেখি মেজকর্তা আর সার্ভেয়ার সাহেবও তৈরি। ডহরু পুরি আর আলুর তরকারির থালা এনে টেবিলে রাখছে। আমাকে দেখে মেজকর্তা বললেন — আসুন, বসে যান। একেবারে হাতে-গরম পুরি। এই তো অসিতবাবুও এসে গিয়েছেন–

সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। কাঁটায় কাঁটায় আটটায় রওনা হওয়া গেল।

জিপ আগে চলেছে, পেছনে লরির। কারণ লরি আগে গেলে যে পরিমাণ লাল ধুলো উড়বে, তাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, জামাকাপড়ের কথা বাদই দিলাম।

অসিত বিশ্বাস বললেন—যেখানে আমরা যাচ্ছি, সেই

রামরেখা জায়গাটা বিহার, উড়িষ্যা আর মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত ছুঁয়ে আছে। একটা ঝরণা আছে খুব সুন্দর, অবশ্য এখন তাতে কতটা জল আছে জানি না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে জঙ্গলে ঘুরবেন, ভাল লাগবে।

রাস্তা কখনো উঠছে, কখনো নামছে। এক জায়গায় একটা তিনমাথার মোড়, আমরা সোজা চললাম। বিশ্বাসবাবু বললেন—বাঁদিকের পথটা গিয়েছে ছিন্দা নদীর ধারে কোঘাঘ নামে একটা জায়গায়। ছোট্ট নদী, কিন্তু বর্ষায় তার ভয়ঙ্কর রূপ হয়। পাহাড়ে বৃষ্টি হলে নদীতে ফ্ল্যাশ ফ্লাড আসে। নিয়ে যাব এখন আপনাকে একদিন।

—আর ডানদিকের পথ কোথায় গেল?

-ওটা আবার ঘুরে শহর ছাড়িয়ে কোলেবিরার কাছে রাঁচি যাবার পাকা রাস্তায় পড়েছে। কোলেবিরা থেকে আপনি গুগুমলা, লোহারডাগা হয়ে রাঁচি যেতে পারেন, কিম্বা খুঁটি হয়েও যেতে পারেন। তবে খুঁটিত হয়ে গেলে রাস্তা অনেকটা কম পড়লেও ওদিকে আজকাল নানা গোলমাল চলছে বলে সবাই ঘুরপথেই রাঁচি যায়।

—কী গোলমাল?

—ওদিকে মুন্ডারা বিদ্রোহ করেছে। বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে তারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পরিবেশ ঠাণ্ডা থাকলে ওই পথে আপনাকে কোয়েল নদী দেখিয়ে আনতাম।

মাইল দশ-বারো গিয়ে সাম পাহাড়টোলি নামের একটা গ্রামে জিপ আর লরি থামল। এখান থেকে কুলিরা উঠবে। জলধর পথের পাশের গ্রাম থেকে তাদের ডেকে আনতে গেল।

আমি জিপের পেছন দিয়ে নেমে হালকা হবার জন্য পথ থেকে জঙ্গলে ঢুকলাম। বিশ্বাসবাবু ডেকে বললেন—কোথায় চললেন, ও মশাই?

পেছন ফিরে হেসে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা দেখালাম।

কয়েক পা হেঁটেই চোখে পড়ল একটা শালগাছের গোড়ায় পড়ে থাকা দুটো মরা ঘুঘু।

চতুর্দশ

সকালের আলো হঠাৎ যেন নিভে এল

সকালের আলো হঠাৎ যেন নিভে এল চারপাশে। নতুন কাজে নতুন জায়গায় যাচ্ছি, মনে কত আনন্দ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। মনের ভেতরে একটা খোলা ছাতা কে যেন স্প্রিং টিপে বন্ধ করে দিল। ফাদার ও ব্রায়েনের আশঙ্কাই কি তাহলে সত্যি? অমঙ্গলজনক কিছু ঘটতে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে?

ফিরে এসে নিজে উঠে বসলাম। কুলিরাও উঠছে লরিতে। অসিতবাবু যেন কেমনভাবে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। ভেতরের অশান্তি বোধহয় মুখেও ফুটে উঠেছে

কিছুটা। কিন্তু উনি বুদ্ধিমান মানুষ, সকলের সামনে কোনও প্রশ্ন করলেন না। বাকি পথ পার হতে লাগল গাড়ি।

মানুষের মন বিষণ্ণ হয়ে থাকতে ভালবাসে না। দুঃসময় কাটিয়ে ওঠার জন্য মনের একটা নিজস্ব স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি আছে। প্রকৃতির যে আশ্চর্য সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখতে দেখতে চলেছি তা অচিরেই আশঙ্কার মেঘ কাটিয়ে স্নিগ্ধ প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনল। একটা মজার ঘটনাও ঘটল প্রায় তক্ষুণি।

দু’দিকে ঘন বন, তবে ঝোপঝাড় কম, বড় বড় গাছই বেশি। মাঝখান দিয়ে মোরাম ছাওয়া লাল রাস্তা বেয়ে গাড়ি চলেছে। হঠাৎ ডানদিকের ঢালু জমি থেকে বড় বড় গাছের ফঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা বিশাল হরিণ। আকারে মোষের বাচ্চার চেয়েও বড়। মাথার দু’দিক দিয়ে শাখা-প্রশাখাওয়ালা গাছের মত শিং উঠেছে। হরিণটা বোধহয় ঢালু জমি বেয়ে দ্রুত নেমে আসছিল, যখন জিপটা দেখতে পেল তখন তার আর গতি সংযত করবার উপায় নেই—হুড়মুড় করে রাস্তায় এসে উঠল। ড্রাইভার ব্রেক কষল প্রাণপণে, খানিকটা চাকা ঘষটে থামল গাড়ি। আমরা হুমড়ি খেয়ে এ ওর গায়ে পড়লাম। মেজকর্তার কপাল ঠুকে গেল উইন্ডস্ক্রিনে।

জলধর পণ্ডা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল-বড়শিঙা। বড়শিঙা।

বড়শিঙা হরিণের নাম শুনেছি, ছোটবেলায় পড়েছি শিকারের গল্পে। এই তাহলে সেই।

হরিণটা মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়ে পথের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকিয়ে আছে আমাদের জিপের দিকে। কী সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে সকালের রোদ্দুরে! যেন জীবন্ত প্রাণী নয়, যেন অরণ্যের পটভূমিতে আঁকা একখানা ছবি।

তারপরেই হরিণটা সম্বিৎ পেয়ে তড়বড় করে দৌড়ে বাঁদিকের জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। গাছের গুঁড়ির ফাঁকে তার বাদামি চামড়া আর সাদা ফুটকি চমকে উঠল।

জিপ চলতে শুরু করল আবার। অসিতবাবু বললেন– বড়শিঙা দেখতে পাওয়া খুব ভাগ্যের ব্যাপার। এই প্রাণীরা এত লাজুক যে, মানুষের সাড়া পেলে একেবারে দৌড়ে পালিয়ে যায়। শিং দেখেছেন। যেন ডালপালাওয়ালা একখানা পুরো ঝোপ।

আরও মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাদে রামরেখা পৌঁছলাম। যেখানে আমাদের থাকবার তাবু পড়েছে সে পর্যন্ত জিপ বা লরি যাবে না। প্রায় সিকি মাইল দূরে পথের ধারে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম।

কী নিবিড় অরণ্য! আমি কলকাতার অফিসে চাকরি করা নিরীহ মেসপোষ্য জীব, জঙ্গল বলতে দেখেছি শিবপুরের বোট্যানিক্যাল গার্ডেন। এখানে গম্ভীর চেহারার বড় বড় গাছ, নিচে পুটুস, বনতুলসী আর নানারকম উদ্ভিদের ঝোপ। অসিতবাবু আর আমার। একই তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। নিজেদের জিনিসপত্র তাঁবুতে রেখে বেরিয়ে এসে দেখি সামনের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা উঠোনমত জায়গায় মেজকর্তা আর নির্মলবাবু মাটিতে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। আমাদের দেখে মেজকর্তা বললেন—আসুন, বসে পড়ুন এখানে। ডহরু, এঁদের চা দাও–

অর্থ এবং বড় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ক্ষমতা তাক লাগিয়ে দেবার মত। এই পাণ্ডববর্জিত অরণ্যের নিভৃতে দু'দিনে গড়ে তোলা হয়েছে মানুষের থাকবার ব্যবস্থা। এসে পৌঁছবার পনেরো মিনিটের ভেতর হাতে চলে আসছে গরম চায়ের কাপ। কাপ বললে অবশ্য ভুল হবে, আমাদের চা

দেওয়া হয়েছে এনামেলের হাতলওয়ালা ছোট মগে। অরণ্যনিবাসে এটাই প্রশস্ত, নইলে চিনেমাটির কাপ দিনে একজন করে রোজ ভাঙবে। কিছুদিন আগে কলকাতায় ‘কিং সলোমনস্ মাইনস্ নামে রাইডার হ্যাগার্ডের সেই বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার গল্পের ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলাম মেট্রো সিনেমায়। তাতে দেখেছিলাম গল্পের নায়ক অ্যালান কোয়াটার মেইন এইরকম এনামেলের মগে চা খাচ্ছে। এখন নিজেকে অনেকটা সেইরকম লাগতে লাগল।

মেজকর্তা বললেন–নির্মলবাবু, আজ আপনার সার্ভে করার জিনিসপত্র সব বের করে গুছিয়ে রাখুন, কাল সকাল থেকে পুরো অঞ্চলের একটা খসড়া ম্যাপ বানাবার কাজ শুরু করে দিন। দক্ষ সহকারী পাবেন না, তবে জলধর আপনার সঙ্গে পিনম্যানের কাজ করতে পারবে, চেন ধরতে পারবে। আর আয়না চমকাবার জন্য একজন কুলি দেব, মালপত্রও সে-ই বইবে।

অসিতবাবু একটু অবাক গলায় বললেন-আয়না চমকানোটা কী জিনিস? সার্ভেয়ার নির্মলবাবু হেসে বললেন-ওটা আমাদের জরিপের একটা নিজস্ব চালু শব্দ। সব পেশাতেই এমন কিছু শব্দ থাকে। দূরবীন পেতে লুক থ্রু

করলেও ঠিক সোজা লাইন সবসময় পাওয়া যায় না, বিশেষ করে জঙ্গলের ভেতর। তখন কেউ একজন দুই বা তিন চেন দূরে মাটিতে দাঁড়িয়ে কিংবা গাছের ওপর উঠে ছোট আয়না হাতে নিয়ে সেটাতে রোদ্দুর প্রতিফলিত করে দেখায়, তাতে কাজের সুবিধে হয়।

কী-একটা পাখি ডাকছে কোথায় বসে। অদ্ভুত ডাকটা। জলধর পণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল—ও তো হরটি পাখি। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খুব ডাকে, বিকেলের দিকে চুপ করে যায়। এ জঙ্গলে খুব পাখি আছে বাবু, কত ডাক শুনবেন–

এই পাখির ডাক থেমে যাওয়াটাই আসন্ন বিপদের প্রথম লক্ষণ হয়ে দেখা দিল। চা খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটু ঘুরতে বেরুলাম একা। মেজকর্তা আর নির্মলবাবু মাপজোক শুরু করার উদ্যোগের জন্য রয়ে গেলেন। অসিতবাবু আবার নিয়মিত ডায়েরি লেখেন, তিনি বর্তমান ভ্রমণের ঘটনাটা শুরু করার জন্য সঙ্গে আসতে চাইলেন না। জলধর বলল–একাই বেড়িয়ে আসুন বাবু। এ জঙ্গলের খুব বড় জানোয়ার কিছু নেই। ব্রাহ্মণী নদীর ধারের বন থেকে মাঝে মধ্যে দু-একটা হাতি ছিটকে আসে বটে, কিন্তু সে হল বনে আগুন লেগে

ওদের খাবারে টান পড়লে। যান বাবু–

আজ বিকেল অবধি আমার খুব কাজ নেই। সন্ধেবেলা থেকে সারাদিনের হিসেবনিকেশ নিয়ে বসতে হবে। ফলে হালকা মনে বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

সম্পূর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল। পথ বলে তেমন কিছু নেই, ইদানীং কয়েকদিন কুলিদের যাতায়াতে কোথাও কোথাও আবছা পথরেখা তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য না করলে তা বুঝতে পারা যায় না। ঝোপঝাড়ে ঢাকা উঁচু-নিচু জমি, এখানে ওখানে বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে, তাদের কোনও কোনওটার গায়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল বনস্পতি আষ্টেপৃষ্টে শেকড় জড়িয়েছে। মনে হয় সৃষ্টির আদিকাল থেকে এগুলো এখানে পড়ে আছে। এরই একটাতে হেলান দিয়ে বসলাম পা ছড়িয়ে। মাথার ওপরে পত্রপল্লবের চন্দ্রাতপ, সুন্দর ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা পরিবেশ। পকেট থেকে একটা ক্যাভেন্ডার্স বের করে ধরালাম। ভাবতে মাঝে মাঝে অবাক লাগছিল। সত্যিই কি আমি—সেই কলকাতার এঁদো গলির মেসে বাস করা আমি—বিহার আর ওড়িশার প্রান্তবর্তী নিবিড় অরণ্যে বসে মৌজ করে সিগারেট খাচ্ছি? কত অদ্ভুত ঘটনাই মানুষের কপালে লেখা থাকে।

আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে পনেরো কী কুড়ি হাত দূরে সাদা গুড়িওয়ালা বিশাল একটা গাছ দাঁড়িয়ে। কী গাছ তা ঠিক চিনতে পারলাম না। গাছের গোড়ায় হাতির মত অতিকায় একখানা পাথর পড়ে। তার ওধারে বোধহয় কয়েকজন কুলি কাজ করতে করতে মৃদুস্বরে গান গাইছে। সম্ভবত মুণ্ডারি ভাষা, গানের কথা কিছুই ধরতে পারলাম না। কিন্তু সুরটা ভারি আশ্চর্য স্বপ্নময়, শুনলে কী যেন একটা কথা মনে পড়ে যায়। আর–

আর কেমন যেন একটু গা ছমছম করে।

এরকম অদ্ভুত সুর কোথা থেকে পেল বনচারী আদিবাসীরা? যেন পড়ন্ত বেলায় পশ্চিম আকাশে মেঘের গায়ে বদলে বদলে যাওয়া রঙের প্রতিফলন সুর হয়ে ফুটে উঠেছে, যেন কতদিন আগে ভোরবেলার স্বপ্নে এই সুরটা আমি কাকে বাঁশিতে বাজাতে শুনেছি।

যারা গান গাইছিল তারা গান গাইতে গাইতেই দূরে চলে যাচ্ছে।

চারদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ আমার মনে হল—আশ্চর্য তো, আচমকা সমস্ত শব্দ একসঙ্গে। থেমে গেল কী করে? এই তো কিছুক্ষণ আগেও কতরকম পাখি ডাকছিল, তারাই বা চুপ। করে গেল কেন? আমার একটা সিগারেট খেতে যতক্ষণ সময় লেগেছে তারই ভেতর ঘটেছে পরিবর্তনটা। বাতাসও যেন থেমে গিয়েছে। ঝড় আসার আগে প্রকৃতি এইরকম নিঃঝুম আর শান্ত হয়ে যায়। অবশ্য ঝকঝকে সূর্যের আলোয় দিনদুপুরে নিশ্চয়ই ঝড় আসবে না। হয়তো সবটাই আমার মনের বিভ্রম, হয়তো অরণ্যে মাঝে মাঝে এমন অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা নামে।

যাই হোক, এরপর আর বেশিক্ষণ সেখানে বসে থাকতে ভাল লাগল না। তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি উঠোনমত জায়গাটায় ফোল্ডিং টেবিল পেতে তার ওপর কনটুর ম্যাপ রেখে জোর আলোচনা চলেছে। পাশে দাঁড়িয়ে জলধর পণ্ডা কোনদিক দিয়ে কাজ আরম্ভ করলে ভাল হয়, কোথা দিয়ে কোথায় যাওয়া চলে—এসব বুঝিয়ে দিচ্ছে। অসিতবাবু তাঁবুর ভেতরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে লিখছেন। আমাকে দেখে একটু হাসলেন।

দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা হল বাইরে খোলা জায়গায়।

মাটিতে বসে শালপাতায় খাওয়া, বেশ বনভোজনের মত ব্যাপার। কিন্তু এখানেও পাখি ডাকছে না, সমস্ত অঞ্চলটাতেই অদ্ভুত শ্বাসরোধী ঘেরাটোপ নামছে যেন। মেজকর্তা আর নির্মলবাবুও কিছু একটা আন্দাজ করেছেন, খেতে খেতে তারাও কেমন একটু অবাক হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন। ভাল কাণ্ড! 'পাখি'রা সব গেল কোথায়? জঙ্গলে এমনিতেই পরিবেশ স্তব্ধ, কিন্তু শুধু পাখি না ডাকলে সে স্তব্ধতা যে কতখানি প্রকট হয়ে ওঠে তা বুঝলাম।

তবে আমাদের পাচকের রান্না খুব সুন্দর। গরম খিচুড়ি, সোনামুগ ডালের গন্ধ ভুরভুর করছে। তার সঙ্গে উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি, মুচমুচে করে ভাজা বেগুনি আর ডিমের অমলেট। লরিযাত্রা এবং জঙ্গলে বেড়ানোর শ্রমে দারুণ খিদে পেয়ে গিয়েছিল, অমৃততুল্য খাদ্য ভক্ষণ করতে করতে অন্যদিকে মন দেবার সুযোগ ছিল না।

খাওয়ার পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে কর্তারা আবার কাজে বসে গেলেন। অসিতবাবুর ডায়েরি লেখা বাকি ছিল, তিনি ফের লেখা শুরু করলেন। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে পায়চারি করতে লাগলাম। ওপাশে তাঁবুগুলোর পেছনে মাটিতে গর্ত করে উনুন বানিয়ে

কুলিরা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করেছিল। তারা এখন দলবেঁধে খেতে বসেছে। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থমকে থেমে গেলাম।

কী সুর গাইছি আমি? এ তো বনের ভেতর বড় পাথরটার ওপাশ থেকে ভেসে আসা সেই অদ্ভুত গান! কখন এ গান শিখলাম আমি? জীবনে গান শিখিনি, তাহলে এই জটিল আর কঠিন সুর গলায় এল কি ভাবে? তাছাড়া মাত্র একবার শুনে কোনও সুর শেখা যায় নাকি? থমকেই রইলাম।

ওপাশে কুলিদের কোলাহল হঠাৎ থেমে গিয়েছে। ওরাই বা চুপ করে গেল কেন? না, একেবারে চুপ করে গিয়েছে, এমন নয়, ওই তো কয়েকজন জলধরকে উত্তেজিত গলায় কী যেন বোঝাচ্ছে। কী বলছে ওরা?

মেজকর্তা একটু বিরক্ত হয়ে ডাকলেন—জলধর! কী হয়েছে? কী বলছে ওরা?

জলধর ডাক শুনে এগিয়ে এসে বলল—কিছু না আঁইজ্ঞা, ওরা সব জংলি লোক, কী জন্য যেন ভয় পেয়েছে। আমি কথা

বলে সব ঠিক করে দিচ্ছি—

মেজকর্তা বললেন-ভয় পেয়েছে? ডাকো তো ওদের–

আমাদের কথাবার্তা শুনে অসিতবাবুও তাবু থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তার মুখে। সপ্রশ্ন বিস্ময়। জলধর তিন-চারজন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। কুলিদের। মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, তাদের চেহারায় ভয়ের চিহ্ন। মেজকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে তোমাদের? কী বলছিলে জলধরকে?

কুলিদের মধ্যে নেতাগোছের লোকটি দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল। মেজকর্তা

বললেন—-ও কী বলছে জলধর?

জলধর বলল—ও বলছে এখানে পাসাং মারার ডাক শোনা গিয়েছে, এখানে কোম্পানি কাজ করতে পারবে না।

—পাসাং মারা আবার কী? কীভাবে কখন সে ডাকল?

জলধর প্রশ্নটা কুলি সর্দারকে বুঝিয়ে দিতে সে আবার দ্রুতবেগে ঝড়ের মত কী বলে গেল। জলধর এদিকে ফিরে বলল—ও বলচে পাসাং মারা খুব খারাপ অপদেবতা, জঙ্গলের মধ্যে যেখানে সে থাকে সেখানে বাইরের কাউকে সে ঢুকতে দেয় না। অমঙ্গল আর মৃত্যুর সুরে সে গান গায়। একটু আগে নাকি এখানে কেউ সেই সুরটা গাইছিল। তাই ওরা ভয় পেয়েছে—

মেজকর্তা অবাক হয়ে বললেন—এখানে? এখানে কেউ গান গাইছিল বটে। কে সে?

গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম—আমি একটা সুর ভাঁজছিলাম ঠিকই, সেটাই হয়তো ওরা শুনতে পেয়েছে। সুরটা সত্যিই একটু কেমন অদ্ভুত মত-

—কেমন সুর সেটা? কোথা থেকে শিখলেন?

—শিখিনি কোথাও। সেটাই মজা। খাওয়ার আগে জঙ্গলের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে একটু পাথরের ওপাশে কুলিরা গাইছিল শুনছিলাম। কী করে যেন একবার শুনেই সুরটা মনে থেকে গিয়েছে।

—কোথায় শুনেছেন? কোনদিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন?

আমি আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বললাম—ওইদিকে।

জলধর বলল—কিন্তু ওদিকে তো আজ কুলিরা কাজ করেনি।

তার দিকে তাকিয়ে বললাম—তা জানি না, কিন্তু গান আমি স্পষ্ট শুনেছি। হয়ত দু-একজন কুলি এমনি গিয়ে পড়েছিল।

জলধর কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে মেজকর্তা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—বেশ, বেশ, ঠিক আছে। ওদের ভয় পেতে বারণ কর। আমি নিজে দেখছি ব্যাপারটা–

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—চলুন তো, কোথায় গান শুনেছিলেন সে জায়গাটা একবার দেখে আসি। জলধর সঙ্গে এসো, নির্মলবাবু আর অসিতবাবুও আসুন। জলধর, তুমি কুলিদের সঙ্গে আসতে বারণ কর। ওরা ভয় পেলে কাজ চালানো মুশকিল। হবে।

অরণ্যে নির্দিষ্ট কোনও পথরেখা নেই তা আগেই বলেছি। এখন আন্দাজে আন্দাজে ওঁদের নিয়ে চললাম। মিনিট সাতেক হেঁটে চিনতে পারলাম জায়গাটা। হ্যাঁ, এই তো এই। পাথরটায় হেলান দিয়ে আমি বসেছিলাম। কিন্তু সামনের সেই বড় গাছটা কই? হাতির আকারের বিশাল পাথরটাই বা গেল কোথায়?

আমার মুখের ভাব দেখে মেজকর্তা বললেন-কী হল আপনার?

বললাম-—এই পাথরটায় হেলান দিয়ে বসেছিলাম তখন। কিন্তু সামনে ওই জায়গাটায় একটা বড় পাথর আর একটা বড় গাছ ছিল, সেদুটো দেখছি না। তারই ওপাশ থেকে গান ভেসে আসছিল। ভেবেছিলাম কুলিরা গাইছে বুঝি-

জলধর বলল-না, এদিকে কুলিরা আজ কাজ করেনি।

নির্মলবাবু বললেন-কিন্তু গাছ বা পাথরের কী হল?

মেজকর্তা বললেন—আসুন তো দেখি-

নাঃ, জায়গাটায় কোনওকালে একটা গাছ দাঁড়িয়ে ছিল এমন মনে হল না। কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমাদের সকলেরই বুক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

সেখানকার মাটিতে চওড়া, গভীর একটা দাগ। যেন খুব ভারি কোনও জিনিস সেখান দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মেজকর্তা কিছুক্ষণই সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন— চলুন তো, এ দাগটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দেখি—

বেশিদূর যেতে হল না। দশ-বারো গজ দূরে জঙ্গলের আড়ালে পড়ে রয়েছে বিশাল পাথরটা। যেন এখানেই পড়ে আছে আদিকাল থেকে। [আমার মনের ভেতর অমঙ্গলের বিষাণ বাজছে। ভাল নয়, ভালো নয়, এ জায়গা ভাল নয়। মনে মনেই ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম, প্রার্থনা করলাম যেন বিপদ কেটে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নেমে আসে। বিশ্বাস, প্রার্থনা আর আশীর্বাদের মূল্য সম্বন্ধে তারানাথের কাছে শোনা তার প্রথম জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তার সঙ্গে আলাপের। প্রথম দিকে শোনা গল্পটা। বেশ কিছুদিন আগে শুনেছিলাম বটে, কিন্তু হঠাৎই তার সব খুঁটিনাটি মনে ভেসে

উঠল। যেন ছবির মত দেখছি সব।

পঞ্চদশ

প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ

প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করার যেমন অনেক আশঙ্কার দিক আছে, তেমনি আবার কিছু মজার ব্যাপারও আছে। রথের দিন আমাদের অফিসে ছুটি থাকে না। কিন্তু সে বছর হঠাৎ রথে একটা হাফ-ছুটি পাওয়া গেল। কলকাতা অফিসের বড়কর্তা বাঙালী, সকালে অফিস গিয়েই শুনলাম তিনি নোটিশ জারি করেছেন আজ দুপুর দুটোয় ছুটি। যদি কেউ ইচ্ছে করে সে মেলা দেখতে যেতে পারে। মেলা দেখার উৎসাহ থাক বা না থাক, দেওয়ালের ঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা বাজামাত্র বেরিয়ে পড়লাম।

ছোটবেলায় সবার মুখে শুনতাম প্রতিবছর রথের দিন

বৃষ্টি হবেই। আজকে সকাল থেকে আকাশ মেঘলা ছিল, এখন অফিস থেকে বেরুনো মাত্র গুঁড়ি গুড়ি ছাগল তাড়ানো বৃষ্টি শুরু হল। এই আসে এই যায়। মনের আনন্দে ছাতা খুলে শেয়ালদার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। মেলাটা একবার ঢু মেরে তারপর মন্টু লেনে তারানাথের বাড়ি যাব গল্প শুনতে।

পর্বদিনে ছেলেবুড়ো সবার মনেই বোধহয় উৎসবের রঙ লাগে। দেখলাম বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে মানুষের ঢল নেমেছে মেলাতলায়। ভিড়ের চোটে গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। কেবল হাসপাতালের গাড়ি চলাচলের জন্য ক্যাম্বেল স্কুলের সামনে একটুখানি ফাঁক। খানিকক্ষণ ধরে ফুল-ফল-নারকেলের চারা, মাটির পুতুল, রঙিন কাচের চুড়ির দোকানে অল্পবয়েসী মেয়েদের ভিড়, পি-পি বাঁশি এসব দেখে বেড়ালাম। তবু বাল্যের সেই আনন্দ আর কই? সে ছিল স্নিগ্ধ শ্যামছায়াচ্ছন্ন পরিচিত গ্রাম, আর এ হল ইট-কাঠ-পাথরের অচেনা শহর। ঠোঙায় করে কিছু ফুলুরি আর গরম ভাজা জিলিপি নিয়ে হাইকোর্টমুখো ট্রামে উঠে পড়লাম। মন্টু লেনের মুখে যখন নামলাম তখনও বৃষ্টি পড়ছেই। হন্ হন্ করে হেঁটে তারানাথের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে স্বয়ং তারানাথের গলা—আসছি হে, দাঁড়াও একটু–

ভেজা জুতো আর ছাতা বারান্দার কোণে রেখে আড্ডাঘরের পরিচিত চৌকিতে বসে বললাম—নিন, এতে তেলেভাজা আর জিলিপি আছে। চা বলুন একবার-

ঠোঙাটা হাতে নিয়ে তারানাথ বলল—বাঃ, এ যে দেখছি এখনো গরম! চা কিন্তু ঠিক। দশ মিনিট পরে বলব। কিশোরী এসে পড়ুক, একসঙ্গে খাব—

অবাক হয়ে বললাম—কিশোরী আসছে নাকি? আপনি কী করে—

তারানাথ হাসল, বলল—এখুনি আসবে। আর সাড়ে আট মিনিট-

এক প্যাকেট পাসিং শো এনেছিলাম। প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে তার থেকে একখানা বের করে ধরালো তারানাথ। বাড়িতে সাধারণতঃ হুঁকো খায়, কিন্তু পাসিং শো ব্র্যাণ্ডটা তার খুব প্রিয়। তার কাছে গল্প শুনতে যাবার সময় আমি আর কিশোরী মন্টু লেনের মোড় থেকে দশ পয়সা দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে যাই। প্রতিবারই তারানাথ সস্নেহে স্বচ্ছ মোড়ওয়ালা চিমনির মত টুপিপরা ধূমপানরত

সাহেবের ছবিসুদ্ধ কালচে লালরঙের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ, এই হচ্ছে সিগারেট। নেশার আসল কথা হচ্ছে মৌজ, ছবির সাহেব কেমন মৌজ করে গোল গোল রিং ছাড়ছে দেখেছ?

সাড়ে-আট মিনিট শেষ। বাইরে ঝপ করে ছাতা বন্ধ করার আওয়াজ, তারপরই কিশোরীর গলা-চক্কোত্তিমশাই আছেন নাকি? আমি কিশোরী–

তারানাথ আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর উঁচুগলায় বলল—এসো হে, ভেতরে এসো।

কিশোরী সেন ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে বিশেষ একটা অবাক হল না। আসলে হঠাৎ কোনো কারণে কাজের থেকে একটু অবসর পেলে তারানাথের বাড়ি আড্ডা দিতে আসা আমাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বয়েসে অন্ততঃ কুড়ি বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও তারানাথ আমাদের সঙ্গে সমবয়েসী বন্ধুর মতই আচরণ করে। সাধু-সন্ন্যাসী এবং অদ্ভুতকর্মা মানুষ দেখার শখ আমার চিরদিনের। কয়েকবছর আগে কিশোরী সেনই আমাকে তারানাথের কাছে নিয়ে এসেছিল, বলেছিল—চল, একজন ভাল তান্ত্রিক জ্যোতিষীর সঙ্গে তোমার আলাপ

করিয়ে দিই। মুখের দিকে তাকিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দেয়।

কৌতূহলী হয়ে কিশোরীর সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমার সম্বন্ধে অদ্ভুত কিছু কথা বলে। তারানাথ আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। এমন সব কথা, যা আমি ছাড়া কারো জানবার। সম্ভাবনা নেই। আর আকর্ষণ করেছিল তার গল্প। যৌবনে সে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, হাটে মাঠে গাছতলায় শ্মশানে কাটিয়েছে, শবসাধনা করেছে। তার গল্প বলার ক্ষমতাও ভারি সুন্দর। এ ক্ষমতা সবার থাকে না। কেউ কেউ বলার মত গল্পও বাচনভঙ্গির দোষে নষ্ট করে ফেলে, আর তারানাথ নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনা বলার গুণে চিত্তাকর্ষক করে তোলে। কত আশ্চর্য ঘটনা শুনেছি তার কাছে, সে-সবের সঙ্গে আমাদের ডাল-ভাত খাওয়া মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক শান্ত জীবনধারার কোনো সম্পর্ক নেই। বীরভূমের গ্রাম্য শ্মশানে হকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ মাতু পাগলীর কাহিনী, বরাকর নদীর বালুকাময় তীরে শালবনের পাশে শুক্লা পঞ্চমীর স্বপ্নিল জ্যোৎস্নায় মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব, শ্বেতবগলার পুজো–আরো কত কী!

আমরা বলতাম—বাব্বাঃ, এতও ঘটেছে আপনার জীবনে!

তারানাথ হেসে বলত—হবে না! আমার জন্মের সময় আকাশে নীলরঙের উল্কা দেখা গিয়েছিল। আমার তদীক্ষা হয়েছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়-

কিশোরী গুছিয়ে বসতে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমিও হঠাৎ এলে যে, কী ব্যাপার!

কিশোরী বলল—আজ দুপুরে সেকশন অফিসার ভবানীপুরের দিকে একটা কাজ দিয়ে বললেন—এটা সেরে ওখান থেকেই বাড়ি চলে যাবেন বরং, আর অফিসে ফিরতে হবে না। তা সে কাজ আধঘণ্টাতেই হয়ে গেল। ট্রামে করে ধর্মতলা এসে নামতেই তোমার অফিসের রমেশ মিত্তিরের সঙ্গে দেখা। তার কাছে শুনলাম তোমাদের আজ হাফ ছুটি হয়ে গিয়েছে। রথের দিন, মেঘলা আকাশ, তারপর আবার হাফ ছুটি—মনে হল তুমি নিশ্চয় এখানে এসে জমবে। তাই চলে এলাম। এই নিন-

পকেট থেকে একটা পাসিং শো-র প্যাকেট বের করে কিশোরী তারানাথের দিকে বাড়িয়ে ধরল। তারানাথ হেসে বলল—ভাল, ভাগ্যিস গলির মুখে তোমাদের দেখা হয়ে।

যায়নি! এ আমার কাল পর্যন্ত চলবে–

বললাম—কিন্তু আপনি জানলেন কী করে যে কিশোরী আসছে?

কিশোরী আমার দিকে তাকিয়ে বলল-তাই নাকি? উনি বলেছিলেন আমি আসছি?

-হ্যাঁ, বললেন দশ মিনিটের মধ্যে তুমি আসবে, তারপর চা করতে বলবেন।

তারানাথ মিটিমিটি হেসে চলেছে, যেন কিশোরীর আগমনসংবাদ সে কী করে আগে থেকে জানতে পারল তার ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন সে বোধ করে না। আমরাও জোর করলাম না, কিছু কিছু জিনিস রহস্যের আবরণে ঢাকা থাকাই ভাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে তারানাথ বলল—তোমরা জিজ্ঞাসা করলে না বটে, কিন্তু মনে কৌতূহল নিশ্চয় হচ্ছে—তাই না? আসলে কী জানো, আমিও জানি না কী করে আমি বুঝতে পারি। কিছুটা সাধনায়, কিছুটা

মধুসুন্দরী দেবীর বরে এই ক্ষমতাটা আমি পেয়েছি। হঠাৎ হঠাৎ মনে কোনো কথা ভেসে ওঠে, পরে সেগুলো মিলে যায়। যেমন কিশোরী, তোমার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে তুমি গতকাল কোথাও থেকে কিছু টাকা—এই গোটা পঞ্চাশেক-মুফতে পেয়ে গিয়েছ। ঠিক?

কিশোরীর চোখ গোলগোল হয়ে গেল। সে বলল—সত্যি, আপনাকে যত দেখছি ততই বিস্ময় বাড়ছে। গতকাল অফিসের ঠিকানায় হঠাৎ পঞ্চাশ টাকার একটা মানি অর্ডার এসে হাজির। কী ব্যাপার-না, দেশের বাড়ির আমবাগানের ইজারার টাকা থেকে আমার ভাগের অংশ জ্যাঠামশাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। কুপনে লেখা—টাকাটা তিনি বাবাকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবা নাকি বলেছেন টাকাটা কলকাতায় আমাকেই পাঠিয়ে দিতে। একা মেসে থাকি, কতরকম দরকার হতে পারে। আশ্চর্য, কত টাকা তাও তো প্রায় ঠিক বলে দিলেন! ধন্য আপনাকে! তা আজকে রথের দিনটা, এমন বাদলা করেছে, আজ একটা ভাল গল্প হবে না?

একটা ফুলুরিতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে কামড় দিয়ে তারানাথ বলল-গল্প নয়, গল্প নয়, আমার কাছে সব সত্যি কথা। মধুসুন্দরী দেবীর কথা বলতে গিয়ে একটা ব্যাপার মনে

পড়ে গেল। দেবী বলেছিলেন আমি বড়লোক হতে পারব না বটে, কিন্তু অর্থের অভাবে আমাকে কখনো নিদারুণ সঙ্কটে পড়তে হবে না। এই প্রসঙ্গেই একটা ঘটনার কথা তোমাদের বলি।

বরাকর নদীর ধারে মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাবের পর সেখানেই শালবনের মধ্যে আস্তানা বানিয়ে বেশ কিছুদিন সাধনা করেছিলাম। সে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিন গিয়েছে। নিজের দিকে কোনো খেয়াল নেই, হয়ত পাঁচ-ছদিন স্নানই করি না, দাড়ি। কামাই না-রুক্ষ চুল বাতাসে ওড়ে। কাছাকাছি গ্রামগুলোতে ভিক্ষে করে খাই, আর অপেক্ষা করে থাকি কখন রাত হবে, কখন দেবী আসবেন। নদীর ধারের বালিতে মেশানো অভ্রের কুচি সদ্যোদিত চাঁদের আলোয় চকচক করে, মৃদুমন্দ হাওয়ায় নড়ে নদীতীরের অরণ্যের শাখা-প্রশাখা। তারপর বাড়ির লোক খবর পেয়ে এসে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, সাধনজীবনের শেষ হল না, কিন্তু ভবঘুরে জীবনের শেষ হয়ে গেল। বাড়ির লোক ধরে নিয়ে যাবার আগে শেষদিন যখন মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা হয়, সেদিন দেবী ওই বর আমাকে দিয়েছিলেন।

বাড়ির লোকেরা আমাকে সংসারে বাঁধবার জন্য আর

দেরি না করে ভাল মেয়ে দেখে। বিয়ে দিয়ে দিল। আমার তখন কেমন একটা বিহ্বল অবস্থা, যে যা বলে তাই করি, যা পাই তাই খাই, নিজের ইচ্চা বলে যেন কিছু নেই। দেবীকে হারিয়েছি, জীবনে অন্য নারীর আবির্ভাব ঘটলে তিনি আর দেখা দেবেন না। মনের সেই অবস্থায় কিছুতেই আর কিছু এসে যাবে না, কাজেই শূন্যমনে যন্ত্রচালিতের মত বিয়ে করলাম।

সময় একটু একটু করে সব দুঃখই লাঘব করে, বিয়ের পরে নববিবাহিতা স্ত্রীর সান্নিধ্য আমার একটা নতুন জীবন গড়ে তুলল। পেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, কাজেই আমি বৌকে। নিয়ে পৈতৃক ভিটে ছেড়ে কলকাতার উপকণ্ঠে একটা আধা শহর গোছের জায়গায় বাসা নিলাম। কিন্তু যে আশায় গিয়েছিলাম তা সফল হল না। পসার জমতে সময় লাগে। হাতদেখা আর কোষ্ঠী বিচার করা জ্যোতিষী বাজারে অনেক আছে, হঠাৎ মানুষ আমার কাছে। আসবেই বা কেন? একটা পনেরো সেরী ঘিয়ের খালি টিন বাজার থেকে কিনে কাটিয়ে পিটিয়ে বোর্ড বানালাম, তার ওপর আলকাতরা দিয়ে বিজ্ঞাপন লিখে টাঙালাম। তাও কেউ আসে না। বাড়ি থেকে পুঁজি যা এনেছিলাম তাই ভেঙে ভেঙে কিছুদিন চলল।

একদিন দুপুরে একজন মক্কেল এসে হাজির। খাওয়াদাওয়া সেরে বাইরের ঘরে বসে বৃহৎ পারাশরি হোরা খুলে একটু পড়াশুনো করছিলাম, হঠাৎ উঠোন থেকে কে ডাকল—এই যে! বাড়িতে কেউ আছেন নাকি?

কিছুটা বিরক্ত হয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। যা অবস্থা চলেছে, তাতে এ যদি মক্কেল হয় তাহলে একে আমার খুবই দরকার। কিন্তু সব কিছুরই তো একটা সময় অসময় আছে। আমি চিরকালই একটু আয়েসী মানুষ। পথেঘাটে খুব ঘুরে বেড়াতে পারি, এককালে যথেষ্ট ভবঘুরেমি করেছি, কিন্তু দুপুরবেলা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বিশ্রাম করছি, এমন সময়ে লোকজন এসে বিরক্ত করলে ভাল লাগে না। শাস্ত্রে বলে 'ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ'—অর্থাৎ আহারাদির পর হাত-পা ছড়িয়ে রাজার মত আচরণ করবে। এই শাস্ত্রবাক্যটি আমি মনোযোগ দিয়ে পালন করে থাকি। যাই হোক, দেখি লোকটা কী চায়!

বেরিয়ে যাকে দেখলাম সে একজন অদ্ভুতদর্শন মানুষ। রোগা সিড়িঙ্গে, ধুতিটা খাটো, কিন্তু পাঞ্জাবির লম্বা ঝুল হাঁটু ছাড়িয়ে নেমেছে। পাঞ্জাবির কাপড়টা ঝলঝলে সিলকের। চুপচুপে করে তেল দেওয়া কাঁধ পর্যন্ত পাট করা চুল। বিসদৃশ

লম্বাটে ঘোড়ামার্কা মুখ, এদিকে থুতনি প্রায় নেই বললেই চলে, যেন স্রষ্টা মুখখানা বানাবার সময় জায়গাটা থাবড়ে-থুবড়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। গায়ের রঙ ঘোর কালো, তার ওপর কপালে তেল-সিঁদুরের দীর্ঘ তিলক। আমাকে দেখে সে একগাল হাসল, বেরিয়ে পড়ল লম্বা লম্বা একসারি হলদে দাঁত।

দুপুরে বিশ্রামের সময় এমন চেহারা দেখলে প্রীতি জন্মায় না। বললাম-কী চাই?

এই যে সাইনবোর্ড ঝুলছে, তারানাথ জ্যোতিষার্ণব, আপনিই কি সেই?

—কেন, তাতে কী?

লোকটা বলল-আপনিই যদি তিনি হন, তাহলে একটু কথা বলতাম, এই আর কী–

—আমিই সেই। বলুন কী বলবেন—

লোকটা জিভ কেটে বলল—ছি! ছি! আমাকে 'আপনি'

বললে খুব লজ্জা পাচ্ছি। আপনি একে ইয়ে, তার ওপর ইয়ে —বলতে গেলে আমার ইয়ের মতন। একটু বসতে পাব কি?

বুঝলাম একে সহজে বিদায় করা যাবে না। দুপুরের বিশ্রামটুকু সত্যিই গেল। তবু হিন্দুর ছেলে, গৃহস্থ মানুষ, কেউ আতিথ্য চাইলে তাকে তো আর বিমুখ করতে পারি না। বিরসবদনে বললাম—এসো, ভেতরে এসো। বেশ, তুমিই বলব। তুমিও আমার ইয়ের মতন।

রসিকতাটা মাঠে মারা গেল। ধুলোমাখা চটি দরজার সামনে খুলে ঘোড়ামুখো অতিথি বৈঠকখানায় এসে জমিয়ে বসল। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার নামটি কী বাপু?

আবার একগাল হেসে ঘোড়ামুখো বলল—আজ্ঞে, আমার নাম হরকীর্তন সেন্নামৎ।

অবাক হয়ে বললাম—হর-?

-কীর্তন সেন্নাম। পদবীটা একটু অচেনা ঠেকছে, না? ওই আমরা কয়েকঘর মাত্র আছি সারা বাংলায়। একেবারে অধম নই আজ্ঞে, জল আচরণীয়-

-না, না, সেজন্য বলিনি। যাক, কী প্রয়োজনে এসেছ বল–

—আমি এই ও-পাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিলাম। কাজ সেরে ফেরার পথে আপনার সাইনবোর্ডটা নজরে পড়ল। আমার আবার এসব দিকে একটু চর্চা করার ঝোক আছে। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু দেখা করেই যাই। তা আপনি কী মতে ভাগ্য গণনা করেন? ওখানা কী বই? পারাশরি হোরা? পড়ছিলেন বুঝি?

বললাম—হোরাশাস্ত্র জান নাকি? পড়েছ?

হরকীর্তন হাসল, বলল—তা পড়েছি। তবে কী জানেন, ওসব কিছুই কিছু নয়, যে পারে সে এমনিতেই পারে, আপনি-আপনি। সবাইকে ঈশ্বর সে ক্ষমতা দেন না—

বাঃ, এ তো দেখি ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল। লোকটা একেবারে অপোগণ্ড নয়, জ্যোতিষের একেবারে মূল কথাটা অক্লেশে বলে দিয়েছে। বললাম—তা আমার কাছে সাইনবোর্ড দেখে ঢুকে পড়লে কেন? অদ্ভুত ক্ষমতা কিছু আছে কিনা

যাচাই করবার জন্য?

–না, তা নয়। সে তো আপনাকে দেখেই বুঝেছি। এলাম একটু আলাপ-সালাপ করতে। গুণী মানুষের সঙ্গ করলে পুণ্য হয়—

–আমাকে দেখে কী বুঝেছ? বল দেখি শুনি–

ভেবেছিলাম লোকটা দুটো মন-রাখা কথা বলবে, বা গদগদ প্রশংসা করে কিছু কাজ গোছানোর চেষ্টা করবে। একেবারে বিনা কারণে আজকাল কি কেউ কারো কাছে বসে সময় নষ্ট করে? এইবারে মন তুষ্ট করে তারপর ঝুলি থেকে বেড়াল বের করবে। কিন্তু হরকীর্তন সেন্নামৎ তা করল না, সে মুখ তুলে আমার দিকে সামান্য কয়েকমুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল—যেমন বুঝেছি আপনার জন্ম ভাদ্র মাসে, আপনি তন্ত্রমতে দীক্ষিত উচ্চশাখার ভূতডামর অবলম্বনে সাধনা করেছেন। আপনার তন্ত্রদীক্ষা হয়েছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময়—যা খুব সৌভাগ্য না থাকলে হয় না। কিন্তু কোনো। কারণে সিদ্ধিলাভের আগেই তন্ত্রসাধনা ত্যাগ করে আপনাকে সংসারজীবনে প্রবেশ করতে হয়েছিল। ঠিক বলছি?

বললাম—বলে যাও।

—কিন্তু সাধনা সমাপ্ত না হলেও আপনার জীবনে খুব অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে, অলৌকিক প্রত্যক্ষ কিম্বা তন্ত্রোক্ত দেব-দেবীদর্শন গোছের কিছু ঠিক ধরতে পারছি না—তবে ঘটেছে যে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। একটা কথা বলি, অপরাধ নেবেন না। আপনি খুব আনন্দে জীবন কাটাবেন, অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হবে আপনার, কিন্তু বৈষয়িক দিক দিয়ে যাকে কিছু করা বলে, সে আপনার হবে না—

এ আর নতুন কথা কী? বললাম—সে জানি জানি। কিন্তু তুমি কীভাবে বুঝলে?

হরকীর্তন বলল—জানি না। আপনাকে দেখে যা মনে হল তাই বললাম—

বললাম—যা বলেছ ঠিকই বলেছ। তোমার ভাগ্যবিচারের স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। দেখছি। এবার তোমাকে দেখে আমার যা মনে হচ্ছে একটু বলি?

হরকীর্তন বিনয়ে গলে গিয়ে বলল—আজ্ঞে, নিশ্চয়।

বলুন আপনি–

জন্ম দিয়েই শুরু করা যাক। তোমার জন্ম চৈত্রমাসে, দিনটাও বলে দিচ্ছি— রামনবমীতে তোমার জন্ম। ভাই-বোন যমজ হয়েছিলে, জন্মের পরই বোন মারা যায়। ঠিক?

—ঠিক। তারপর?

–লেখাপড়া বেশিদূর গড়ায় নি। ইস্কুলে পড়তে পড়তে সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গ করার দিকে ঝোক যায়। অনেক ঘুরে বেড়িয়েছ, কিন্তু দীক্ষা নাও নি–

হরকীর্তন বলল—ঠিকই বলেছেন। দীক্ষা নেবার উপযুক্ত গুরু পাইনি। সব ব্যাটা ভণ্ড, কেবল লোক ঠকিয়ে খাবার ধান্দা। কেবল এই এক আপনার কাছে বসে মনটা ভারি ভক্তিতে ভরে যাচ্ছে। আপনি দেবেন আমাকে দীক্ষা?

হেসে বললাম—দূর পাগল! আমিই নিজের সাধনা ঠিকমত করে উঠতে পারিনি, তোমাকে দীক্ষা দেব কী? তাছাড়া তোমার ওসবের প্রয়োজন নেই, এমনিতেই তুমি অনেক পেয়েছ।

হরকীর্তনের চেহারা যেমনই হোক, মানুষটা সে ভাল। ঘ্যান ঘ্যান করে বিরক্ত করল। শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল-না তেমন কিছু আর পেলাম কই? যা পেলে মানুষ বড় হয় তা পাওয়া হয়নি। যাক, একটা জীবন কেটেই যাবে—

—তুমি সংসার করনি?

—না, ওসব ঝামেলায় আর নিজেকে জড়াই নি। আচ্ছা, আসি তাহলে। অসময়ে খুব বিরক্ত করে গেলাম, কিছু মনে করবেন না

—না, না, তাতে কী হয়েছে? এদিকে আবার এলে দেখা করে যেও—

তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেছিলাম, সে বাধা দিয়ে বলল—আপনাকে আর আসতে হবে না। এবার বিশ্রাম নিন বরং-

দরজার কাছে খুলে রাখা চটিজোড়া পায়ে দিয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে উঠোন পার হয়ে একবার দাঁড়াল। কঞ্চির বেড়ার

দরজায় একটা হাত রেখে আমার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে বলল—শুক্রবার। শুক্রবার।

হরকীর্তন কথাটা আমার দিকে তাকিয়ে বলছে বটে, কিন্তু ঠিক যেন আমাকে বলছে। তার চোখে হঠাৎই উদ্দেশ্যহীন শূন্যতা। সে এখানে আছে বটে, নেইও বটে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—কী শুক্রবার? কীসের শুক্রবার?

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না সে, পেছন ফিরে হেঁটে চলে যেতে লাগল।

লক্ষণ-প্রতিলক্ষণ ইত্যাদি নিয়েই জ্যোতিষ এবং তন্ত্রসাধনার চর্চা করতে হয়। আমি বুঝতে পারলাম হরকীর্তন কথাটা নিজের জ্ঞানে বলেনি, দৈবী আবেশে গ্রস্ত হয়ে বলেছে। কেন এবং কী ভেবে বলেছে তা ও নিজেও জানে না। যেভাবে এলোমেলো পা ফেলে সে হেঁটে যাচ্ছে, তাতে বোঝা যায় তার ঘোর এখনো কাটেনি। কী বলতে চাইল লোকটা?

আজ সোমবার, তিনদিন পরে শুক্রবার পড়ছে। কী হবে শুক্রবার?

বৈঠকখানায় ফিরে এসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আবার একটু বিশ্রাম আর ঘুমের চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুমের রেশ একবার কেটে গেলে ফের তাকে খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। হোরাশাস্ত্র পড়তে পড়তেই বিকেল গড়িয়ে গেল।

পরের দিন সকালে কোষ্ঠী লেখবার হলুদ রঙের লম্বা কাগজের ফালি তৈরি করছি, এমনসময় স্ত্রী এসে কাছে দাঁড়ালেন। বললাম—কী হল? কিছু বলবে?

আমার স্ত্রী বরাবরই খুব মৃদুভাষিণী, তারপর তখন আবার নতুন বিয়ে হয়েছে। তিনি উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। বললাম—আরে, কী ব্যাপার বলোই না–

উত্তরে তিনি যা বললেন সেটা আমারই আগে খেয়াল করা উচিত ছিল। বাড়িতে চাল নেই, ডাল নেই, আনাজ-সবজি-তেলমশলা কিছুই নেই। আগের দিন অবধি তিনি যা করে হোক চালিয়েছেন, আজ আর কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ে আমি কী ভাবছি?

শুধু হোরাশাস্ত্র পড়ে দিন কাটালে চলে না। স্ত্রীর সঙ্কুচিত অনুযোগ আমাকে বাস্তব পৃথিবীর রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে দিল। থলেহাতে বেরিয়ে পড়লাম।

জনবসতির শেষদিকে যেখানে পথটা হাটতলা হয়ে মহকুমা শহরের দিকে চলে যাচ্ছে, সেখানে হারাধন নন্দীর মুদিখানা। এখানে আসার পরে এই দোকান থেকেই মাঝে মাঝে জিনিসপত্র নিয়ে যাই। হারাধন লোকটা ভদ্র, হাসিমুখ। সওদা মেপে দিতে দিতে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, সুখদুঃখের কথা বলে। তার দোকানেই গিয়ে দাঁড়ালাম।

সে সময়টা খদ্দের কেউ নেই, দোকান খালি। হারাধন তালপাতার পাখা উলটো করে। ধরে তার বাঁট দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে। আমাকে দেখে বলল—আসুন ঠাকুরমশাই কী দেব?

তোমরা শহুরে মানুষেরা শুনলে একটু অবাক হবে, গ্রামাঞ্চলে মুদিখানায় চাল-ডাল তেল-নুন ছাড়াও আলু পিঁয়াজ কুমড়ো লাউ শাকপাতা পাওয়া যায়, অন্তত একসময় যেত। কারণ হাট বসে সপ্তাহে মাত্র দুদিন, অন্য সময়ে হঠাৎ

প্রয়োজন হলে মানুষকে বিপদে পড়তে হয়। মাছ-মাংস পাওয়া অবশ্য সম্ভব নয়, তবে কিঞ্চিৎ সৌখিন খরিদ্দারদের জন্য কোনো কোনো দোকানে হাঁসের ডিম থাকে।

বললাম কিছু চাল-ডাল, তেন-নুন-মশলা আর সামান্য সবজি—

হারাধন বলল—আপনি বলে যান ঠাকুরমশাই, আমি মেপে দিই। দিন থলেটা—

এবারেই আসল কথাটা বলতে হবে। একটু কেশে বললাম—হারাধন, একটা কথা–

–কী ঠাকুরমশাই?

—ইয়ে হয়েছে মানে—দামটা কিন্তু কয়েকদিন পরে দেব, এখন বাকি থাকবে।

একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হারাধন বলল—দিন, থলেটা দিন–

তারপর একটু হেসে বলল–আমাদের সকলকেই কোনো না কোনো সময়ে ঠেকায় পড়তে হয়। অসুবিধের সময় পরস্পরকে দেখলে কি চলে? বড় বড় কথা বলছি ভেবে রাগ করবেন না ঠাকুরমশাই, আপনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, মাননীয়, কিন্তু বয়েসে আমি বড়। থলেটা দিন, আর বলুন কী কী দেব–

মানুষের ভেতরেই ঈশ্বর বাস করেন। নইলে বাংলার অখ্যাত পাড়াগ্রামের এক মুদির মনে এই সহানুভূতি আর করুণার প্রকাশ কী করে সম্ভব?

কিশোরী বলল—শুধুই ঈশ্বর?

তারানাথ বলল-দানবও। ভাল আর মন্দ, আলো আর অন্ধকার সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই বর্তমান, বৈপরীত্য আছে বলেই সৃষ্টির সার্থকতা আছে। দানবিকতার ওপরে ঐশ্বরিকতার প্রতিষ্ঠাই মানুষের সাধনা। যাক, শোনো–

তারানাথ আবার বলতে শুরু করল।

কৃতজ্ঞচিত্তে বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম এই স্বস্তি মাত্র কয়েকদিনের। ধার করে তো

আর মাসকাবারি বাজার করা যায় না, যা এনেছি তাতে বড়জোর দিন তিনেক চলতে পারে, তারপর অনটনের মেঘ আবার আকাশ ছেয়ে ফেলবে। নিকট ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা বর্তমানের আনন্দকে ম্লান করে দিল।

স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে খ্যাতি আছে এমন শহরে ডাক্তারের পসার জমে না। আমারও হল প্রায় তাই। যেন ভয়াবহ নাস্তিকদের দেশে বাসা বেঁধেছি, সপ্তাহে অন্তত একখানা কোষ্ঠী আর পাঁচ-ছটা হাত দেখার খদ্দের খুব দুঃসময়েও পেতাম, হঠাৎ তাও বন্ধ হয়ে গেল। একটানা খরা যাকে বলে। মাঝে মাঝে মনে হত মধুসুন্দরী দেবী বলেছিলেন আমি ধনী হতে পারব না বটে, কিন্তু অনাহারে কখনো দিন কাটাতে হবে না, মোটামুটি চলেই যাবে। দেবীর আশীর্বাদ কি শেষ পর্যন্ত মিথ্যে হতে চলেছে? অনাহার তো এসে পড়ল বলে।

কিন্তু আমার যা চিরকালের অভ্যেস, বৈষয়িক দুর্ভাবনা বেশিক্ষণ করতে পারি না। চৈত্রের প্রথম, গাছে নতুন পাতা গজাতে শুরু করেছে, ঈষৎ তপ্ত বাতাস শীতের শেষে ঝরা শুকনো পাতার রাশি অস্পষ্ট মর্মর শব্দে সরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমের গুটি ধরেছে। গাছে গাছে, আকাশ নির্মেঘ নীল। ঋতুর এই সব সন্ধিক্ষণে মন উদ্বেল হয়ে ওঠে, মনে পড়ে যায়

ছোটবেলার কথা, হারানো মানুষদের স্নেহভরা হাসিমুখের কথা। মনে পড়ে যায় প্রথম যৌবনে আমার দায়মুক্ত ভবঘুরে জীবনের কথা। এইসব অমূল্য উপলব্ধির সম্পদের মধ্যে কে দুর্ভাবনা করে বাড়িতে চাল-ডাল আছে কিনা তার জন্য?

কিন্তু মুশকিল হল বাস্তবকে নিয়ে। তিনদিন পরেই সকালে স্ত্রী জানিয়ে দিলেন বাড়িতে যা আছে তাতে টেনেটুনে আর একটা দিন চলবে, পরের দিন বাজার না আনলেই নয়।

বাইরের দাওয়ায় উদ্ভ্রান্ত মনে পায়চারি করতে লাগলাম। কি করি আমি এখন? আজ শুক্রবার। হরকীর্তন বলে গিয়েছিল মনে রাখতে, শুক্রবার একটা কিছু হবে। কি হতে পারে আজ? দিন তো শুরু হয়ে গেল।

উঠোনের ওপারে রাংচিতার বেড়ার ওপর একটা কাক কোথা থেকে এসে বসেছে। ঠোট ঘষছে বেড়ার গায়ে। তার ঠোঁট থেকে কী একটা জিনিস খসে উঠোনের ভেতরদিকে। পড়ল। আমি প্রথমটা খেয়াল করিনি। একটু পড়ে দেখি আরেকটা কাক এসে আগেরটার পাশে বসল। তার পর আর একটা। এ দুটো কাকের মুখ থেতেও হালকা কী জিনিস ভাসতে ভাসতে উঠোনে পড়ল। একটু অবাক হয়ে বেড়ার

দিকে এগিয়ে যেতে কাক তিনটে উড়ে পালাল। জায়গাটায় পৌঁছে আমি সবিস্ময়ে উঠোনের মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মাটিতে পড়ে রয়েছে একখানা পাঁচ টাকার এবং দুখানা দু'টাকার নোট!

আশ্চর্য! এখানে টাকা এল কোথা থেকে? কাকেরাই মুখে করে এখানে এনে ফেলে দিয়ে গেল নাকি? নিচু হয়ে টাকাগুলো কুড়িয়ে হাতে নিলাম। নোটগুলোতে শুকনো রক্ত আর মাছের আঁশ লেগে রয়েছে। ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝতে পারলাম। আজ হাটবার, মাছের আড়ত থেকে কাক তিনটে রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নোটগুলো তুলে এনে বেড়ার ওপর বসেছিল। ঠোট ঘষবার সময় সেগুলো খসে পড়েছে।

নোট তিনটে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হরকীর্তনের ভবিষ্যৎবাণী ফলে গেল তাহলে! অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটার! কাকে মুখে করে এনে টাকা ফেলে যায় এমন কখনো শুনিনি। মনে রেখো, যে সময়কার কথা বলছি তখন ন'টাকা অনেক টাকা। ছোট সংসারে একমাসের বাজার হয়ে যায়। টাকাটা না পেলে আজ সত্যি বিপদ হত, আগের টাকা শোধ না করে তো

হারাধনের কাছে নতুন করে ধার নেওয়া যেত না।

বিস্ময়ের তখন যে আরও অনেক বাকি তা বুঝতে পারিনি। পরের দিন থলে নিয়ে সকালবেলা হারাধনের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। হারাধন বলল—আসুন ঠাকুরমশাই। আজ হাটে না গিয়ে আমার দোকানে এলেন যে বড়? হাটে নানারকম জিনিস পেতেন

বললাম হ্যাঁ, কাল আর হাটে যাওয়া হয়ে উঠল না, তাই আজ তোমার কাছেই এলাম।

হারাধন বলল—সে কী ঠাকুরমশাই! হাট তো কাল ছিল না! আপনি নতুন লোক, ভুলে গিয়েছেন হয়তো, হাট তো আজ শনিবার বসেছে। তাহলে কি হাটেই যাবেন?

মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। হাট গতকাল ছিল না, আজ বসেছে! তাহলে কাক তিনটে মাছের রক্ত আর আঁশমাখা টাকা পেল কোথা থেকে? যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে বললাম—না হারাধন, হাটে যাবে না। যা নেবার তোমার কাছ থেকেই নিই।

সেদিন রাত্তিরে মধুসুন্দরী দেবীকে স্বপ্নে দেখলাম। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি হাসছেন। যেমন হেসেছিলেন এক পূর্ণিমার রাত্তিরে বরাকর নদীর ধারের শালবনে।

ষোড়শ

আবার ফিরে আসি গল্পে

আবার ফিরে আসি গল্পে।

মধ্যাহ্নসূর্য তখন অনেকখানি পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বনের মধ্যে আর কিছুক্ষণ বাদেই ছায়া-ছায়া ধূসরতা নামতে শুরু করবে। সিমডেগাতে খেয়াল করে দেখেছি, পাহাড়ি অঞ্চলে সন্ধ্যা নামে ঝুপ্ করে, হঠাৎ। সমতল বাংলায় যেমন হয়, তেমন কোনো পূর্বপ্রস্তুতি নেই। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি পাথরটার দিকে, অতবড় জগদ্দল পাথর, যার ওজন অন্ততঃ একশো মণ, সেটা কি দু-চারজন মানুষ ঠেলে এতখানি সরাতে পারে? তাছাড়া জলধর পণ্ডা তো বলেই দিয়েছে এদিকে আজ কুলিরা কাজ করতে আসেনি। কী হচ্ছে

এসব?

গাছটারই বা কী হল? মেজকর্তা, সার্ভেয়ার সাহেব বা অসিতবাবু হয়ত আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না, ভাবতেন একটা বিশাল গাছ তো আর বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না, নিশ্চয় আমি ভুল দেখেছি বা জায়গা ভুল করছি।

যদি না পাথরটার সরে যাওয়া তারা নিজের চোখে দেখতেন!

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একটা জিনিস। যেখানে গাছটা দেখেছিলাম সেখানে সেটা আর নেই, কিন্তু মাটিতে পড়ে আছে কয়েকটা বড় বড় গোল গোল পাতা। এরকম কোন গাছের পাতা আমি কখনো দেখিনি। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া গাছটায় এই পাতাই ছিল বটে। কিন্তু সে কথা বললে কি মেজকর্তারা বিশ্বাস করবেন?

কী একটা কথা যেন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে। এইরকম একটা ঘটনার কথা আমি কোথায় যেন শুনেছি। কোথায়? কোনো কিছু আবছা মনে পড়ছে, পুরোটা স্পষ্ট হচ্ছে না, এ বড় যন্ত্রণার ব্যাপার। জুতোর ভেতর একটু বেরিয়ে

থাকা পেরেকের মত। কেবলই খ খচ্‌ করে।

সকলে ফিরে এলাম তাঁবুতে। কারোই মন ভাল নেই। একটা ব্যাখ্যার অতীত আশঙ্কার ছায়া পরিবেশে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছে। বিকেলের আবছায়া এবার সত্যিই গাঢ় হয়ে নামার উদ্যোগ করছে। তাঁবুর সামনে টেবিল পেতে আমরা বসলাম। জলধর গেল কুলিদের সঙ্গে কথা বলতে। ডহরু ভারি দক্ষ কর্মচারী, চারদিকে যাই ঘটে যাক, সে নিজের কর্তব্য ভোলে না। তাকে কিছু বলার আগেই সে কাঠের ট্রেতে সকলের জন্য এনামেলের মগ ভর্তি চা নিয়ে এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে মেজকর্তা বললেন—এটা বিংশ শতাব্দী। অপদেবতা-অভিশাপ–মাম্বো-জাম্বো আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু এখানে কিছু একটা যে ঘটছে সেকথা ঠিক। হয়ত এর যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা আছে, যেটা আমরা ধরতে পারছি না। অন্য সব ব্যাপার। ছেড়ে দিলেও অতবড় পাথরটার স্থান পরিবর্তন কীভাবে ব্যাখ্যা করব জানি না।

অসিতবাবু বললেন—পাখিরা আর ডাকছে না।

মেজকর্তা প্রথমে ভাল ধরতে পারলেন না। বললেন–

আঁ?

-বলছি আজ দুপুর থেকে পাখির ডাক আর শোনা যাচ্ছে না। খেয়াল করেছেন?

মেজকর্তার কপালে চিন্তার রেখা পড়ল। এতক্ষণ ভদ্রলোক জিনিসটা ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে পারেন নি, এবার পরিবেশের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা মোটা চাদরের মত সবার চেতনার ওপর বিছিয়ে নেমে এল।

অসিতবাবু বোধহয় পাখি সম্বন্ধে পড়াশুনো করেন। তিনি বললেন—ব্যাপারটা খুব হালকাভাবে নেবেন না। বিহার-উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশের এই সীমান্ত অঞ্চলে কম করে একশো বত্রিশ রকমের পাখি আছে। জঙ্গলে তাদের চিৎকারে কান পাতা যায় না। ভোরবেলা আর সন্ধের সময় এরা নিজের নিজের বাসায় ফিরে প্রাণভরে ডাকে। তাকে বলে ডন কোরাস আর ইভনিং কোরাস। এই তো সন্ধে নেমে আসছে, কই, কোনো পাখি ডাকছে না কেন?

নির্মল কাঞ্জিলাল বললেন—তাই তো! এটা তো ঠিক খেয়াল করিনি। সেইজন্যেই চারিদিকটা যেন কেমন কেমন

লাগছে। শুধু পাখি কেন, পোকামাকড়ের ডাকও তো শোনা যাচ্ছে না। এটা কিন্তু সত্যিই অস্বাভাবিক। জঙ্গল কেন, শহরেও সন্ধেবেলা পোকা ডাকে–

আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল। দিনের বেলা উজ্জ্বল সূর্যালোকে এই অরণ্য তার সৌন্দর্য নিয়ে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মত উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। এখন নিকষ আলোকহীনতায় সেই অরণ্যই ছোটবেলায় বর্ষার রাত্তিরে মায়ের কোলে শুয়ে শোনা রাক্ষসপুরীর বাগানের বর্ণনার মত দেখাচ্ছে।

ডহরু লোহার একটা উজ্জ্বল পেট্রল বাতি জ্বেলে আমাদের টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোকবৃত্তের বাইরে অন্ধকার পিছিয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্য এক বিপদ দেখা দিল। একেবারে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার বরং তবু সহ্য করা যায়, তীব্র আলোর মধ্যে বসে একটু দূরের রহস্যময় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা বড় অস্বস্তিকর। এ বোধহয় মানুষের গভীরতম অবচেতনে লুকিয়ে থাকা অজানার প্রতি ভয়। আলোয় দেখতে পাওয়া একটুখানি পরিচিত নিরাপত্তা, তার বাইরে কী লুকিয়ে আছে কে জানে! অন্ধকারে ভয় কিছু নেই, অন্ধকার যা ঢেকে রাখে সেইটেতেই আসল ভয়।

মেজকর্তা সিগারেট ধরালেন। আমাদেরও দিলেন একটা করে। আগেই বলেছি বাইরে কাজ করতে এসে আমরা সবাই পদমর্যাদা ভুলে স্বাভাবিকভাবে মিশছি, নইলে যাকে টিমওয়ার্ক বলে (এই নতুন শব্দটা সম্প্রতি মেজকর্তার কাছেই শিখেছি) তা করা সম্ভব নয়। চুপচাপ বসে আমরা সিগারেট টানতে লাগলাম।

একটু বাদে জলধর ফিরে এসে সামনে দাঁড়াল। মেজকর্তা বললেন—কী হে? মুখ অত গম্ভীর কেন? কী হয়েছে?

—কর্তা, কুলিদের নিয়ে বিপদ হবে মনে হচ্ছে। ওরা ভয় পেয়েছে।

—সে তো আগেই বলেছ, আমিও আন্দাজ করেছি। কী বলছে ওরা?

—হুজুর, এসব লোক অনপড়, মূর্খ। ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানবে বিশ্বাস করে। এই অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে পাসাং মারা বলে এক অপদেবতার গল্প চালু আছে। সে নাকি বড়

খারাপ দেবতা, অসুখ-বিসুখ মৃত্যু আর অমঙ্গল নিয়ে তার কারবার। এসব পাহাড় জঙ্গল তার অধিকারের মধ্যে। সে না চাইলে এখানে আমরা কাজ করতে পারব না। রাগ হলে পাসাং মারা বাতাসে গান ভাসিয়ে জানান দেয়। সেই গান আজ এখানে শোনা। গিয়েছে। এরপর নাকি পাহাড়ে পাহাড়ে কথা হবে। পাহাড় ক্রমশ পরস্পরের কাছে সরে এসে তাঁবুসুদ্ধ আমাদের পিষে মেরে ফেলবে। কর্তা, ওদের দিয়ে কাজ করানো মুশকিল হবে। ওরা ফিরে যেতে চাইছে।

—এতক্ষণ ধরে কি এই কথাই হচ্ছিল ওদের সঙ্গে?

—ওরা সবাই তো কথা বলে না। ওদের হয়ে সর্দার কথা বলছিল। মানুষগুলো সরল কর্তা, একবার ভয় পেলে বোঝানো কঠিন। তেমন তেমন বুঝলে আমি ওদের নিয়ে লরি করে চলে যাচ্ছি কাল, আবার নতুন লোকজন নিয়ে ফেরবার চেষ্টা করব। তার আগে আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করে দেখি–

মেজকর্তা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন-চেষ্টা করে দেখি মানে কী? এতবড় প্রজেক্টের সার্ভে হচ্ছে, যার ওপর কোম্পানীর ব্যবসা নির্ভর করছে—চেষ্টা করব মানে কী? এরা যদি সত্যিই

শেষ পর্যন্ত কাজ করতে রাজি না হয় তাহলে নতুন কুলির দল ধরে আনতেই হবে। নইলে চলবে কী করে?

জলধর পণ্ডা বলল—হুজুর, এদের মধ্যে একতার ভাব খুব বেশি, একজন যদি কোন কাজ করতে নারাজ হয়, বাকি সবাই সেই একই বুলি ধরবে। একদিন দুদিনের মধ্যে গ্রামে গ্রামে খবর চলে যাবে। তেমন তেমন অবস্থা হলে কুলি পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়বে। দেখি, যদি সামান্য কিছু বাড়তি মজুরির কথা বলে এদের রাজি করানো যায়।

দুই আঙুলে টুকি দিয়ে মেজকর্তা সিগারেটের টুকরোটা দূরে পাঠিয়ে বললেনজলধর, একটা সত্যি কথা বলবে?

-কী আঁইজ্ঞা?

–তুমি নিজে এইসব ভূত আর অপদেবতা বিশ্বাস করো?

জলধর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল—দিনের বেলা করি না হুজুর। কিন্তু রাত্তিরে করি–

মেজকর্তা হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। যাও–

জলধর আবার কুলিদের কাছে ফিরে গেল। নির্মল কাঞ্জিলাল বললেন–কুলিরা নারাজ হলে খুব বিপদ হবে। জলধর একটা কথা ঠিকই বলেছে, একটা দল অরাজি হলে। অন্যদলকে বোঝানো মুশকিল হয়ে পড়বে। কী করবেন মেজকর্তা?

মেজকর্তা বললেন—দেখা যাক, উই উইল ক্রস দি ব্রিজ হোয়েন উই কাম টু ইট। আগেই দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই।

ডহরুও আদিবাসী, কিন্তু সে আশ্চর্যজনকভাবে নির্বিকার এবং ভাবলেশহীন। জাতভাইদের ভয় এবং উত্তেজনা তাকে স্পর্শ করেছে কিনা বোঝা যায় না। নিঃশব্দে সে। নিজের কাজ করে চলেছে। রাত্তিরে খাওয়ার সময় দেখি শালপাতার থালায় ঘি-মাখানো মোটা মোটা হাতে গড়া রুটি, ঘন অড়হরের ডাল, আলু কুমড়োর তরকারি আর আচার। সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে ডহরু। খাওয়া-দাওয়া সেরে তাবুতে ঢুকে বিছানা আশ্রয় করলাম। ঘুম আসবার আগে অবধি দেখলাম অসিতবাবু আধশোয়া হয়ে ডায়েরি। লিখছেন।

অনেক রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কত রাত্তির

বুঝতে পারলাম না। বালিশের তলায় হাতঘড়িটা আছে বটে, কিন্তু এই ঘন অন্ধকারে তা দেখে কত রাত বোঝা যাবে না।

অন্ধকারের মধ্যেই চোখ মেলে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইলুম। কিছুতেই আর ঘুম এলো না। ওপাশে অসিতবাবু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তাঁর মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মনের ভেতর কেমন একটা অস্বস্তি। তাঁবুর বাইরে কী যেন একটা ঘটছে। অরণ্যে কোনো নিশাচর পাখি বা কীটপতঙ্গের ডাক নেই, পত্রমর্মর নেই। একবার কি বাইরে গিয়ে দাঁড়াবো? দেখব মধ্যরাত্রে অরণ্য কেমন আছে?

অসিতবাবুকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। না, সবই তো ঠিক আছে। আসলে পাসাং মারার গল্প শুনে ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়েছি। সেজন্যই ঘুম আসছে না।

শুক্লপক্ষের রাত বটে, কিন্তু আকাশে সম্ভবত হালকা মেঘ ছেয়ে আছে। অতি আবছা একটা আলোর আভাস বাদ দিলে চারদিক ছায়ায় ডুবে আছে।

তাঁবুর ভেতরে ঢুকতে যাবো, হঠাৎ কী মনে হওয়াতে আবার একবার চারদিকে তাকালাম। কোথায় যেন খুব অস্পষ্ট একটা শব্দ হচ্ছে না? ঠিক শব্দ বলা যায় না হয়ত, বরং বাতাসে ভেসে ওঠা শ্রবণসীমার প্রান্তে অবস্থিত একটা স্পন্দন বলা যেতে পারে। যেন শুকনো শালপাতা খসে পড়ছে মাটিতে। কে যেন কার কানে কানে ফিসফিস্ করে কী বলছে।

তারপরেই চোখ বড় বড় করে ভাল করে তাকালাম। এ কী! দিনের বেলায় দেখা দূরের পাহাড়গুলো যেন অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছে না? কিন্তু তাও কি হতে পারে? আলো-আঁধারিতে আমার চোখে ধাঁধা লেগেছে হয়ত। কিন্তু না, আলো যতই কম হোক, চোখ কি এতবড় ভুল করবে?

হঠাৎ মনে পড়ল জলধর পণ্ডার কথা। কুলিদের সর্দার তাকে বলেছিল এরপর পাহাড়ে পাহাড়ে কথা হবে, পাহাড়েরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে আমাদের পিষে মারবে। পাহাড়েরাই কি তাহলে ফিসফিস শব্দে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে? আমাদের ঘুমের অবসরে একটু একটু করে এগিয়ে এসেছে কাছে? কী কথা বলছে পাহাড়ের দল? নিজেদের অধিকারে মানুষের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ তারা যে পছন্দ করেনি সেই

কথা জানাচ্ছে পরস্পরকে? বিকেলে যখন কুলি সর্দারের কথা শুনেছিলাম তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন–

অবাক হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না, তাঁবুর ভেতরে ফিরে এসে বিছানায় শুলাম। পাশে রাখা হাতব্যাগটায় টর্চ ছিল, এবার সেটা বের করে জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলাম। রাত আড়াইটে। অসিতবাবু পূর্ববৎ নিদ্রাচ্ছন্ন। আমিও মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। যা হবার সে কাল সকালে উঠে দেখা যাবে। খামোকা রাত জেগে শরীর খারাপ করে লাভ কী?

আগেই বলেছি, উদ্বেগ আর অশান্তির চাপ কমানোর জন্য মনের একটা নিজস্ব ব্যবস্থা আছে। বয়লারের চাপের সমতা বজার রাখার ভালভের মত, চাপ নিতান্ত অসহ্য হলে মন খানিকটা আশঙ্কা অদ্ভুতভাবে ভুলে যায়, উপেক্ষা করে। আমারও একটু বাদেই ঘুম পেতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়বার ঠিক আগের তন্দ্রাবেশঘন মুহূর্তে মনে পড়ল ওই গোল। গোল পাতাগুলোর কথা আমি কোথায় শুনেছি। উনিশশো পনেরো সালের এক বর্ষামুখর রাত, হুগলী জেলার রামজয়পুর গ্রামে সরসী চাটুজ্জ্যের বাড়ির বৈঠকখানায় আষাঢ়ে গল্প জমে উঠেছে। রাম গাঙ্গুলি বলছেন তার মামাবাড়ির গ্রামে ঘটা এক

আশ্চর্য অভিজ্ঞতার। কাহিনী। সেই গ্রামের প্রান্তে নির্জন জলাভূমির ভেতর দেখা বিশাল বনস্পতি, বড় বড় গোল তার পাতা। আগের দিন ওইখানে ছিল না গাছটা, পরের দিন গিয়েও দেখতে। পাননি রাম গাঙ্গুলি। কেবল ওই একদিন। আকাশে দেখা গিয়েছিল অদ্ভুত আলো। গল্পটা শুনে এসে তারানাথের বাবা আদিনাথ চক্রবর্তী বলেছিলেন তারানাথকে। কী যেন নাম বলেছিলেন গাছটার? হ্যাঁ, বুদ্ধ নারিকেল। কত-কতদিন আগের কথা। উনিশশো পনেরো সালে রাম গাঙ্গুলি বলেছিলেন, এটা চল্লিশ বছর আগের ঘটনা, মানে সেদিন থেকে প্রায় সত্তর বছর কেটে গিয়েছে। ডাইনিদের চাতর বসেছিল জলার ভেতরের সেই ডাঙায়। ডাইনিরা উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল সেই গাছ। অন্তত রাম গাঙ্গুলির তেমন বিশ্বাস ছিল। আজ আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া ভাল কথা নয়।

দূরে বোধহয় কোথাও মেঘ ডাকল। ঝড়বাদল হবে নাকি? আকাশে তো মেঘ দেখে এলাম। রাত্তিরেই বৃষ্টি নামলে মুশকিল হবে, কারণ লরিতে ফোল্ডিং খাট থাকলেও আজ আমরা আর সেগুলো নামাই নি, মোটা ত্রিপল মাটিতে পেতে তার ওপর বিছানা করেছি। সামান্য ঢালুর ওপর তাঁবু, বৃষ্টি নামলে পাহাড়ের ওপর থেকে জল বন্যার মত নেমে এসে। সব ভাসিয়ে দেবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেল। পুরোপুরি ঘুমোনোর আগে আর একবার শুনলাম মেঘের ডাক। দূরশ্রুত দামামার মত।

পরদিন সকালে উঠে দেখি সত্যিই আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তবে তক্ষুনি। বৃষ্টি নামবে বলে মনে হল না। আর পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি দূরে দূরে যেখানে ছিল তারা সব সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সকালের আলো ফুটে ওঠায় রাত্তিরের বুকচাপা ভাবটাও কেটে গিয়েছে।

খোলা জায়গায় পাতা টেবিলে গিয়ে আমরা সকলে বসলাম। পাঁচমিনিটের মধ্যে ডহরু চা বানিয়ে এনে সামনে রাখল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম মেজকর্তা, অসিতবাবু বা নির্মল কাঞ্জিলাল কারোই মন তেমন ভাল নেই। অন্যদিন সকালে চা খেতে খেতে একটু গল্পগুজব বা হাল্কা আড্ডা হয়, আজ যেন সবাই মুখ ভারি করে বসে আছে। কী হল এদের?

চায়ের মগ খালি করে টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম— কী ব্যাপার বলুন তো অসিতবাবু? আপনাদের মুখ এত গম্ভীর কেন?

অসিত বিশ্বাস আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন, তারপর একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, বুদ্ধ নারিকেল কাকে বলে?

আমি চমকে উঠলাম, দেখলাম নির্মল কাঞ্জিলালও চমকে উঠলেন। মেজকর্তা নাবুঝতে পারার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

বললাম-কেন, একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? এ নাম কোথায় পেলেন আপনি?

অসিতবাবু বললেন—কাল অনেক রাত্তিরে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। যেন একলা একলা দুপুরবেলা আপনার দেখানো ওই জায়গাটায় গিয়েছি—এবং কী অদ্ভুত! সেখানে সত্যিই বিরাট একটা গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকাশছোঁয়া উঁচু, বড় আর গোল পাতা সে গাছের। নিচে একখানা বিশাল পাথর। স্বপ্নেই আপনার কথা ভাবলাম, আপনি তো বলেছিলেন এই গাছটার কথা। দু-তিনটে পাতাও পড়ে আছে নিচে। ঠিক যেমনটি দুপুরে দেখেছি। মনে মনে ভাবছি-কী গাছ এটা? স্বপ্নের মধ্যেই কে যেন বলল—এর নাম বুদ্ধ

নারিকেল। সবকিছু এমন স্পষ্ট দেখলাম যে, মনে হচ্ছিল আমি যেন জেগে জেগে বাস্তবে ব্যাপারটা দেখছি। বুদ্ধ নারিকেল বলে সত্যিই কোনো গাছ হয় নাকি? স্বপ্নটা যে এমনিতে খুব ভয়ের কিছু তা নয়। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে অকারণেই মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। কেন দেখলাম এমন স্বপ্ন কে জানে!

বললাম–মনের কোন গহন ক্রিয়ায় ওই স্বপ্ন দেখেছেন তা বলতে পারব না, কিন্তু বুদ্ধ নারিকেল বলে গাছ সত্যিই আছে। আমি দেখিনি কখনো, তবে বর্ণনা শুনেছি। কীভাবে কোথায় শুনেছি তা বলব এখন। খারাপ লাগছে এই ভেবে যে, বুদ্ধি করে দুএকটা পাতা নিয়ে রেখে দিলে পরে রাঁচি কলেজের কোনো বট্যানির প্রফেসারকে দেখিয়ে নিশ্চিত হওয়া যেত।

অযাচিতভাবে একটা বুদ্ধির কাজ করে ফেললে মানুষের মুখে যেমন একটা গৌরবের উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে, তেমনি মুখ করে অসিতবাবু বললেন-আমি রেখেছি।

–বলেন কী! বাঃ, তাহলে তো দু-একদিনের ভেতর ব্যাপারটা যাচাই করে নেওয়া যায়–

অসিতবাবু বললেন–পাতাগুলো আমার ব্যাগে রেখে দিয়েছি। দাঁড়ান, দেখাই–

তিনি উঠে তাঁবুর দিকে চলে গেলেন।

মেজকর্তা আর সার্ভেয়ার নির্মলবাবুর চোখমুখ এখনো গম্ভীর। ওঁদেরও কিছু বলবার আছে নাকি? ব্যাপার যেমন দেখছি তাতে কিছুই অসম্ভব নয়।

অসিতবাবু ফিরে এলেন। তার মুখে আত্যন্তিক বিস্ময়ের ছাপ।

বললাম—কী হল? পাতাগুলো কই?

তিনি বললেন–তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু পাতাগুলো ব্যাগে নেই!

সপ্তদশ

মেঘে ঢাকা বিষণ্ণ আলোর মেদুর সকালে

সেই মেঘে ঢাকা বিষণ্ণ আলোর মেদুর সকালে আমরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। গতকাল থেকে নানাভাবে বেড়ে-ওঠা অস্বস্তিটাকে আমরা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিলাম, কিন্তু তা আর হবার নয়। এখানে যে অদ্ভুত আর অনৈসর্গিক কিছু ঘটছে সেটা আর অস্বীকার করা যাবে না। তবু বোধ করি। নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্যই একটু ইতস্তত করে অসিতবাবুকে বললাম—আপনার হয়ত ভুল হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত পাতাগুলো ব্যাগে ভরেন নি, কোথাও পড়ে-উড়ে গিয়েছে—

অসিতবাবু ম্লান হেসে বললেন—আমার ভুল হয়নি, পরিষ্কার মনে আছে পাতাগুলো আমি ব্যাগে ভরেছি। বড় সাইজের থালার মত গোল পাতা, এমনিতে ধরাতে পারছিলাম না বলে ভাঁজ করে ঢোকাতে হয়েছিল। আমি ভুল করছি না—

আমি নির্মলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম—আপনার মুখও কেমন যেন থমথমে, কিছু হয়েছে নাকি? তখন একবার যেন চমকে উঠলেন—

নির্মলবাবু বললেন-আমি এসব আধিদৈবিক ব্যাপার নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি, বিজ্ঞান দিয়ে যা ব্যাখ্যা করা যায় না তাতে আমার কোনো বিশ্বাসও নেই। কিন্তু এখন ঘটনা যেমন দাঁড়াচ্ছে–

মেজকর্তা বললেন-কী রকম দাঁড়াচ্ছে? কী হয়েছে আপনার?

—আমিও কাল রাত্তিরে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি, ওই ওঁদের মতই স্বপ্ন। আবছা, একই স্বপ্ন তিনজন মানুষ একই রাত্তিরে কখনো দেখতে পারে কি? আমি তো অন্তত শুনিনি–

-কী দেখেছেন আপনি? কী স্বপ্ন?

—দেখলাম তাবু থেকে বেরিয়ে ছায়া-ছায়া অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছি বনের মধ্যে। সময়টা বোধহয় রাত্তির, আকাশে কেমন একটা চাপা আলো। সেই বিষণ্ণ মনখারাপ করে দেওয়া আলোয় পৃথিবীকে অন্যরকম লাগছে। বুকের ভেতরে ভয়ের পাথর চেপে বসতে চাইছে স্বপ্নেই। ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে সেই জায়গাটায় হাজির হলাম যেখানে বড় পাথরটা পড়েছিল। দেখলাম মাটিতে হড়কে যাবার দাগটা আর নেই, পাথরটা আবার পুরনো জায়গায় ফিরে এসেছে। তার পাশে একটা বিশাল বড় গাছ, গোল গোল থালার মত পাতা সেই গাছে। স্বপ্নেই ভাবলাম—ও, তাহলে তো সত্যিই এখানে একটা বড় গাছ আছে! কিন্তু এমন গাছ তো আগে কখনো দেখিনি? কী গাছ এটা? সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথা থেকে কে বলল—এর নাম বুদ্ধ নারিকেল। স্বপ্নেই চারদিকে তাকালাম, কই কেউ নেই তো! কে তাহলে বলল কথাটা? এই সময়েই চমকে জেগে উঠলাম। রাত তখন আড়াইটে কী তিনটে হবে। আর ঘুম এল না। মনের ভেতর কী ভীষণ অস্বস্তি। এত স্পষ্ট স্বপ্নও হয়? তাছাড়া অমন অদ্ভুত গাছের নামই বা কী করে স্বপ্নে পেলাম? নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে কিছু তো আর স্বপ্নে পাওয়া সম্ভব নয়। এখন অসিতবাবুকেও একই নাম

বলতে শুনে চমকে উঠেছিলাম। তাছাড়া–

মেজকর্তা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নির্মলবাবুর দিকে তাকিয়েছিলেন, বোধহয় যাচাই করে নিচ্ছিলেন তাঁর স্বপ্নকাহিনী। রাত্তিরে দেখা স্বপ্নের কথা পরের দিন সবটা ঠিকঠাক মনে থাকে না, বলতে গেলে কিছুটা বানানো হয়ে পড়ে। কিন্তু সার্ভেয়ার সাহেব দ্বিধাহীনভাবে একটুও না থেমে গড়গড় করে বলে যাচ্ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল তিনি যা দেখেছেন তাই বলছেন, তৈরি করছেন না কিছু।

মেজকর্তা বললেন—তাছাড়া কী?

নির্মলবাবু একবার সেঁক গিললেন। যে কথা সত্য, কিন্তু শোনায় অসম্ভব, সে কথা বলবার সময় মানুষের যেমন বিপন্ন মুখভাব হয়, তেমনি মুখ করে তিনি বললেন–আর দেখলাম কী, রাত্তিরের অন্ধকারে সুযোগ পেয়ে চারদিকের পাহাড়গুলো যেন অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে, বেড়ার মত ঘিরে ধরেছে আমাদের তাবুগুলোকে। আর বাতাসে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ফিসফিস শব্দ হচ্ছে, কেউ যেন কাউকে নিচু গলায় গোপনীয় কিছু বলছে। স্বপ্নেই চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কেউ নেই তো। ঘুমের ভেতরেই একটা দমবন্ধ করা

ভয়ের ঢেউ এসে ধাক্কা দিচ্ছিল মনে। আজ সকালে উঠে প্রথমেই তাঁবুর বাইরে এসে পাহাড়ের দিকে তাকালাম। কই, পাহাড় তো সব তাদের জায়গাতেই আছে! স্বপ্নে যে কী ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!

নির্মল কাঞ্জিলাল গতকাল কি জলধর পণ্ডার কথা শুনেছিলেন? এখানেই তো ছিলেন বসে। সচেতনভাবে খেয়াল না করলেও বাতাসে ফিসফাস আর পাহাড় এগিয়ে আসার কথা নিশ্চয় কানে গিয়েছিল। সেটাই ঘুমের মধ্যে অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করে স্বপ্ন দেখিয়েছে।

কিন্তু তাতে একটা জিনিসের ব্যাখ্যা হয় না। বুদ্ধ নারিকেল কথাটা উনি পেলেন কোথা থেকে? কোথায় সেই ষাট-সত্তর বছর আগে রাম গাঙ্গুলির মামাবাড়ির গ্রামের ঘটনা, আর কোথায় বিহার-উড়িষ্যার প্রান্তবর্তী এই নির্জন অরণ্যভূমি। আমারই তো নামটা মনে পড়েছে অনেক পরে—ওঁদের দুজনের এ নাম জানার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

জলধর পণ্ডা এসে কাছে দাঁড়াল। তার মুখচোখ গম্ভীর।

মেজকর্তা বললেন—কী খবর জলধর? ওদের সঙ্গে কথা

হল?

–হইল কর্তা। কিন্তু খবর খারাপ, ওরা কাজ করতে চাইছে না।

মেজকর্তা টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে একটা বের করে ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটের জুলন্ত ডগার দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বললেন—জলধর, তুমি কী বলছ তুমি বুঝতে পারছ?

জলধরের ওই হাস্যোদ্রেককারী চেহারা আর বিচিত্র অ-কারান্ত উচ্চারণের পেছনে একটি বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব বাস করে। তার এই রূপটা আমরা আগে কখনো দেখিনি। এবার দেখলাম এবং অবাক হলাম।

জলধর দৃঢ়গলায় বলল—আমি বুঝতে পারছি কর্তা। কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কোম্পানির বহু টাকা লোকসান হয়ে যাবে, আমাদের সকলের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ যাবে। কোম্পানির বড়বাবুরা এসব কথা বিশ্বাস করবে না। সব বুঝি বাবু, কিন্তু এরা একবার যখন বেঁকে বসেছে, আর এদের রাজি করানো যাবে না। এদের বিশ্বাস এই অঞ্চলে পাসাং

মারা ক্ষেপেছে, এখানে আর থাকলে পাসাংমারার ভয়ানক অভিশাপ কাজ শেষ করে ফেরবার সময় পেছন পেছন যাবে, সমস্ত গ্রাম উজাড় করে দেবে। আমি অনেক বুঝিয়েছি, কোনো লাভ হয়নি।

–এখন তাহলে কী করবে?

—আমি এখনই কুলিদের নিয়ে ফিরে যাচ্ছি সিমডেগায়, লরিটা নিয়ে যাচ্ছি। যাবার পথে সাম পাহাড়টোলিতে ওদের নামিয়ে দিয়ে যাব। দেখি অন্য কোনো জায়গা থেকে লোক জোগাড় করতে পারি কিনা।

মেজকর্তা বললেন—সে কী! তাহলে আমরা কী করব?

—আপনারা এখানেই থাকুন। জিপটা রইল, যদি দরকার হয় এদিক-ওদিক যাতায়াত করতে পারবেন। ডহরু আপনাদের রান্নাবান্না করে দেবে। রসদ তো পনেরো দিনের মত রয়েছে, সে বিষয়ে চিন্তা নেই।

—তুমি কবে ফিরবে?

–আমার অন্তত দুদিন লাগবে। লোক জোগাড় করা সহজ কাজ নয়। এবার কোলেবীরা বা সীসার কাছে কোনো গ্রাম থেকে তোক নেব। ওদিকে বেশির ভাগই ক্রিশ্চান হয়েছে, রবিবারে যীশু ভজে। ওদের মধ্যে এসব ভূত-প্রেত আর অপদেবতায় বিশ্বাসটা কম। তবুও ঠিক করে বলা কঠিন–

–এখনই যাবে?

—এখনই যাব। নইলে এরা আমার পরোয়া না করে গাঁইতি-শাবল নিয়ে সারি বেঁধে নিজেদের গ্রামের পথে হাঁটতে শুরু করে দেবে। সেটা ভাল হবে না কর্তা। ভবিষ্যতে কখনো যদি বা আবার এদের ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা থাকে, এখন ভদ্রতা আর সাহায্য না করলে তা আর হবে না।

মেজকর্তা একটু ভেবে বললেন-যাও তাহলে, আর কোনো উপায় যখন নেই। চেষ্টা কোরো তাড়াতাড়ি ফিরতে।

জলধর পণ্ডা করিৎকর্মা লোক। কর্মসূচী একবার স্থির হয়ে যাবার পর সে আধঘণ্টার ভেতর সবকিছু গুছিয়ে চল্লিশ মিনিটের মাথায় রওনা হয়ে গেল। দেড়-দু মিনিটের মধ্যে

লরির ইঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে এল পাহাড়িপথের বাঁকে। এখন অন্তত দুদিন অপেক্ষা ছাড়া আমাদের কিছু করবার নেই।

একাকীত্ব জিনিসটা বড় খারাপ। আদিবাসী কুলিরা আমার সমাজের লোক নয়, আমার শিক্ষিত শহুরে মানসিকতার সঙ্গে তাদের কোনো দিক দিয়ে মিলও নেই। তবু তারা চলে যাওয়ার পর আমাদের কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল। মানুষের সঙ্গ এতই মধুর।

এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কেমন যেন ভয়-ভয়ও করতে লাগল। কলকাতা শহরে বিদ্যুতের আলো আর গাড়িঘোড়ার ভিড়ে যা হেসে উড়িয়ে দেবার মত ব্যাপার, এখানে লোকালয় থেকে বহুদূরে নিবিড় বনের মধ্যে তা ভয়ের মুখোশ পরে সামনে এসে দাঁড়ায়।

অসিতবাবু পকেট থেকে নোটবুক বের করে তাতে কী যেন লিখছেন। মানুষটি বেশ আত্মস্থ, কবিপ্রকৃতির। চারদিকে লেখার উপাদান হিসেবে পরে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কিছু দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তা নোর্ট করে রাখেন। রাত্রিবেলায় পাকা ডায়েরিতে সেসব গুছিয়ে লেখেন। আমার বাঁদিকে একটা পিয়াশাল গাছ, তার গোড়ায় মেটে আলুর না

কিসের যেন লতা। সেদিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ লতাটা যেন খুব হালকা হাওয়ায় একবার কেঁপে উঠল। কী ব্যাপার, এতক্ষণ তো বেশ গুমোট করে আছে আকাশে মেঘ থাকায়, বাতাস এলো কোথা থেকে? চারদিকে তাকালাম, না! বনভূমি একেবারে স্তব্ধনিশ্চল। তবে এই শান্তভাব ঝড়জলের পূর্বলক্ষণ, হয়ত বাতাস উঠবে এখনই।

ঠিক এইসময়েই লিখতে লিখতে অসিতবাবু বলে উঠলেন–এঃ!

মেজকর্তা বললেন—কী হল আপনার?

খোলা নোটবইটা দেখিয়ে অসিতবাবু বললেন-দেখুন না কাণ্ড, বৃষ্টি আসছে বোধহয়। একফোটা জল এসে পড়ল লেখার ওপরে—

তিনি পকেটবুকটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। এক জায়গায় লেখার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে দু-তিনটে অক্ষর ধেবড়ে গিয়েছে। অসিতবাবু আর ঝুঁকি না নিয়ে উঠে গিয়ে লেখার সরঞ্জাম তাবুতে রেখে এলেন। ভালই করলেন। কারণ এর পরেই বেশ মোটা মোটা বিন্দুতে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল।

ঝমঝম বর্ষণ নয়, বিরক্তিকর ছাগলতাড়ানি বৃষ্টি। আমাদের থাকার তাঁবুগুলোর পাশে একটা বড় তাবু খাটানো হয়েছে, সেটাকে আমরা বলি ওয়ার্কিং টেন্ট। মেজকর্তা উঠে পড়ে বললেন—চলুন, কাজের তাঁবুতে গিয়ে বসি। এখানে আর থাকা যাবে না। চেয়ারগুলো হাতে হাতে নিয়ে নিন–

চারদিকে তাকিয়ে দেখি মেঘের স্তর যেন আকাশ ছেড়ে নেমে এসেছে মাটির কাছে, সেজন্য ঘন ছায়ায় ঢেকেছে বনভূমি। বড় রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে পৃথিবীকে এমনি দেখায়, এটাও কি তবে তেমন কিছুরই পূর্বাভাস?

বৃষ্টিটা তখুনি ঝেপে এলো না, মেঘও থমকে রইল আকাশে। কিন্তু বাতাস একটু একটু করে বাড়তে লাগল, নিচু ঝোপ আর লতাপাতা লুটোপুটি করতে লাগল মাঝেমাঝেই। আর সেই হাওয়া বয়ে যাবার শব্দের মধ্যে কীসের যেন একটা ফিসফিস আওয়াজ।

ওস্তাদ লোক বটে ডহরু। আগেই বলেছি চারদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে তার কোনও তাপ-উত্তাপ নেই, সে একজন নিবিষ্টমনা রন্ধনশিল্পী। আমরা তাঁবুর ভেতরে গিয়ে বসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডহরু এসে জিজ্ঞাসা করল, আমরা

চা খাব কিনা। মেজকর্তা বললেন—তা খাওয়া যেতে পারে। কী নির্মলবাবু, হবে নাকি একটু?।

স্যাঁতসেতে মনকে চাঙ্গা করতে চায়ের মত জিনিস আর নেই। এই বিষণ্ণ, মেঘান্ধকার পরিবেশে সকলেরই মন কেমন যেন ভারি হয়ে উঠেছে। সার্ভেয়ার সাহেব বললেনমন্দ কি? হয়ে যাক—

দশমিনিটের মধ্যে এনামেলের মগে চা চলে এল। মেজকর্তা চা নিয়ে বললেন—ডহরু, টিপটিপ বৃষ্টি তো শুরু হয়ে গেল, তুমি রান্না করবে কীভাবে? উনুন নিভে যাবে না? মনে হচ্ছে বৃষ্টি আরো বাড়বে–

—চিন্তা নেই বাবু, রান্নার জায়গায় ছোট একটা ত্রিপল খাটিয়ে নিয়েছি মাথার ওপর। যদি ঝড়জল আরো বাড়ে তাহলে সব সরঞ্জাম নিয়ে আমার তাবুতে ঢুকে যাব, যে তাঁবুতে আমি আর জলধরা থাকি। এখন দু-দিন জলধরা থাকবে না, অনেক জায়গা খালি পাব–

—তাঁবুতে আগুন ধরে যাবে না?

—না বাবু। ভেতরে তো উনুন জ্বালব না, স্টোভেই হয়ে যাবে। বাবু, বিশুয়া কোথায়? এদিকে এসেছে নাকি? তার জন্যও চা বানিয়েছি যে!

বিশুয়া আমাদের জিপের ড্রাইভার। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়েসের সপ্রতিভ ছেলে। মেজকর্তা বললেন—যাবে আর কোথায়? ওদিকেই কোথাও আছে আর কী। বাথরুম করতে গিয়েছে হয়ত। দেখ একটু, আসবে এখন–

পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলে মানুষের মন আশঙ্কায় টানটান হয়ে থাকে। আমরা সকলে নির্বিকার মুখে চা খেতে লাগলাম বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই বুঝতে পারছিলাম প্রত্যেকে ভাবছে—বিশুয়া গেল কোথায়?

দশমিনিট পরে শূন্য মগ নামিয়ে রেখে নির্মলবাবু বললেন—বিশুয়া ফিরে এল কিনা দেখা দরকার। যদিও এ জঙ্গলে বোধহয় তেমন হিংস্র প্রাণী কিছু নেই, তবু আমরা এই কয়েকজন মাত্র তোক রয়েছি, খুব সাবধানে থাকা প্রয়োজন। ডহরুও কিছু জানালো না তো!

অসিতবাবু বললেন—চলুন তো দেখি কী ব্যাপার!

বাইরে এসে দেখি সেই মনখারাপ করে দেওয়া মেঘচাপা আলো আরো গাঢ় হয়েছে। এখন বেলা কতই বা হবে, বারোটা কী সাড়ে বারোটা, তাতেই যেন সন্ধে নেমে এসেছে। ওদিকে নিজের তাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ডহরু কেমন অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

মেজকর্তা বললেন—কী ডহরু, বিশুয়া ফিরল?

—না বাবু। চিন্তার কথা হল দেখছি, কোথায় যাবে বিশুয়া? যদি মাঠ করতেও গিয়ে থাকে, তাতেও তো এত সময় লাগতে পারে না–

এরপর আমরা বিশুয়ার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলের মধ্যে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম। কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। শেষে ডহরুই বলল—আচ্ছা বাবু, বিশুয়া ওদের দলের সঙ্গে লরিতে করে সিমডেগা চলে যায়নি তো? হয়ত ভেবেছে একা বসে থেকে কী করব, যাই ঘুরে আসি–

মেজকর্তা আর নির্মলবাবু এ কথা সমর্থন করলেন না।

জলধর আমাদের জন্য জিপটা রেখে যাচ্ছে বলেছিল, এবং সে খুব দক্ষ ও চৌকস কর্মচারী। ভুল করে জিপের। ড্রাইভারকে নিয়ে চলে যাবে বলে মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, কিছু ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে থাকতে পারে। শেষমুহূর্তে কোনও দরকারেও হয়ত বিশুয়াকে সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন। হয়েছে, জলধর ভেবেছে বিশুয়া আমাদের জানিয়েছে, আবার বিশুয়া মনে করেছে জলধর নিশ্চয় আমাদের বলে রেখেছে। এছাড়া তো লোকটার অন্তর্ধানের আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। যাই হোক, আপাতত উদ্বেগ মনেই চেপে রেখে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর ডহরুকে তার রান্নার জিনিসপত্র নিয়ে সত্যি-সত্যিই তাঁবুতে ঢুকে পড়তে হল। হাওয়ার দাপটে মাথার ওপর থেকে ত্রিপল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খোলা উনুনের আগুন জ্বালিয়ে রাখা যাচ্ছে না। পাঁচজনের রান্না অবশ্য তাঁবুর ভেতরেই স্টোভে করে নেওয়া যাবে।

দুর্যোগ আর দুঃসময়ের দুটো রূপ আছে। একটা রূপ আমাদের সন্ত্রস্ত করে, অন্যটা একধরণের বিচিত্র আনন্দের জন্ম দেয়। মানুষ যতই বলুক, সে শুধুমাত্র শান্তির পূজারী

নয়। তাহলে আদিম যুগ থেকে মানবসভ্যতা একটুও অগ্রসর হত না। আরামে গাছের ছায়ায় শুয়ে গান গেয়ে দিন কাটানোর সুযোগ ছেড়ে মানুষ চিরকাল বেরিয়ে পড়েছে অজানার হাতছানিতে। প্রায়ান্ধকার বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমারও গা-ছমছম করা অনুভূতি আর আনন্দ একসঙ্গে হল।

খাওয়া সেরে মেজকর্তা আর সার্ভেয়ার সাহেব কাজের কী আলোচনা করতে ওয়ার্কিং টেন্টে ঢুকলেন। আমি আর অসিতবাবু সিগারেট ধরিয়ে বনের ভেতর পায়চারি করতে লাগলাম। বৃষ্টি এখন পড়ছে না, কিন্তু থেকে থেকে শোঁ শোঁ করে বাতাস জেগে উঠছে। পরক্ষণেই আবার নেমে আসছে আশ্চর্য স্তব্ধতা। আবহাওয়ায় যেন একটু ঠাণ্ডারও ছোঁয়া।

একবার বাতাস একটু থামতেই অসিতবাবু হঠাৎ বললেন কে যেন বনের মধ্যে দিয়ে এদিকে আসছে, পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?

বাতাস তখন থেমে আছে। সত্যিই শুনতে পেলাম ঝরা পাতার ওপর কার যেন ধীর

পদবিক্ষেপ। কে আসছে? কে?

অষ্টাদশ

শুকনো পাতার ওপর মচমচ শব্দ

শুকনো পাতার ওপর মচমচ শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। সূর্যালোকিত দিনে, চারদিকে মানুষের গলার শব্দ আর পাখির ডাকের মধ্যে এই পায়ের আওয়াজ বেশ। কাব্যিক বলে মনে হয়, কিন্তু লোকালয় থেকে দূরে এমন মেঘচাপা আলো আর শোঁ শো হাওয়া বওয়া দুর্যোগের দিনে বুকের ভেতর নাম-না-জানা ভয়ের জন্ম দেয়।

আমাদের উৎকণ্ঠিত আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বিশুয়া–আমাদের জিপের ড্রাইভার।

অসিতবাবু অবাক হয়ে বললেন—আরে, এ তো বিশুয়া! তুমি ছিলে কোথায়?

আমি বললাম-কী ব্যাপার বিশুয়া? কোথায় গিয়েছিলে?

বিশুয়ার চোখমুখে কেমন একটা হতচকিত ভাব। সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি যেন এখানে নেই। গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ কাউকে ডেকে তুললে যেমন হয়।

অসিতবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন-কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

হাতের তালু দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিয়ে বিশুয়া বলল—ওদিকে ওই বনের মধ্যে একটু গিয়েছিলাম, ইয়ে-ঘোট বাইরে করতে। কেন বাবু, কী হয়েছে?

বললাম—এত সময় লাগল? প্রায় তিন কী চার ঘণ্টা। বেড়াচ্ছিলে নাকি?

বিশুয়ার মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় এবং না-বোঝার ভাব ফুটে উঠল। একবার আকাশের দিকে এবং চারধারে তাকিয়ে সে বোধহয় আন্দাজ করবার চেষ্টা করল এখন কতটা বেলা, কিন্তু মেঘলা দিনে সময় বোঝা খুব কঠিন। সে বলল—আমি তত বেশিক্ষণ যাইনি বাবু, এই—পাঁচ কী সাত মিনিট। বেড়ানোর সময় আর পেলাম কোথায়?

অসিতবাবু বললেন—ঠিক আছে। যাও, তুমি খেয়ে নাও গিয়ে। পরে কথা হবে–

বিশুয়া অবাক হয়ে বলল—সে কী, এর মধ্যে রান্নাও হয়ে গিয়েছে! এই তো সবে সকাল।

আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম, অসিতবাবু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন–হ্যাঁ, আজকে একটু তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে গিয়েছে। যাও তুমি–

বিশুয়া চলে যেতে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। অসিতবাবু বললেন কী বলতে যাচ্ছিলেন আপনি? তখন থামালাম বলে কিছু মনে করবেন না–

বললাম—বিশুয়ার জীবনে কোনো আশ্চর্য উপায়ে চারঘণ্টা সময় উপে গিয়েছে। ও ভাবছে এখনো বুঝি সকাল। এ আবার কী ব্যাপার?

–জানি না। কিন্তু ওর ভুল এখনই ধরিয়ে দেবার দরকার নেই। ঘাবড়ে যাবে। দুতিনদিন এই নির্জনে আমরা ক-জন মাত্র আছি, এর মধ্যে বিশুয়ার কিছু হলে খুব মুশকিল।

কিন্তু বিশুয়া অত সহজে বুঝলো না। সে সরল বটে, কিন্তু বোকা নয়। ডহরুর কাছে ঘড়ি নেই, বিশুয়া আমাদের কাছে বারবার এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, এখন ক'টা বাজে। মেজকর্তা আর নির্মল কাঞ্জিলাল ব্যাপারটা শুনেছেন। যেহেতু তারাই কর্তা, আমরা শেষপর্যন্ত বিশুয়াকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। মেজকর্তা বললেন—কী বিশুয়া, তোমার নাকি কী অসুবিধে হচ্ছে, কী ব্যাপার!

বিশুয়াকে দেখলে মনে হয় তার যেন ঘোর লেগে রয়েছে। চোখ-ভাসা-ভাসা, মুখ ঈষৎ হাঁ। প্রশ্নের উত্তরে সে বলল—কর্তা, এখন বেলা কটা হল?

—কেন, সে খোঁজে তোমার কী দরকার?

–বলুন না কর্তা। আমাকে খেতে দেওয়া হল, অথচ এত বেলা তো হবার কথা নয়–

মেজকর্তা একটুখানি ভাবলেন, বুঝলাম তিনি মনে মনে স্থির করছেন কতখানি সত্যকথা বিশুয়া একবারে নিতে পারবে। তারপর বললেন—তা বেশ বেলা হয়েছে, দুটো কী আড়াইটে তো হবেই–

বিশুয়া যেন কেমন হয়ে গেল, বলল—তা কী করে হবে কর্তা? এই তো সবে ওদিককার বনে ঢুকেছিলাম, জলধরা চলে যাবার পরে পরেই। তখন সকাল নটা। এরমধ্যেই বেলা দুটো হয়ে গেল!

–কী করে জানলে জলধর যখন গেল তখন বেলা নটা?

বিশুয়া বলল—আমি আর কী করে জানব বাবু? আপনারাই তো বলাবলি করছিলেন।

মেজকর্তা হেসে বললেন–আসলে কী হয়েছে জানো বিশুয়া, তুমি বনের মধ্যে কোথাও বসে বিশ্রাম করতে গিয়ে

ঘুমিয়ে পড়েছিলে। তাইতে বেলা হওয়া বুঝতে পারোনি–

বিশুয়া বুদ্ধিমান না হোক, বোকা নয়। সে বলল–তাই বলছেন কর্তা? তা হবে হয়ত। কিন্তু তাহলে তো আমার খুব খিদে পেত, তাই না? খিদে পায়নি কিন্তু–

বাচ্চা ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে মেজকর্তা বললেন —এক একদিন অমন হয়, কিছুতেই আর খাওয়ার ইচ্ছে হয় না। এই তো, আমারই পরশু হয়েছিল।

ভাল কর্মচারীর লক্ষণ যদি প্রশ্নহীন আজ্ঞাবহতা হয় তাহলে বিশুয়া একজন গুণী কর্মচারী। মুখের ওপর কোনো কথা না বলে সে চলে গেল বটে, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম তার মনে ধাঁধা রয়েই গেল।

বেলা এগুবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ক্রমেই চারদিক থেকে আরও ঘনিয়ে আসতে লাগল। বৃষ্টি কখনও টিটিপ করে পড়ছে। কখনও বা ঝরঝর করে বেশ এক পশলা বর্ষণ হয়ে যাচ্ছে। বিকেলের চা আমরা কাজের তাঁবুর ভেতরে বসেই খেলাম। ছোটবেলায় ইস্কুলে পড়বার সময়ে ‘আদিম পৃথিবীর

ইতিহাস’ নামে একখানি বই পড়েছিলাম। পাঠ্যতালিকার বাইরেও ভালো সাহিত্য আর সাধারণ জ্ঞানের বই বাবা ডাকমারফৎ আনিয়ে আমাকে উপহার দিতেন। তাতে পড়েছিলাম সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যখন কৃষিকাজ, সভ্যতা বা বিজ্ঞান কিছুই ছিল না, তখন আদিম মানুষেরা দুর্যোগের দিনে গুহার মধ্যে একজায়গায় জড়াজড়ি করে বসে বাইরে প্রাকৃতিক শক্তির মাতামাতি দেখতে। আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই আমরা রক্তের গভীরে অন্ধকারের প্রতি ভয় ও বিস্ময়ের ভার বহন করে চলেছি। অসময়ে অন্ধকার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনের মধ্যে সেই আদিম, যুক্তিহীন ভয় ফিরে এল। মুখে হয়তো কেউই কিছু বললাম না, কিন্তু সকলেই বুঝতে পারলাম ভেতরে আমরা ভালো নেই।

সেই রাত্তিরে বড় অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার মুখখামুখি হলাম। সেই দু’দিন দু’রাত্তিরের কথা ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে, মনে হয়—যা দেখেছিলাম তা সব সত্যি তো?।

বিকেলে চা খাওয়ার সময়েই মেজকর্তা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—জলধর না ফেরা পর্যন্ত আপাতত কাজকর্ম বন্ধ রইল বলেই মনে হচ্ছে। এই আবহাওয়ায় ঘুরে ফিরে

কাজের প্ল্যান তৈরী করারও উপায় নেই।

নির্মলবাবু বললেন—আজ আর কিছুই করা সম্ভব ছিল না। এই বৃষ্টিতে থিওডোলাইটই খাড়া করা যেত না। তবে কাল যদি মেঘ কেটে যায় তবে সাইট সার্ভে একটু এগিয়ে রাখবো। শিখিয়ে দিলে বিশুয়া বা ডহরু আয়না চমকাবার কাজ চালিয়ে দিতে পারবে। দেখা যাক কী হয়—

তাঁবুর দরজা দিয়ে বাইরের জলে ভেজা ঝোপঝাড় আর গাছেদের কালো কালো গুঁড়ি দেখতে পাচ্ছি। জলকণা তাঁবুর ভেতরে ঢুকছে। সেই হাওয়ার দাপটেই তাঁবুর দরজার ভেজা ক্যানভাসের পর্দাটা পতপত্ শব্দ করছে। সেদিকে তাকিয়ে যেন কিছু আত্মগত ভাবেই অসিত বিশ্বাস বললেন—এমন জলে ভেজা বাদলার দিনে ছোটবেলার একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেল। আপনাদের শোনাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে-সব সেকেলে পেঁয়ো গল্প—যাকে বলে ওল্ড ওয়াইভস টেল —তা কি আপনাদের ভাল লাগবে? থাক বরং-

মেজকর্তা চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। এতক্ষণ তিনি নিতান্ত ঝিমিয়ে ছিলেন, এবার গল্পের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তাঁর চোখে উৎসাহের জ্যোতি ফিরে এসেছে। অসিতবাবুর

দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—পেঁয়ো গল্প আবার কী? অমন কিছু হয় না। গল্প দু রকম হতে পারে—ভাল আর খারাপ। আপনার গল্প ভাল হলেই হল।

অসিতবাবু বললেন—এসব গল্পের বোধহয় ঠিক ভাল বা খারাপ হয় না। ছোটবেলার কথা মনে পড়লে মনটা একটু কেমন যেন হয়ে পড়ে, আনন্দও হয়, বিষণ্ণও লাগে। আনন্দটা বেশি হয়। কাজেই আমার তত ভাল লাগবেই। কিন্তু আপনাদের—যাক্, ঘটনাটা বলি।

আমি মেদিনীপুরের মানুষ। দেশের বাড়ি হচ্ছে পানিপারুল গ্রামে, সেখানেই আমাদের বহুপুরুষের বাস। বাবা কাজ করতেন মহিষাদল রাজ এস্টেটে। আমার জন্মও মহিষাদলেই। আবছা আবছা সেখানকার কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে তালগাছের সারি দিয়ে ঘেরা একটা জলে ভরা দীঘির ছবি চোখে ভাসে, তার পাড়ে আমি খেলা করতাম। বেশি বড় দীঘি নয়, কিন্তু তার চারদিকের লতাপাতা আর নির্জনতা জায়গাটিকে কেমন নিভৃত স্বপ্নময় করে তুলেছে। ছবিটা মনে পড়লেই আবার একবার মহিষাদল বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আর কি হবে?

আমার যখন দশ বছর বয়েস, সে সময় বাবা মহিষাদলের কাজ ছেড়ে পানিপারুল ফিরে আসেন। বাবা খুব স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন, হয়ত নিয়োগকর্তার আচরণ তার ভাল লাগেনি। এর পরে আর কখনো উনি পরের চাকরি করেন নি, বাড়িতে থেকেই নিজেদের যা জমিজমা ছিল তার চাষের কাজ দেখতেন আর সকাল-বিকেল গ্রামের ছেলেমেয়েদের দলবেঁধে বারান্দায় বসিয়ে পড়াশুনো দেখিয়ে দিতেন। এর জন্য কারো কাছে টাকাপয়সা কিছু নিতেন না। গ্রামের লোকেরা তাকে মাস্টারমশাই বলে ডাকত।

আমাদের শৈশবে প্রায় সব পরিবারই ছিল একান্নবর্তী। বাড়ির কোনো ছেলে বড় হয়ে বৌ-ছেলেপিলে নিয়ে আলাদা থাকবে, এমন স্বার্থপরতার কথা কেউ সেকালে ভাবতেই পারত না। জ্যাঠামশাই, বাবা আর দুই কাকা ছাড়া আমাদের পরিবারে ছিলেন জ্যাঠাইমা, মা, দুই কাকিমা আর জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনেরা। চাষের কাজ দেখবার জনাদুই কৃষাণও বাইরের দালানে ঘুমোত। আর ছিল বাড়ির পুরনো কাজের লোকেরা। তারা অবশ্য বহুদিন থেকে থেকে বাড়ির লোকের মতই হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্কা ছিল অমিয়বালা, সে দেখেছি জ্যাঠামশাইকেও রীতিমত ধমকধামক করত। তাকে নাকি সে ছোট দেখেছে। জ্যাঠামশাইও মাথা

নিচু করে তা মেনে নিতেন। এমনই চমৎকার ছিল সে সমাজ।

আমার যখন বছর বারো বয়েস তখন আমার জ্যাঠতুতো দিদি সিন্ধুলতার বিয়ে ঠিক হল। পাত্রের বাড়ি শোলপাট্টায়, নামকরা পরিবারের ছেলে, দানধ্যানের বিষয়ে সমাজে খ্যাতি আছে। পাত্রের বাবা উদারপন্থী মানুষ, এ বিয়েতে কিছু গ্রহণ করবেন না। তিনি নাকি বলেছেন-বাড়িতে আমার মা আসছেন, মাকে একখানা লালপেড়ে শাড়ি আর দুমুঠো ডালভাত দেবার ক্ষমতা এ পরিবারের আছে। খামোকা জিনিসপত্র চাইতে গেলে লোকে যে 'বিষ্টু মাইতি ছেলে বিক্রি করল' বলে খ্যাপাবে—তখন কী হবে?

কথাটার পেছনে শুধুই সারল্য বা উদারতা নয়, কিছুটা প্রচ্ছন্ন ধনগর্বও ছিল। কিন্তু বিষ্ণু মাইতি মানুষ এমনিতে খুব ভাল, তাছাড়া এটুকু সামান্য গৌরব করার অধিকার মানুষকে ছেড়ে দিতেই হয়। আর এ কথা তো ঠিক যে, নেহাৎ আমার দিদি খুব সুন্দরী। ছিলেন বলে এখানে বিয়ে ঠিক হয়েছে, নইলে আমাদের মত অতি সাধারণ ঘর থেকে মাইতি মশায় মেয়ে নিতেন কিনা সন্দেহ।

দেশেঘরে যেমন হয়, দল বেঁধে পাড়ার মেয়ে-বৌয়েরা দিদিকে এসে দেখে যেতে লাগলেন। নেমন্তন্ন করে আইবুড়ো ভাত খাওয়াবার ধুম পড়ে গেল। ভালমন্দ খেয়ে দিদি আর পারে না। এমন সময় একদিন এলেন গ্রামের কুঞ্জকামিনী দেবী—সকলের কুঞ্জমাসি। গ্রামের একেবারে প্রান্তে শ্বশুরের ভিটেয় বাস করেন, নিঃসন্তান বালবিধবা। সবাই তার মিষ্টি আর অমায়িক ব্যবহারের জন্য তাকে ভালবাসত। কুঞ্জপিসিমা বাড়িতে ঢুকে উঠোন। থেকে জ্যাঠামশাইয়ের নাম ধরে জোরে ডাক দিলেন কই গোলোক কোথায় গেলে? শুনলাম নাকি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ? তা আমরাও নেমন্তন্ন পাব তো, না কি?

ডাক শুনে মা আর জ্যাঠাইমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় মাদুর পেতে কুঞ্জপিসিকে বসতে দিলেন। পুজো সেরে জ্যাঠামশাই এলেন, বললেন—আসুন দিদি, আজ বিকেলেই তো আপনার কাছে যাব ভেবে রেখেছি। একটু দেরি হয়ে গেল–

কুঞ্জকামিনী বললেন—ওসব জানা আছে। আসলে আমাকে নেমন্তন্নর লিস্টি থেকে বাদ দেবার ইচ্ছে, আমি কি বুঝি না? তা কুঞ্জ কায়েনীকে অত সহজে বাদ দেওয়া যাবে না ভাই, সে কথাটা বলতে নিজে চলে এলুম।

জ্যাঠামশাই হাতজোড় করে বললেন—ও কী কথা দিদি, সত্যিসত্যিই আজ বিকেলে আমি যেতাম। আপনাকে বাদ দিয়ে এ গ্রামের কোনো শুভ উৎসব সম্ভব নাকি!

দিদিকে ভেতরবাড়ি থেকে এনে প্রণাম করানো হল। কুঞ্জকামিনী দিদির চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে বললেন—তোমার ভাল নাম তো সিন্ধুলতা, না খুকি?

মাথা নেড়ে দিদি জানাল-হ্যাঁ।

কুঞ্জপিসি বললেন–যাও মা, ভেতরে যাও। এই তো আর কদিন বাকি, এখন খুব সাবধানে থাকবে। বাড়ির বাইরে একদম বেরুবে না। বিয়ের আগে খুব সাবধানে থাকতে হয় জান তো? যাও

দিদি ভেতরে গেলে কুঞ্জপিসি জ্যাঠামশাইকে ডেকে কাছে বসিয়ে বললেন-গোলোক, তোমার সঙ্গে একটু জরুরি কথা আছে। বস্তুতঃ সেই কথা বলতেই আসা। নইলে আজকে তুমি নেমন্তন্ন করতে যাবে সে তো আমি জানতামই—

জ্যাঠামশাই কুঞ্জপিসির দিকে একমুহূর্ত স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন—নেমন্তন্ন করতে যাবো, সেটা যে জানতেন তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আজই যে যাবো তা কী করে জানলেন?

কুঞ্জকামিনী সামান্য হাসলেন, বললেন—আমি জানতে পারি।

কুঞ্জকামিনীর বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের গ্রামের লোকেদের মধ্যে নানারকম মত প্রচালিত ছিল। কুঞ্জপিসি নিখুঁতভাবে মানুষের আসন্ন বিপর্যয়ের কথা বলে দিতে পারতেন, অনেকে বলে তিনি নাকি পশুপাখির ডাক শুনেও অনেক কিছু বুঝতে পারতেন—এবং সবক্ষেত্রেই দুর্বিপাক থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা উপায়ও বলে দিতেন। এই কারণেই তাকে সকলে শ্রদ্ধা করতো, মানতো। অমঙ্গলের থার্মামিটার বলে মনে করার চেয়ে সবাই তাঁকে স্নেহময়ী পরিত্রাণকত্রী হিসেবে ভালবাসত। গ্রামর বয়স্ক মানুষেরা বলতেন কুঞ্জপিসীর ছোটবেলায় হিমালয় থেকে একজন সাধু এসে পিসির বাপের বাড়ির গ্রামে কয়েকদিন বাসা বেঁধেছিলেন। কুঞ্জপিসীকে কোলে নিয়ে তাঁর বাবা গিয়েছিলেন সাধুকে প্রণাম করতে। পিসিকে দেখে সাধু অবাক হয়ে

বলেছিলেন—এ তো খুব উচ্চদশার মেয়ে তোমার ঘরে জন্ম নিয়েছে। একটা কথা বলি, মনখারাপ কোরো না। তোমার এ মেয়ের বিয়ে হবে বটে, কিন্তু সংসারধর্ম এর কপালে লেখা নেই। তার বদলে এক সুন্দর, দিব্য জীবন তোমার মেয়ে লাভ করবে। কিছু ক্ষমতা এ নিয়েই জন্মেছে, কিছু ক্ষমতা আমি দিয়ে যাচ্ছি। বহু মানুষের উপকার করতে পারবে তোমার এই মেয়ে।

আর ঠিক এই কারণেই কুঞ্জকামিনী আমাদের গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারো কোনো দুঃসময়ে তিনি খবর না দিলেও এসে দাঁড়াতেন, একটা অদ্ভুত কিছু ভবিষ্যৎবাণী করতেন, এবং তা অবধারিতভাবে ফলে যেত। সিদ্ধবাক হিসেবে কুঞ্জপিসির একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল। মাধবখুড়ো জব্বলপুর যাবার জন্য বাক্সবিছানা গুছিয়ে বের হচ্ছিলেন, গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাতে মালপত্র তুলে তিনি দরজায় তালা লাগাচ্ছেন, এমন সময় কুঞ্জকামিনী বামুনপাড়া যাবার পথে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—কী ব্যাপার মাধব? কোথাও যাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে–

মাধবখুড়ো তালাতে চাবি ঘুরিয়ে একবার টেনে দেখে ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন–হ্যাঁ দিদি। জব্বলপুরে বড়ছেলেটা

কাজ করে, বহুদিন থেকে তার কাছে যাব যাব ভাবছি। যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। তা এবার একটু সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এমন সময়ে এলেন দিদি, একটু বসতেও বলতে পারলাম না, বড় খারাপ লাগছে–

কুঞ্জকামিনী একবার আকাশের দিকে তাকালেন, চোখ বুজে কী ভাবলেন, তারপর বললেন-না মাধব, তোমার এখানে একটু বসেই যাই। দরজা খোলো—

মাধবখুড়ো অস্বস্তিতে পড়লেন। এ কেমন কথা বলছেন কুঞ্জকামিনী? এক্ষুণি না রওনা হলে বারো মাইল দূরের শহরে গিয়ে বাস ধরতে পারবেন না, আর বাস না পেলে জংশনে গিয়ে মেল ট্রেন পাবেন না। এদিকে কুঞ্জকামিনীর কথাও অমান্য করা যায় না। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তার, যা বলেন তা খেটে যায় বলেও নামডাক আছে। মাধবখুড়ো বিব্রত হয়ে বললেন—আমার বাড়িতে বসবেন এ তোত আমার সৌভাগ্য। কিন্তু দিদি, অপরাধ নেবেন না, এখনই না বেরুলে যে আমি ট্রেন পাবো না—

হিমশীতল গলায় কুঞ্জকামিনী বললেন—তোমাকে ট্রেন পেতে হবে না। তোমার যাওয়া বাতিল। কেন খামোকা বকাচ্ছ

মাধব? দরজা খুলে দাও, বসি—

এবার মাধববুড়ো ভয় পেয়ে গেলেন। কুঞ্জকামিনীর চোখে কী এক অনির্দেশ্য রহস্যের ছায়া। এ মানুষের কথা অমান্য করা যায় না। তিনি আবার দরজা খুলে বাড়ির ভেতরে। ঢুকলেন, তালপাতার চাটাই এনে বসতে দিলেন কুঞ্জকামিনীকে। বললেন—কী ব্যাপার, দিদি।

–কীসের কী ব্যাপার?

—আমাকে যেতে বারণ করলেন কেন?

কুঞ্জকামিনী একটু রাগত স্বরে বললেন–বেশ করেছি বারণ করেছি। গুরুজন মানুষের কথা না হয় শুনলেই। অত কৈফিয়ৎ চাইছ কী জন্যে? আর যদি একান্তই যেতে ইচ্ছে করে তাহলে বেরিয়ে পড়, গাড়ি তো দাঁড়িয়েই আছে—

গাড়োয়ান নিবারণ ঘরামি এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল —-খুড়োমশাই, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, এর পরে হলে আর বাস ধরাতে পারব না–

মাধববুড়ো একটু ইতস্তত করলেন, একবার কুঞ্জকামিনীর দিকে তাকালেন, তারপর বললেন–ইয়ে, নিবারণ, আজ আর আমার যাওয়া হবে না। তুমি বরং মালপত্রগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে দাওয়ায় এনে রাখ–

নিবারণ অবাক হয়ে বলল—যাবেন না বাবু?

—না নিবারণ, একটু অসুবিধে ঘটেছে। তুমি মালগুলো নিয়ে এস—

মাধবখুড়ো শেষপর্যন্ত আর সত্যিই যাচ্ছেন না দেখে কুঞ্জকামিনী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–ভাল করলে মাধব, নইলে তোমার ক্ষতি হত। বাধা আছে। উঠি তাহলে। পরশু বা তরশু তোমার সঙ্গে দেখা হবে

–পরশু বা তরশু? কেন বলুন তো? দেখা করতে বলছেন আমাকে?

-আমি কিছুই বলছি না, তুমি আপনিই যাবে—

মাধবখুড়ো আর কথা বাড়াতে সাহস করলেন না।

কুঞ্জকামিনী যেতে গিয়ে উঠোনের মাঝখানে থেমে পেছন ফিরে বললেন–সাতষট্টি হত, কিন্তু এখন ছেষট্টি হবে।

এই শেষের কথাটা মাল এনে নামিয়ে রাখবার সময় নিবারণ ঘরামিও শুনে ফেলেছিল, সে-ই পরে ব্যাপারটা সবাইকে বলে। নইলে কেবল মাধবখুড়োর কথা লোকে বিশ্বাস করতে সময় নিত। মাধবখুড়োর যাত্রা স্থগিত হবার তিনদিন পর গ্রামের একমাত্র মণিহারী দোকানের মালিক সুদর্শন আদক উত্তেজিত অবস্থায় কালীতলার পাশার আড্ডায় এসে হাজির হল। অনেকখানি পথ হহ করে হেঁটে আসায় সে হাঁপাচ্ছে। বিধু নন্দ বললেন—কী হল সুদর্শন? কী হয়েছে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, মাধবখুড়া কি গ্রামে রয়েছে? তার তত ছেলের কাছে যাবার কথা, গিয়েছে কি?

তার কথায় রহস্যের গন্ধ পেয়ে গ্রামবৃদ্ধেরা পাশা ছেড়ে তাকে ঘিরে ধরল। বিধু নন্দ বললেন—কেন, তুমি জানো না?

সুদর্শনের মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল—আমি কিছুই জানি না, দোকানের জন্য মাল কিনতে কলকাতায়

গিয়েছিলাম, পাঁচদিন পর এই বাড়ি ফিরছি। মাল আসছে পেছনে পার্সেলে। মাধবখুড়ো কেমন আছেন? তার তো ছেলের কাজের জায়গায় যাবার কথা ছিল জব্বলপুরে, গিয়েছে নাকি?

ধীরেন দলুই বললেন—সে এক মজার ব্যাপার হয়েছে বাপু। না, তার যাওয়া হয়নি। কুঞ্জদিদি তাকে আটকে দিয়েছেন।

—কুঞ্জদিদি? কীভাবে?

–বেরুবে বলে মাধবখুড়ো গাড়ি ডেকে তাতে মালপত্র তুলে দরজায় তালা লাগিয়ে ফেলেছিল। সে সময় কুঞ্জদিদি বুঝি যাচ্ছিলেন সামনে দিয়ে। তিনি মাধবখুড়োকে যেতে বারণ করেন। জানো তো, কুঞ্জদিদির কথা গায়ে কেউ অমান্য করতে সাহস পায় না। মাধবখুড়োও যাওয়া বন্ধ করেছে। কেন বল তো?

উত্তরে বগলের তলা থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে মেলে ধরল সুদর্শন আদক।

সকলে ঝুঁকে পড়ল কাগজখানার ওপর।

ঊনবিংশ

কাগজখানা যুগান্তর

কাগজখানা যুগান্তর। তার প্রথমপাতায় বড় বড় করে ছাপা হয়েছে এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সংবাদ—বিলাসপুরের কাছে মেল ট্রেন উলটে ছেষট্টিজন যাত্রীর মৃত্যু। তারপরে ছবিসহ বিপর্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ইঞ্জিনের ঠিক পরের দুটো বগিতে প্রায় কেউই রক্ষা পায়নি। ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটেনি এর আগে।

বিধু নন্দ কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন—কুঞ্জদিদি ভাগ্যিস আটকেছিল খুড়োকে!

সুদর্শন বলল—কুঞ্জপিসি মাধবখুড়োকে আটকেছিল! কী

রকম?

ধীরেন দলুই বলল—কী রকম তা তো জানি না, তবে যেতে দেয়নি। দাঁড়াও, ওই যে নিবারণ ঘরামি যাচ্ছে, ওর গাড়িতেই যাচ্ছিল খুড়ো। ওর কাছ থেকেই আমরা ব্যাপারটা প্রথমে জানতে পারি। ওহে ও নিবারণ, একবার এদিকে শোনো ত বাবা–

মাধবখুড়োর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় ইদানীং গ্রামে নিবারণের খ্যাতি আর চাহিদা বেড়েছে খুব। নিস্তরঙ্গ গ্রামের জীবনে এমন মজার কাণ্ড কমই ঘটে। ফলে প্রায় রোজই বিভিন্ন আচ্ছায় আর গিন্নিদের মজলিশে তার ডাক পড়ে, সমস্ত বিবরণটা বারবার শোনাতে হয়। কাহিনীর মূল আদলটা ঠিক রেখে সে শ্রোতাদের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান রাখার জন্য শ্রোতা যদি আপত্তি করেও নিবারণ, এ ঘটনা আবার কোথা থেকে এল? এটা তো আগে বলনি—' অমনি নিবারণ হাতজোড় করে হেসে বলে—'বয়েস কি কম হল কর্তা? সব কথা একবারে মনে পড়ে না'–

নিবারণ কাছে আসতে ধীরেন দলুই বলল—এই যে নিবারণ, সুদর্শন আদক বাড়ি ছিল না, জানো তো? আজকে

এই ফিরল। ওকে একবার মাধবখুড়োর সেদিনের ঘটনাটা শুনিয়ে দাও তো—

পরম আহ্লাদিত হয়ে নিবারণ বলতে শুরু করল, এবং পুনরপি কিছু নতুন তথ্য ঢুকিয়ে কাহিনীর শেষে বলল—তারপর বাবু উঠোন পার হয়ে দরজার কাছে গিয়ে কুঞ্জপিসিমা বললেন—সাতষট্টি হত, কিন্তু ছেষট্টি হবে। এর মানে কিছু বুঝতে পারলাম না বাবু। মাধবখুড়োও চুপ করে রইলেন, কুঞ্জপিসিকে কে ঘাঁটাবে?

সুদর্শন আদক মনোযোগ দিয়ে নিবারণের গল্প শুনছিল, এর আগে সে এ কাহিনী শোনেনি, এবার আশ্চর্য হয়ে বলল—ছেষট্টিজনের কথা বললেন কুঞ্জপিসি? ঠিক বলছ?

–আমি ঠিক বলছি কর্তা। তবে জন-টন জানি না, সাতষট্টি হত, কিন্তু ছেষট্টি হবে'—এই কথা বলতে শুনেছি। এর মানে কী কর্তা? কিছু কি বুঝেছেন?

উত্তরে বিধু নন্দ বললেন—বোঝাবুঝির কিছু নেই, একেবারে জ্বলন্ত প্রমাণ ওই কাগজে ছাপা হয়েছে। তুমি তো পড়তে জানো না, শোনো তোমাকে বলি। ওই কাগজে ছাপা

হয়েছে যে, যে রেলগাড়িতে মাধবখুড়োর যাবার কথা ছিল সে গাড়ি মধ্যপ্রদেশের একজায়গায় লাইন থেকে উলটে পড়ে গিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে ছেষট্টিজন, যদি বারণ না শুনে মাধবখুড়ো যেতেন, তাহলে মৃতের সংখ্যা হত সাতষট্টিজন? বুঝলে? এই ঘটনাটা ঘটবার চার-পাঁচদিন আগেই কুঞ্জপিসি জানতে পেরে গিয়েছিলেন

শুনতে শুনতে নিবারণের চোখ ক্রমেই গোলগোল হয়ে উঠছিল। জিনিসটা এতক্ষণে তার মাথায় পুরোপুরি তাৎপর্যের সঙ্গে প্রবেশ করেছে। সে পেছন ফিরে হহ করে হাঁটা দিল গ্রামের ভেতরদিকে। বোঝা গেল অচিরাৎ এই নবতর সংযোজন গ্রামবাসীদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হবে। সুদর্শনও বসে পড়ল আড্ডায়। আবার আলোচনা জমে উঠলো।

এই হচ্ছেন কুঞ্জপিসি। কত গল্প আছে তাকে ঘিরে।

সিন্ধুলতাকে বাড়ির ভেতরে ফেরৎ পাঠিয়ে কুঞ্জপিসি বললেন—গোলোক, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। তোমার মেয়ের বিয়ে তো সামনের বুধবার, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ বুধবার, সামনের বুধবার বিয়ে।

কেন দিদি?

—বিয়ের সময়ে একটু ছোটখাট অসুবিধে হতে পারে। তাই কথা বলতে এলাম—

জ্যাঠামশাইয়ের মুখ শুকিয়ে গেল। ভবিষ্যৎবাণী করার বিষয়ে কুঞ্জপিসির খ্যাতির কথা সবাই জানে। কী অসুবিধে হবে মেয়ের বিয়েতে? এদিকে সব ঠিকঠাক, নেমন্তন্ন করাও প্রায় সারা হয়ে গিয়েছে। এখন কিছু হলে তো সমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না। বড়মানুষ কুটুম্ব হতে চলেছে, সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে কিছু না একটা বাধা পড়ে।

জ্যাঠামশাই ভীতমুখে বললেন—কী অসুবিধে দিদি? বিয়েটা হবে তো?

কুঞ্জপিসি হেসে বললেন—সে-সব ভয় নয়। বিয়ে ঠিকই হবে, নইলে আমি জানতে পারতাম। গোলোক, তোমার যে বাদুলে মেয়ে তা জানো?

—আজ্ঞে, বাদুলে মানে-বাদুলে বলতে–

–ঝমঝম বৃষ্টির দিনে সিন্ধুলতার জন্ম হয়েছিল, মনে আছে?

—আছে। আপনি এই গাঁয়ের বৌ, আপনি তো সবই জানেন–

–ওর সারাজীবনের ভাগ্যস্থান জলবর্ষণযোগে আক্রান্ত। ঘন বর্ষায় জন্ম, অন্ন প্রাশনের দিনেও বৃষ্টি হয়েছিল—যতদূর আমার মনে পড়ছে। বিয়ের আগে-পরেও ভয়ানক বৃষ্টি হবে, একটু সাবধান থাকা দরকার।

জ্যাঠামশাই বললেন–তা বর্ষাকালে একটু-আধটু বৃষ্টি তো হবেই–

—একটু-আধটুর কথা বলছি না গোলোক। কাল কী পরশু থেকে এমন বর্ষা নামবে যে, শেয়াল-কুকুরও পথে বেরুতে পারবে না। শোলপাট্টা থেকে বর আর বরযাত্রী এসে পৌঁছবে কী করে? অমন বর্ষা হলে ছাঁদনাতলা ভেসে যাবে, রান্নার জায়গা ভেসে যাবে–

–কী করি তাহলে? তারিখ পেছোনোর উপায়ও তো

নেই।

কুঞ্জপিসি বললেন–তারিখ পিছিয়ে লাভ নেই। যেদিন নতুন তারিখ ফেলবে, সেদিনই বৃষ্টিতে সব ভেসে যাবে। বাদুলে লগ্নে মেয়ের জন্ম, ওর জীবনের সমস্ত উৎসব আর বিশেষ দিনেই ভয়ানক বাদলা হবে। তবে ভয় নেই, দেখা যাক কী করা যায়–

জ্যাঠামশাই বললেন—কী করতে হবে বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—এখন কিছুই করতে হবে না। আগে বৃষ্টি নামুক, তারপর দেখা যাবে। আমার গণনা ভুলও হতে পারে

তখনকার মত কুঞ্জপিসিমা বিদায় নিলেন। বাবা-কাকাদের মধ্যে এ নিয়ে কথাবার্তাও হল। কিন্তু কুঞ্জপিসির আশ্চর্য ক্ষমতা জানা থাকা সত্ত্বেও তার এই সাবধানবাণীতে কেউ বিশেষ ভীত হয়েছে বলে মনে হল না। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, কড়া সূর্যের আলোয় চারদিক ভরে আছে। খটখটে শুকনো পথঘাট। হ্যাঁ, কুঞ্জপিসির ক্ষমতা আছে সেটা সবাই মানছে, তবে এবার বোধহয় তার কথা ফলল না।

কেবল জ্যাঠামশাই বারবার বলতে লাগলেন—মনটা ভাল লাগছে না, বুঝলে? কি যে হয়!

বাবা আর কাকারা তাকে সাহস দিতে লাগলেন। প্রয়োজনে বরকে কাঁধে করে নিয়ে আসা হবে।

সেদিন রাত্তিরে ভেতরের বারান্দায় লম্বা সারিতে সবাই খেতে বসেছেন, কাকিমারা পরিবেশন করছেন, হঠাৎ বাড়ির বাইরে কেমন একটা ঘূর্ণিহওয়ার মত উঠল। বাড়ির উত্তর দিকের পাঁচিলের গায়ে ছিল একটা কলাগাছের ঝাড়, সে গাছগুলো একেবারে নুয়ে পড়ল বাতাসের দাপটে। খেতে খেতে জ্যাঠামশাই চমকে উঠে মুখ তুলে তাকালেন। অন্যরাও এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। ওপাশের আমকাঠালের বাগানের ডালপালা আর পাতা কাঁপিয়ে বাতাসের প্রবাহটা ক্রমে মিলিয়ে গেল।

আবার খাওয়া শুরু করে জ্যাঠামশাই বললেন–হঠাৎ এমন বাতাস এল কোথা থেকে!

কেউই উত্তর দিল না। কিন্তু প্রত্যেকের বুকের ভেতরেই

একটা আশঙ্কা চাপ বেঁধে রইল।

মাঝরাত্তিরের পর থেকে বাতাসের দমক যেন একটু বেশি বাড়ল। ঘুম ভাল হল না কারো।

পরের দিন সকালে উঠে সকালে উঠে দেখা গেল আকাশ ঢেকে গিয়েছে ধূসর মেঘে। সূর্যের দেখা নেই। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, সঙ্গে মাঝে মাঝে ধোঁয়ার মত গুঁড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। গতিক ভাল ঠেকছে না।

তবু সকলে আশায় বুক বেঁধে আসন্ন উৎসবের কাজকর্ম করে চলেছিল। যেন ও কিছু নয়, অমন একটু-আধটু মেঘ করেই থাকে, ও কেটে যাবে এখন। কেবল জ্যাঠামশাই কৃষাণ দুজনকে ডেকে বললেন–তোরা হরেন জানার বাড়ি চলে যা দিকি, আমার নাম করে চার-পাঁচখানা বড় আর মোটা ত্রিপল চেয়ে আনবি। ওরা বড় জোতদার, ফসল ঢাকা দেবার জন্য ওদের অনেক ত্রিপল আছে। চাইলেই দেবে'খন। যা–

তখনকার মানুষ একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়াত। হরেন জানা চাইবামাত্র পাঁচখানা ত্রিপল পাঠিয়ে দিলেন। পাড়ার লোক এবং কৃষাণেরা মিলে সেগুলো বাড়ির বিরাট

উঠোন আর পাশে রান্না করার জায়গায় খাটিয়েও ফেলল—–যাতে এই ক-দিন ধরে ক্রমাগত জল পড়ে পড়ে উঠোন পেছল আর কাদায় ভর্তি না হয়ে থাকে। আমাদের গ্রামের মাটি সাধারণভাবে এঁটেল ধরণের, একবার কাদা তৈরি হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু এই অগ্রিম সাবধানতা বিশেষ কাজে লাগল না। সারাদিন ধরেই হাওয়ার জোর বাড়তেই লাগল, বিকেলের দিকে মেঘের ছায়ায় চারদিক ঘোর কালো হয়ে গেল, বৃষ্টি নামল ঝমঝম করে। আকাশপাতাল ভাসিয়ে এই প্রলয়ের বৃষ্টি চলল সারারাত বাড়ির কারো রাত্তিরে ঘুম হল না। পরদিন ভোর হল বটে, কিন্তু আলো ফুটল না ভাল করে। সমস্ত গ্রাম একটা বিশাল কাদার দহ হয়ে আছে। ভয়ঙ্কর পেছল এঁটেল মাটির কাদা। এই কাদা থাকলে বাইরের অতিথি দূরের কথা, গ্রামের লোকের চলাচলই বন্ধ হয়ে যাবে।

জ্যাঠামশাই একটুও দেরি না করে কৃষাণ দুজনকে বললেন-রামু, চরণ, তোমরা এক্ষুণি কুঞ্জদিদির বাড়ি চলে যাও। দিদিকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এস এখানে। লাঠি নিয়ে যাবে। দুজনে শক্ত করে লাঠির দুদিক ধরে থাকবে, কুঞ্জদিদিকে ধরতে বলবে মাঝখানটা। নইলে উনি এই পেছল পথে আসতে পারবেন না। যাও—

মাঝেমাঝে বৃষ্টি সামান্য ধরে আসছে, তারপরেই আবার মুষলধারে শুরু হচ্ছে। এরই মধ্যে দেখা গেল কৃষাণদের সঙ্গে কুঞ্জপিসিমা আসছেন! দশমিনিটও তো হয়নি, কী ব্যাপার! জ্যাঠামশাই এগিয়ে গিয়ে বললেন—আরে! এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে তোমরা! আসুন দিদি, আসুন—

চরণ বলল—আমাদের পুরো রাস্তা যেতে হয়নি কর্তা। মাঝপথে গিয়েই দেখি মা-ঠাকরুন আসছেন।

বোয়াকের ধারে কাদামাখা পা ধুয়ে কুঞ্জপিসি ভেতরের বারান্দায় এসে বসলেন, বললেন-গোলোক, বৃষ্টির বহর দেখে তোমার এখানে আসবার জন্য আমি নিজেই। বেরিয়ে পড়েছিলাম। এ বৃষ্টি চার-পাঁচদিনের আগে থামবে না। পাঁচদিনের দিনও যদি থামে, তাহলেও তোমার কাজ আটকে যাবে। বৃষ্টির পর ভাল করে রোদ্র উঠতে আরা। একটা দিন লাগে, কাজেই কাদা শুকোবে না পথে-ঘাটে–

মেজকাকা বললেন-কাদা কোনো কী বলছেন, আমি তো ভাবছি একটা বন্যা-টন্যা না য়ে যায়!

কুঞ্জপিসি বললেন–কাজেই এই বৃষ্টি যেভাবেই হোক কালকের ভেতর থামা দরকার–

তারপর চারদিকে ভিড় করে আসা বৌ-ঝিদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বৌয়েরা আর মেয়েরা, তোমাদের বলি বাচ্চারা—আমি এখন দুদিন তোমাদের বাড়ি থাকব। একবেলা দুটি আলোচালের ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দিলেই হবে। রাত্তিরে একটুখানি দুধ। কেমন? আর বড়বৌমা, তোমার মেয়ের নীলরঙের শাড়ি আছে কি? নিয়ে এসে তো–

অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে জ্যাঠাইমা বললেন—আজ্ঞে, নীলশাড়ি-মানে কেমন নীল?

যে কোনো রকম নীল হলেই চলবে, তবে হালকা বা আকাশী নীল হলেই ভাল হয়–

—অন্য রঙ হলে হবে না দিদি?

—না, নীল চাই।

সে সময়ে গ্রাম্য কিশোরী মেয়ের কটাই বা শাড়ি

থাকত? তার মধ্যে নীলরঙের কোনো শাড়ি নেই। পনেরো কি কুড়ি মিনিটের মধ্যে খোঁজা শেষ। ম্লানমুখে মেজকাকিমা এসে বললেন—সিন্ধুলতার কোনো নীলশাড়ি পাওয়া গেল না দিদি। আমাদের বা অন্য কারো কাপড় হলে চলবে?

দুর্মুখ বলে গ্রামে কুঞ্জপিসিমার অখ্যাতি ছিল। মেজকাকিমার কথা শুনে তিনি রেগে গিয়ে বললেন—কী করে হবে? বিয়েটা তোমার না সিন্ধুলতার?

'এমাঃ!' বলে কাকিমা থতমত খেয়ে থেমে গেলেন, যদিও তিনি বুঝতে পারলেন না যার বিয়ে তার সঙ্গে শাড়ির কী সম্বন্ধ। কুঞ্জপিসিমা চোখ বুজে একটুখানি ভাবলেন, যেন ধ্যান করছেন, তারপর তাকিয়ে বললেন—আছে।

জ্যাঠামশাই গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন—কী আছে দিদি? -নীল শাড়ি আছে। আস্ত আছে কিনা জানি না, তবে আমার হাতখানেক লম্বা একটা টুকরো হলেও চলবে। সিন্ধুর পুতুলের বাক্স খুঁজে দেখ— ' বছরদুয়েক হল দিদি আর সেভাবে পুতুল নিয়ে খেলে না। তার পুতুলের বাক্স কোথায় পড়ে রয়েছে কে জানে। কিন্তু সবাই মিলে তোলপাড় করে খুঁজে চিলেকোঠায় ভাঙাচোরা আসবাব রাখার জায়গা থেকে সেটা বের করে

আনল। প্রথমে বাক্স খুলে দেখা গেল কিছু কাঁচের রঙ্গীন চুড়ি, কাঠের আর মাটির পুতুল, সোনালি আর রূপোলি রাংতা, তাছাড়া। বাচ্চাদের খেলবার কিছু টুকিটাকি জিনিস। এসব সরিয়ে তার নিচে পাওয়া গেল এতক্ষণ যা খোঁজা হচ্ছে তাই। বাক্সের একদম তলায় চারভাজ করে পাতা হালকা নীলরঙের একটুকরো কাপড়। জ্যাঠামশাই বললেন আরে! এটা তো সেই পাঁচবছর আগে পুজোয় খুকিকে কিনে দিয়েছিলাম। আমারই তো মনে নেই, দিদি কী করে জানলেন?

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না, কেউ উত্তর আশাও করে না। কুঞ্জপিসিমা কাপড়ের টুকরোটা হাতে নিয়ে তার পাট খুলে বললেন—বাঃ, এই তত বেশ হয়েছে। এতেই কাজ চলে যাবে। হ্যাঁ, কে যেন জিজ্ঞেস করছিল নীল ছাড়া অন্য রঙে কাজ চলবে কিনা? না, তা চলবে না এই কারণে যে, আকাশের রঙ তো নীল, সেই রঙ মেঘে আর বর্ষায় ঢেকে গিয়েছে—আবার সেই নীল ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাইরে তখনও ঝমঝম করে বৃষ্টি চলেছে। কুঞ্জপিসিমা বারান্দার ধারে এসে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জলের ধারায় কাপড়টুকু ধরে ভাল করে ভিজিয়ে নিলেন। জলে ভিজে। কাপড়ের রঙ কেমন গাঢ় হয়ে এল। আটপৌরে একটু মোটা

কাপড়, টপটপ করে জল ঝরে পড়ছে তার থেকে। কুঞ্জপিসিমা কিন্তু সেটা নিঙড়োলেন না, দু-আঙুলের টিপে ধরে থেকে বললেন—চট করে মাটির চারটে তাল বানিয়ে ফেল দিকি। তারপর তাতে শক্ত করে চারটে বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দাও। এবার ওই চারটে কঞ্চিতে এই কাপড়টা টান টান করে বাঁধ। দেখতে হবে যেন ছোট্ট সামিয়ানা, বুঝেছ?

পাঁচমিনিটের ভেতর অন্দরমহলের দালানে নীল কাপড়ের খেলনা সামিয়ানা খাটানো হয়ে গেল। ঝি-চাকর-কৃষাণ সমেত বাড়ির সবাই এসে দাঁড়িয়েছে ভিড় করে। কুঞ্জপিসিমা সাধারণভাবে ভিড়টাকে উদ্দেশ করে বললেন–অর্ধেক কাজ শেষ। এই কাপড়টাকে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ফেলতে হবে, তাহলেই আবার বরাদুর আর নীল আকাশ বেরিয়ে পড়বে। নিড়োতে পারবে না, তবে প্রয়োজন হলে পাখা নিয়ে হাওয়া দিতে পারো। এই ঘোর বর্ষায় বাতাসে জল ভরে আছে, এমনিতে শুকোতে চাইবে না। তাতে আবার মোটা কাপড়

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে দুদিক থেকে দুজন হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে বসে গেল। কুঞ্জপিসিমা জ্যাঠামশাইকে বললেন—গোলোক, তোমার কৃষাণ দুজনের

নাম যেন কী? রামু আর চরণ, তাই না? ওদের বল একটা বেশ বড় দেখে কোলাব্যাঙ ধরে আনতে-

এ হুকুম পালন করতে সামান্য সময় লাগল। রূদ্ধশ্বাসে ভিড়টা অপেক্ষা করছে। চরণ একটু বাদে একখানা মোটাসোটা কোলাব্যাঙ ঠ্যাঙ ধরে ঝুলিয়ে আনল। জ্যাঠামশাই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কুঞ্জপিসির দিকে তাকালেন, বললেন—এবার দিদি?

—তোমাদের বাড়ির পেছনে কচুগাছের ঝোপ আছে না?

—হ্যাঁ দিদি।

-সেখানে এটাকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে আবার চারটে কঞ্চি পুঁতে এটার চারপায়ে সুতুলি দিয়ে বেঁধে চিৎ করে শুইয়ে রাখ। সাবধান! যেন ব্যথা না পায় বা মরে না যায়। গায়ে বৃষ্টির জল পড়লে ভালই থাকবে।

কৃষাণ দুজন লাফিয়ে পড়ল উঠোনে। গোলার পিঁড়ির গায়ে কঞ্চির গোছ বেঁধে রাখা ছিল, সেখান থেকে সাইজমাফিক চারটে খুলে নিয়ে তারা ব্যাঙ হাতে কচুবনের

দিকে চলে গেল। কুঞ্জপিসি পেছন থেকে হেঁকে বললেন–খুব শক্ত করে বেঁধো না কিন্তু, তাহলে ওর পা ভেঙে যাবে। কোন প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। নিজের প্রয়োজনে তো নয়ই। আবার আলগা রাখলে খুলে পালিয়ে যাবে। বুঝে করো–

সারা দিনরাত পালা করে দুজন বসে নীল সামিয়ানায় হাওয়া করতে লাগল। কিন্তু। বর্ষণমুখর দিনে ওই ভারি কাপড় কি অত সহজে শুকোয়? টপটপ করে জল পড়া বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু পুরো জিনিসটা' ঝুপসি হয়ে ঝুলে রইল। আর সে ব্যাঙু তো চার পা বাঁধা হয়ে পড়ে রইল কচুতলায়। খুব একটা খারাপ আছে বলে মনে হল না। মাঝে মাঝে আমরা ছেলেপুলেরা তাকে দেখতে যাচ্ছিলাম, দেখছিলাম তার ফ্যাকাসে সাদা পেটের ওপর বৃষ্টির ফোটা ঝরে পড়ছে। আমাদের দেখলেই সে গলা ফুলিয়ে জাওকো, জাওকো' করে ডাকছিল। সমস্ত বাড়িতে বেশ একটা উৎসব-উৎসব পরিবেশ। বড়রা নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন। ছোটরা অত বোঝে না, তারা মজা পেয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছিল।

রাত আটটার মধ্যে বাড়ির সকলের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল। আটটা মানে পাড়াগাঁয়ের অনেক রাত, বিশেষ করে বর্ষাভেজা দিনে। কুঞ্জপিসিমা শুধু একটু দুধ খেলেন—আর

ঘরে তৈরি সন্দেশ। বাড়ির গরুর দুধের ছানা থেকে মেজকাকিমা বানিয়ে দিলেন। পাথরের বাটিতে সন্দেশ আর পাথরের গেলাসে দুধ। খাওয়া হলে কুঞ্জপিসি বললেন–এবার শোয়ার আগে একটা ছোট্ট কাজ বাকি। একটা কাঠির আগায় কিছুটা ন্যাকড়া জড়িয়ে তাতে তেল ঢেলে আনো তো–

কাকিমা জিজ্ঞাসা করলেন-তেল? কী তেল দিদি?

–যা তোক আনো না। রেড়ির তেল হলে ভাল হয়—

সারাদিন নতুন কাণ্ড দেখার পর বাড়ির লোকজন কোনো কিছুতেই আর তেমন করে উত্তেজিত হচ্ছিল না। কে একজন একটা ন্যাকড়ার মশাল করে আনল। কুঞ্জপিসি সেটাকে হাতে নিয়ে বললেন-এটাতে আগুন ধরিয়ে দাও

ন্যাকড়াটা ভাল করে জ্বলে উঠলে বারান্দায় পুবমুখখা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি জ্বলন্ত আগুনের গোলাটা কাঠিসুদ্ধ তুলে ধরে ঘোরাতে লাগলেন, যেন অদৃশ্য কাকে কী ইঙ্গিত করছেন। বিড়বিড় করে কী বলতে লাগলেন। কী বলছেন ভালো বোঝা গেল না, কিন্তু মনে হল যেন কাউকে বকাবকি করছেন।

ঘোরানো শেষ হলে মশালটা বারান্দার নিচে জমা জলে ফেলে দিলেন কুঞ্জপিসি, তারপর সবার দিকে ফিরে বললেন– সূর্যকে ওঠার কথা মনে করিয়ে দিলাম। আগুন দেখে তার যদি জ্বলে ওঠবার কথা মনে পড়ে–

নীল সামিয়ানার দু'ধারে দুজন বসে সমানে পাখা দিয়ে বাতাস করে চলেছে। জ্যাঠামশাই নির্দেশ দিয়েছেন–রাত্তিরে ডিউটি বদল করে কাজ চলবে।

রাতভোর ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ শুনলাম ঘুমের মধ্যে।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে প্রথমেই যা মনে হল, তা হল এই যে, পরিবেশটা কেমন যেন একটু অন্যরকম। গতকালকের চেয়ে আজ যেন কী একটা অদলবদল ঘটে গিয়েছে। ঘুমচোখে প্রথমটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না। ঘুমের আবেশ কাটতেই বুঝতে পারলাম।

বৃষ্টির শব্দ থেমে গিয়েছে বাইরে।

বিছানা থেকে একলাফে নেমে বাইরে এসে দেখি বৃষ্টি

একেবারে থেমে গিয়েছে। আকাশ থেকে মেঘ সম্পূর্ণ সরে যায়নি বটে, কিন্তু এই পাতলা ঘোলাটে আবরণ কেটে গেলেই নীল আকাশ বেরিয়ে পড়বে তা বোঝা গেল। কুঞ্জপিসিমা কম্বলের আসনের ওপর বসে আছেন, তার মুখে একগাল হাসি। তাকে ঘিরে বাড়ির কর্তারা আর মেয়েরা সবিস্ময় জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কুঞ্জপিসিমা বললেন—আমি কিছু জানি না বাবা। ভগবানকে ডেকে বলেছিলাম বৃষ্টিটা থামিয়ে দাও, নইলে সিন্ধুলতার বিয়ের কাজে অসুবিধা হবে। সিন্ধু তো আমারই মেয়ের মত। তার জীবনের একটা আনন্দের দিনে কারো যেন কোন কষ্ট না হয় তার জন্য ভগবানকে ডেকেছিলাম। ভগবান শুনলেন, এইটুকুই বলতে পারি–

মেজোকাকা বললেন—কিন্তু দিদি, এইসব যা যা করলেন —

কুঞ্জপিসি হেসে বললেন—ওসব কিছু নয়। ওসব হল কিছুটা ভড়ং আর কিছুটা আমাদের দেশী তুক। বুড়োবুড়িরা অনেকেই জানে। কাজ হয়েছে প্রার্থনায়, তুকে নয়।

বলাবাহুল্য তার কথা কেউই বিশ্বাস করল না। কুঞ্জপিসিমা বললেন–কাপড়ের টুকরোটা নিয়ে এসে তো, দেখি

কতদূর শুকোলো–

সারারাত পালা করে জেগে বাতাস করার জন্যই হোক, বা সত্যিসত্যিই কুঞ্জপিসিমার তুকের গুণে হোক, ঐ মোটা কাপড়ের টুকরো কিন্তু সত্যিই খটখটে শুকনো হয়ে গিয়েছে। কুঞ্জপিসিমার নির্দেশে চরণ গিয়ে কচুতলায় শুয়ে থাকা ব্যাঙের বাঁধন খুলে দিল। সেটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। একদিন একরাত আটকা থেকে ব্যাঙটা বিশেষ নির্জীব হয়ে পড়েনি।

কুঞ্জপিসিমা বললেন—সূর্যকে কেমন আলো দেখিয়েছিলাম বল তো? আসলে মেঘবৃষ্টির দিনে সূর্য মাঝে মাঝে উঠতে ভুলে যায়, ঘুমিয়েই থাকে। ন্যাকড়ার আগুন দিয়ে আমি যা করলাম তাকে বলে পোড়া দেখানো। পোড়া দেখলে সূর্যের ওঠবার কথা মনে পড়ে যায়—

আমি তখন ছোট, কী প্রশ্ন করা উচিত বা উচিত নয় সে বিষয়ে জ্ঞান ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু পিসিমা, আপনি যে পোড়া দেখানোর সময় কীসব বলছিলেন, তা কি কোনো মন্ত্র?

কুঞ্জপিসিমা ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তোমার সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন! বৃষ্টি থেমে গিয়েছে তো? ব্যস্, আর কী চাই?

একটু পরেই রোদ্র উঠল। প্রথমে স্নান, তারপর কড়া রোদুর। কালকের ওই প্রলয়ের বর্ষণের পর আজকেই এমন রোদুর উঠবে কেউ কল্পনা করতে পারে নি। কুঞ্জপিসিমা সম্বন্ধে গল্পের ঝুলিতে আর একটা ঘটনা যোগ হল। কাদা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেল দুদিনের মধ্যে। নির্বিঘ্নে মিটে গেল সিন্ধুদিদির বিয়ে।

গল্প শেষ করে অসিত বিশ্বাস একটু থামলেন। তাঁবুর পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরে, যেখানে ভেজা ঝোপঝাড় আর গাছের গুঁড়ি মায়াময় দেখাচ্ছে বিষম আলোয়। তার চোখে স্মৃতিমেদুরতার নরম চাউনি।

মেজকর্তা বললেন—আপনি খামোকই ভয় পাচ্ছিলেন বিশ্বাসবাবু, আমরা যতই সভ্য আর আধুনিক হই না কেন, এসব গল্পের মার নেই

অসিতবাবু বললেন–কী জানি, তাই হবে হয়ত। আমার

ছোটবেলার গল্প বলে আমার ভাল লাগে। কিন্তু অন্যদের—যা গে, ভাল লাগলেই ভাল।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—এ গল্পের একটা ছোট্ট উপসংহার আছে। সেটা বলি। আমার সেই জ্যাঠতুত দিদি সিন্ধুলতা বিবাহিতজীবনে খুব সুখী হয়েছিলেন। শিবের মত স্বামী, সুন্দর আর বাধ্য ছেলেমেয়ে। ভরভরন্ত সংসার রেখে সিন্ধুদিদি মাত্র চল্লিশ বছর বয়েসে সবাইকে কাঁদিয়ে মারা যান। এবারও তার সম্বন্ধে কুঞ্জপিসিমার ভবিষ্যৎবাণী ফলে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন সিন্ধুদিদি বাদুলে মেয়ে, দিদির জীবনের সব প্রধান দিনগুলোতে বর্ষণযোগ আছে। দিদি যেদিন মারা যান সেদিনও আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল। জীবনের শেষ প্রধান দিনে। তখন আর কুঞ্জপিসিমা বেঁচে নেই, থাকার কথাও নয়। আমি তখন জীবিকার সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে এসেছি, পরে একবার গ্রামে গিয়ে খবরটা পাই। শুনে কুঞ্জপিসির কথা মনে পড়েছিল। এর পরে আর কখনো দেশে যাইনি। যোগসূত্র একেবারেই ছিঁড়ে গিয়েছে।

সেদিন অন্ধকার নেমে এল ঝপ করে। সাধারণত দিন আর রাত্রির মাঝখানে যে সন্ধিপ্রহর থাকে, যা দিনকে সযত্ন

ভালবাসায় শুইয়ে দেয় রাত্রির শয্যায়, আজ তার দেখা পাওয়া গেল না। ভেজা অন্ধকার একরাশ বিমর্ষতা নিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাদের তাঁবুগুলো আর জানি না আমার সন্ত্রস্ত মনের নিজেরই তৈরি ভুল কিনা—আবছা অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে জেগে উঠল অপার্থিব এক ফিসফিসানি। খুব মৃদু, কী ভাষায় তাও বোঝা যায় না, কিন্তু অজানা আশঙ্কায় পরিবেশকে ভারি করে তোলে। বাকিরা কি শুনতে পাচ্ছে? পেলেও ভয়টা নিজেদের ভেতরেই লুকিয়ে রেখেছে, আবরণ খুলে গেলেই বিপদ।

ওয়ার্কিং টেন্টে বসে কাজের আলোচনা করতে করতে খেয়ে নিলাম। ঘি-মাখানো চাপাটি, চিনেবাদাম দিয়ে কুমড়ো-আলুর তরকারি, আর হালুয়া। বিশুয়া আমাদের সঙ্গেই তাঁবুর একপ্রান্তে মাটিতে বসে খেল। তার বিহ্বলভাব এখন একটু কেটেছে।

খাওয়ার পরে তাঁবুতে ফেরার জন্য বেরিয়ে দেখি বাতাসের বেগ বেশ বেড়েছে, বৃষ্টি এইমুহূর্তে ঝমঝম করে না হলেও হাল্কা মেঘের মত গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তাবুর। পেট্রোম্যাক্স আলোয় এতক্ষণ থাকার পর বাইরের অন্ধকারে জঙ্গলকে আরো নিবিড় কালো দেখাচ্ছে।

তাঁবুতে এসে অসিতবাবু একটা ছোট তেলের ল্যাম্প জ্বেলে লিখতে বসলেন। কীসের প্রেরণায় যে ভদ্রলোক নিয়মিত ডায়েরি লিখে চলেছেন কে জানে! এই ডায়েরি হয়ত কোনোদিনই বিখ্যাত মানুষের দিনলিপির মত ছেপে বার হবে না, হয়ত উপেক্ষার আড়ালেই থেকে যাবে চিরদিন। তবু মনে মনে অসিতবাবুর অবিচলিত নিষ্ঠার প্রশংসা না করে পারলাম না।

লেখনী চালনারত অসিতবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে। যখন ঘুম ভাঙল তখন সম্ভবত অনেক রাত। অসিতবাবু লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছেন—কিন্তু আলো নিভিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছেন। আমার বিছানার পাশে মোমবাতি আর দেশলাই আছে, বালিশের তলাতেও দু-ব্যাটারির টর্চ নিয়ে শুয়েছি। কাজেই খামোকা তেল না পুড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দেওয়াই ভাল। সেই উদ্দেশ্যে উঠে বসলাম।

একি! তাঁবুর মধ্যে এরকম আলো কেন! তেলের বাতি জ্বললে তো মৃদু হলেও সবকিছু আলোয় দেখতে পাবার কথা। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু এ কেমন দেখতে

পাওয়া! ডাক্তারের দোকানে একরকম ঘোলাটে খয়েরি মোটা কাচের বোতলে মি অফ ম্যাগনেশিয়া বিক্রি করে, আমি যেন ঠিক তেমনি কাচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছি। চাপা, লালচে-খয়েরি আলো চারদিকে। অনেকদিন আগে, তখন ইস্কুলে পড়ি, একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মধ্যে এইরকম আলো দেখেছিলাম। এতদিন পরে সেকথা মনে পড়ে গেল। তারপরেই চোখ পড়ল বাতিটার দিকে।

সেটা থেকে কালো রঙের আলো বেরুচ্ছে!

খুব অবিশ্বাস্য আর অপ্রাকৃত ঘটনার সরল বিবরণ দেওয়াই ভাল, সেজন্য কোনো অতিরিক্ত অলঙ্কার ব্যবহার না করে সোজাসুজি বললাম। আলো আর রঙের অভাবকে কালো বলে, তাহলে কালোরঙের আলো বলে কিছু কল্পনা করা সম্ভব কি? কিন্তু তাই দেখতে পেলাম চোখের সামনে। দেখলাম গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার লণ্ঠন থেকে বেরিয়ে মিশে যাচ্ছে পরিবেশে। তাঁবুর মধ্যেকার যেটুকু অবকাশ, তা ভারি আর ঘন হয়ে উঠেছে কালোরঙের আলোর গুড়োতে। জগৎ সংসার প্রায়ান্ধকার ধূসরতায় মূর্ছিত। বালিশের তলা থেকে টর্চ বের করে জ্বাললাম। একই ব্যাপার। টর্চের বাল্ব জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে উপেক্ষা করে সেই

উৎস থেকে বেরিয়ে আসছে অন্ধকারের গুঁড়ো!

টর্চ নিভিয়ে দিলাম। ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিলাম তেলের বাতি। মুক্ত বাতাসে একটু নিঃশ্বাস না নিতে পারলে কেমন যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। পরপর অস্বাভাবিক ঘটনা আর অপার্থিব দৃশ্য আমার মনকে বিকল করে তুলেছে। টর্চ হাতে। করেই বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এখানেও অন্ধকার, কিন্তু সে অন্ধকার সহজ প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। বুঝলাম এমন কী কালোও স্বস্তিদায়ক হতে পারে বিশেষ পরিস্থিতিতে। মনের ভার একটু হালকা হলে বোতাম টিপে টর্চ জ্বাললাম।

স্বচ্ছ, সুন্দর, পবিত্র আলো। দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়েছে।

কিন্তু না, তা বোধহয় নয়। পাহাড়েরা আজ আরো অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। একি শুধুই আলো-আঁধারির জন্য দৃষ্টিবিভ্রম? সচেতনভাবে এতটা ভুল দেখা কি সম্ভব? এভাবে চললে তো আর দুদিনের মধ্যে তাঁবুকে ছুঁয়ে ফেলবে পাহাড়ের সারি।

এতদিন মনে ঠিক ভয় জাগেনি। বরং বেশ একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি শীতের দিনে। আরামদায়ক চাদরের মত

চেতনাকে জড়িয়ে ছিল। সেই বিশাল বনস্পতির অন্তর্ধান, ক্রমাগ্রসরমান পাহাড়, পাসাংমারার গান, এই বনভূমির নির্জনতা সমস্ত কিছুতেই মন নিজের মত একটা ব্যাখ্যা খাড়া করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। স্পষ্ট চোখে দেখা গেলেও প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ যুক্তিহীন কিছুকে মন মেনে নিতে অস্বীকার করে। সুস্থ থাকবার জন্য মনের এটা একটা কায়দা।

এবার জেগে উঠল ভয়। কুলিরা চলে গিয়েছে, জলধর পণ্ডাও নেই, নতুন লোকজন নিয়ে ফিরতে তার আরো অন্ততঃ দু-তিন দিন লাগবে। তেমন প্রয়োজন হলে অবশ্য জিপ নিয়ে শহরে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু তবু রসদ কাজের যন্ত্রপাতি ফেলে যাওয়া হবেই বা কী করে? মেজকর্তা বা সার্ভেয়ার সাহেব হয়ত যেতে চাইবেন না। ওঁরা কি ঘটনাটার রহস্যময় অলৌকিক দিকটা ঠিকঠাক ধরতে পেরেছেন? শুনতে পেয়েছেন বাতাসের ফিসফাস? পেয়েছেন হয়ত, কিন্তু বলছেন না।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। দেবদর্শনবাবুর গ্রাম ছেড়ে বিদায় নিয়ে আসবার সময় তারানাথ তাকে বলেছিল—যদি কখনো আমাকে প্রয়োজন হয়, নির্জনে কোথাও দাঁড়িয়ে। মধুসুন্দরী দেবীর নাম উচ্চারণ করে মনে মনে আমাকে

ডাকবেন। আমি ঠিক জানতে পারব।

দেবদর্শন বলেছিলেন—আপনি কীভাবে জানবেন?

তারানাথ উত্তর দিয়েছিল—ও বুঝিয়ে বলা যাবে না। তবে খবর পৌঁছবে। এখন এই মধ্যরাত্রির বৃষ্টিসিক্ত অরণ্যে দাঁড়িয়ে ভাবলাম—তারানাথকে একবার ডাকলে হয় না? যদি সে শুনতে পায় তাহলে জিনিসটার সত্যি-মিথ্যে পরীক্ষা হয়ে যাবে, আর এই পরিস্থিতিতে তার পরামর্শও আমাদের কাজে লাগবে।

এখনই ডাকব? এই এখানে দাঁড়িয়ে ডাকা যাক, দেখা যাক কী হয়।

চোখ বুজে মনে মনে তিনবার মধুসুন্দরী দেবীর নাম উচ্চারণ করে তারানাথকে স্মরণ করলাম। তাকে আমাদের খুব প্রয়োজন। আমার এই ডাক সে কি শুনতে পাচ্ছে? পেলে কি সাড়া দিতে পারবে?

আমার ঠিক পেছনে মৃদু কাশির শব্দ হল। তারপরেই খুব পরিচিত একটা গলার আওয়াজ—কী হে, ব্যাপার কী?

জীবনে কখনো এমন চমকাই নি!

আমার পেছনে ঝোপজঙ্গল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারানাথ জ্যোতিষার্ণব।

বিংশ শতকের আধুনিক মানুষ আমি, কথায় কথায় বিজ্ঞান আর সভ্যতার বড়াই করে থাকি, স্মরণ করামাত্র চারশো মাইল দূর থেকে তারানাথ আবির্ভূত হয়ে আমার যুক্তি আর বিজ্ঞানের অহঙ্কারকে মুহূর্তে বিরাট আঘাত করল।

তারানাথের পরণে ধুতি। আর গায়ে ধুতিরই খুঁট চাদরের মত করে জড়ানো। তাকে এই অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু তার পরিচিত অবয়ব চিনতে একটুও অসুবিধে হল না।

তারানাথ আবার বলল—ব্যাপার কী? ডেকে এনে চুপ করে রইলে কেন?

বিস্মিত গলায় বললাম—কিন্তু আপনি—আপনি এখানে এলেন কী করে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে তারানাথ বলল কাজের কথা বল। তুমি কলকাতায় ফিরে গেলে বাকি সব আলোচনা হবে। এখন আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

সংক্ষেপে তারানাথকে আমাদের সিমডেগা আসা, পাখির মড়ক, বড় গাছটার উধাও। হয়ে যাওয়া, পাসাংমারার গান, কালোরঙের আলো, পাহাড়শ্রেণীর কাছে এগিয়ে আসা—সব বললাম। শুনতে শুনতে তারানাথ চারদিকে তাকাচ্ছিল, আমার কথা শেষ হলে সে বলল—একটা সমস্যা আমি এখনই মিটিয়ে দিচ্ছি। পাহাড়েরা কাছে এগিয়ে আসছে বলেছিলে না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—চারদিকে তাকাও তো। কী দেখছ?

তাকালাম। পাহাড়েরা আবার দূরে দূরে স্বস্থানে ফিরে গিয়েছে।

বললাম—এ রকম তো আগেও হয়েছে। মাঝরাত্তিরে এগিয়ে এসে ভোরবেলা পিছিয়ে গিয়েছে। এতে কী হল?

—আর এগিয়ে আসবে না, ব্যবস্থা করে দিলাম—

—অন্য সমস্যাগুলো?

—তার জন্যও ব্যবস্থা হবে। কাল সকাল হোক, সমাধান এসে পৌঁছবে।

বুঝলাম না সকালে কী সমাধান পৌঁছবে। কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। খুব ঘরোয়া পোশাকে তারানাথ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা না হয় মানলাম। কিন্তু তার হাতে একটা হুঁকো! এই জঙ্গলে সে হুঁকো পেল কী করে?

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—এ কী! আপনার হাতে হুঁকো কী করে এল?

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে তারানাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—এহে, এটা তো একেবারে খেয়াল করিনি। তুমি দেখতে পাবার আগে নামিয়ে রাখা উচিত ছিল—

—কিন্তু এভাবে আপনি এলেন কী করে?

গোপন কিছু করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে লোকের যেমন মুখভাব হয় তেমনি মুখ করে তারানাথ বলল—আমি তো এখানে আসিনি।

বলে কী তারানাথ! আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, না সে? স্পষ্ট দেখছি জলজ্যান্ত মানুষটা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাহলে আসেনি মানে?

তারানাথ একটু হেসে বলল—আমি আসলে রয়েছি কলকাতায়, মটু লেনের বাড়িতে। রাত্তিরে ঘুম ভেঙে অভ্যেসমত একটু তামাক ধরিয়ে খাচ্ছিলাম, এমন সময় তোমার ডাক এসে পৌঁছল। আসবার সময় হুঁকোটা নামিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছি। এটা যে তোমার চোখে পড়বেই সেটা আর খেয়াল হয়নি। হাঃ হাঃ হাঃ!

একটা লোক এসেছে অথচ আসেনি—এ কেমন রহস্য! আমি এক পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে তারানাথকে ছুঁতে গেলাম। তারানাথ বাধা দিয়ে বলল—ওটি কোরো না, আমাকে

স্পর্শ কোরো না। আমারও ক্ষতি হবে, তোমারও।

-কেন? কী হবে ছুঁলে?

—তাহলে আমি আর থাকতে পারব না। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের ছবি পুকুরের জলে পড়ে, কিন্তু জলে ঢিল ফেললে আর সে ছবি দেখা যায় কি? যাক ওসব। কথা। একটা কথা বলে যাই, এখানে তোমরা কাজ করতে পারবে না। কোনো না কোনো বাধা এসে উপস্থিত হবে। জোর করে কাজ চালাতে গেলে তার ফল খুব খারাপ হতে পারে।

—তাহলে? আমি কাজ বন্ধ করতে বললে কী কোম্পানী শুনবে?

–না। তোমার কর্তারাই বলবে। সেভাবেই রিপোর্ট লেখা হবে। তোমার পেছনে ও কী?

তারানাথ আমার পেছনে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। আমি পেছনদিকে তাকালাম। কই, কিছু নেই তো! কীসের কথা বলছে তারানাথ?

এদিকে ফিরে দেখি ঝোপের পাশ থেকে তারানাথও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলাম তার অন্তর্ধানের দৃশ্য দেখলে আমার মনে ধাক্কা লাগতে পারে, তাই সে এই সহজ কায়দাটা করেছিল। সে এখন মটু লেনে বসে বাকি তামাকটুকু খাচ্ছে।

তাঁবুতে ফিরে এলাম। অসিতবাবু এখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমিও টর্চ বালিশের নিচে রেখে আবার শুয়ে পড়লাম।

তারানাথ বলেছে কাল সমাধান আসবে। কী সে সমাধান? কোন্ রূপে আসবে?

গাছের পাতায় টিপটিপ বৃষ্টির শব্দে ঘুম এসে গেল।

বিংশ

সকাল হল বটে

সকাল হল বটে, কিন্তু আলো তেমন করে ফুটল না। সমস্ত অরণ্যে একটা ভিজে অন্ধকার ব্যাপ্ত হয়ে রইল। ওয়ার্কিং টেন্টে বসে বাসিমুখে চা খাচ্ছি, এমন সময় বিশুয়া গম্ভীর মুখে সামনে এসে দাঁড়াল।

মেজকর্তা বললেন কী ব্যাপার বিশুয়া? মুখ অমন শুকনো কেন?

বিশুয়া বলল—বাবু, জিপ স্টার্ট নিচ্ছে না–

—তাতে মুখ শুকনো করার কী আছে? দেখ গিয়ে ভাল

করে, কোনো তার-টার খুলে গিয়েছে হয়ত। ব্যাটারির টার্মিনাল আলগা হয়ে যায়নি তো?

—না বাবু। ওসব আমি দেখে নিয়েছি। একবার ভাবলাম বুঝি কোনোভাবে ডিস্ট্রিবিউটারে বৃষ্টির জল ঢুকেছে। ডিস্ট্রিবিউটার ক্যাপ খুলে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে কাগজের নুড়ো জ্বেলে গরম করে ফের লাগিয়েছি

—তাতে হল না?

—না বাবু। অথচ ট্যাঙ্কে তেল ভর্তি, তাজা ব্যাটারি—

মেজকর্তা একটু ভেবে বললেন—বিশুয়া, এ বিষয়ে আর আমি কী বলব? আমি তো আর যন্ত্রপাতির ব্যাপার কিছু বুঝি না। দেখ আর একটু চেষ্টা করে, স্টার্ট নেবে এখন—

অপ্রসন্নমুখে বিশুয়া আবার গাড়ির দিকে গেল।

নির্মল কাঞ্জিলাল বললেন—আকাশের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আবার বৃষ্টি নামবে।

অসিতবাবু বললেন—আমার ভাল লাগছে না।

সবাই তার দিকে তাকাল। মেজকর্তা বললেন—কী ভাল লাগছে না?

—কিছুই না। দেখুন, নিজেদের মধ্যে আর লুকোচুরি না করে সত্যি কথা স্বীকার করবার সময় এসেছে। কী হচ্ছে এসব? একশো মণ ওজনের পাথর সরে গেল আপনা আপনি, হাওয়ায় উবে গেল একটা বিশাল গাছ, পাসাং মারার গান শুনে কুলিরা ফিরে গেল, সবাই মিলে রাত্তিরে একই স্বপ্ন দেখছি—এখন আবার শুনছি গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। আমি খারাপ কিছু ঘনিয়ে এলে আগে থেকে মনের ভেতরে তার আগাম ঘণ্টা শুনতে পাই। জলধরকে আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি, গাড়ি খারাপ হলে আমরা তো এই দুর্যোগে অসহায়ের মত আটকে পড়ব। অবশ্য আমার এ নিয়ে কথা বলা উচিত নয়, এটা আপনাদের ব্যাপার। আমি সবার নিরাপত্তার কথাই বলছি-

মেজকর্তা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—যেখানে সকলের ভালমন্দ একসূত্রে জড়িত, সেখানে কারো কথা বলা অন্যায় নয়। তাছাড়া আমিও বুঝতে পেরেছি এখানে

আমরা কাজ করতে পারব না। জলধর কুলি নিয়ে ফিরতে পারবে বলে আমি মনে করি না। সে ফেরা পর্যন্ত অন্তত অপেক্ষা করা যাক—

মাথার ওপরে গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে জল ঝরে পড়ছে। চেয়ার একটু টেনে সরিয়ে বসলাম। জলধর যদি খুব তাড়াতাড়িও ফেরে, তাহলেও কাল বিকেলের আগে নয়। আর একটা রাত্তির এই নির্জনতার মধ্যে আমরা কয়েকটি প্রাণী কাটাব। অন্য সময় হলে ভাল লাগত, কিন্তু মনে আশঙ্কা নিয়ে কোনও উপভোগই সুখের নয়।

কিন্তু পরের দিন অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হল না। বেলা বারোটা নাগাদ সাম পাহাড়টোলির দিকের রাস্তায় গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া গেল। বড়, ভারী গাড়ির। ইঞ্জিন, চড়াই দিয়ে ওঠার পথে গোঁ গোঁ শব্দ করছে। এ শব্দ আমাদের পরিচিত, তবু থেকে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। রান্নার তাবু থেকে বিশুয়াও বেরিয়ে এল। সে বলল —আমাদের লরি আসছে।

মেজকর্তা বললেন–কী করে বুঝলে?

–আমি আওয়াজ চিনি কর্তা। এক এক গাড়ির এক এক রকম আওয়াজ–

একমিনিটের মধ্যেই বিশুয়ার কথা সত্য প্রমাণিত করে আমাদের চেনা ট্রাক উঠে এল চড়াই বেয়ে। বিশুয়া একগাল হেসে বলল—বলেছিলাম না আমাদের গাড়ি!

মেজকর্তা বললেন—ওটা কিছু নয়। এই জঙ্গলে আর অন্য কোন গাড়ি আসবে? ও তো আমিও বলতে পারতাম–

মেজকর্তা অবশ্য কথাটা মজা করে বললেন। কিন্তু বিশুয়া আহত অভিমানের সুরে বলল—বলেন কী কর্তা! আমার চোখ বেঁধে সামনে একে একে পঞ্চাশটা গাড়ি স্টার্ট দিন, আমি বলে দেব কোন্টা কোন্ গাড়ি–

লরি এসে ব্রেক কষল সামনে। চড়াই ভেঙে ওঠার জন্য রেডিয়েটরের জল ফুটছে। জলধর পণ্ডা নেমে এসে দাঁড়াল, সে কুলি পায়নি—এ কথা তার আর মুখে বলবার দরকার হল না। বিশ্বস্ত কাজের লোক কোনো কাজে ব্যর্থ হলে তার চেহারায় একটা গ্লানির ছাপ ফুটে ওঠে, জলধরেরও তাই হয়েছে। সে বলল—কী করে এত তাড়াতাড়ি এরা খবর ছড়ায়

জানি না কর্তা, নাকি এদের মাথার মধ্যে সত্যি সত্যি টনক আছে, তাই বা কে জানে! চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর সিমডেগা, কোলেবিরা, সীসা আর জঙ্গলের ভেতরকার বস্তি—সবজায়গার লোকেরা বেঁকে বসেছে। জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলে না। ডবল মজুরি অবধি কবুল করেছি কর্তা—যেমন আপনি বলে দিয়েছিলেন, তাতেও কিছু হয়নি।

এইসব কথা হচ্ছে, হঠাৎ লরীর থেকে পেছনের খোলা ডালার দিক দিয়ে একজনকে। নামতে দেখলাম। এ আবার কে? একে তো আমাদের দলে আগে দেখিনি। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্যরাও তাকাল। মেজকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন —এ লোকটি কে জলধর?

জলধর একটু ইতস্তত করে বলল—আজ্ঞে, আমিও ঠিক চিনি না-

—চেন না মানে? তোমার সঙ্গে এল, আর তুমি চেন না?

—না কর্তা। মাঝপথে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে থেকে উঠে এসে রাস্তার ওপর দাঁড়াল। সেখানে কোথায় ফেলে আসব, তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম-

লোকটি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বছর চল্লিশ কী বেয়াল্লিশ বয়েস হবে, বেশ ভদ্র আর সৌম্য চেহারা। জামাকাপড় অত্যন্ত সাধারণ হলেও লোকটিকে ঠিক ভবঘুরে শ্রেণীতে। ফেলা যায় না। তার হাতে একটা সরু, লম্বা গাছের ডাল। জঙ্গলের ভেতরে কোথাও থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে বোধহয়। গাছের ডালটা দেখে আমার মনের ভেতর একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। কিছু মনে পড়ে যাওয়ার পূর্বাভাস।

লোকটি সাধারণভাবে আমাদের সকলকে উদ্দেশ করে বলল-নমস্কার।

শিক্ষিত মানুষের বাচনভঙ্গি। মোটেও ভবঘুরেদের মত নয়। মজার ব্যাপার তো!

মেজকর্তা বললেন—নমস্কার। তুমি কে?

লোকটি মুচকি হেসে বলল—পথিক। আপাতত আপনাদের অতিথি।

—নাম কী তোমার? এখানে কোথা থেকে এলে?

লোকটা একটু চিন্তা করল।

—নাম? নাম ধরুন মৃত্যুঞ্জয়। আমি এমনি পথে পথে ঘুরে বেড়াই, বাড়ি-টাড়ি কিছুই নেই। যেখানে থাকতে পাই থাকি, যেখানে খেতে পাই খাই। এখন বনের ভেতর দিয়ে। হাঁটছিলাম, আপনাদের গাড়ি দেখতে পেয়ে তাতে উঠে বসেছি। ব্যস, চলে এলাম।

কিন্তু ব্যাখ্যাটা অত সহজ নয়। জনমানবহীন অরণ্যে, যাকে ইংরেজিতে বলে In the middle of nowhere, সে একা কী করছিল? যেখান থেকে সে লরীতে উঠেছে সেটা সবচেয়ে কাছের লোকালয় থেকে অন্তত দেড়দিনের হাঁটাপথ। খাবার বা জল না নিয়ে। এই দেড়দিন সে কীভাবে কাটিয়েছে জঙ্গলের ভেতর? পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে, তার। মানে সে বাঙালী। বিহার-উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী দুর্গম অরণ্যে একজন ভবঘুরে বাঙালী কীসের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? একে আমি চিনি এমন কথাই বা আমার মনে হচ্ছে কেন?

মৃত্যুঞ্জয় বেশ সহজ ভঙ্গিতে একবার চারদিকে তাকাল, তারপর বললবেশ জায়গা, কিন্তু এখানে তো আপনারা

কারখানা বানাতে পারবেন না কর্তা–

মেজকর্তা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমরা এখানে কারখানা করতে চাই একথা তোমাকে কে বলল?

–ওটার মধ্যে কোনো যাদু নেই। আসবার সময় আপনার লোকেদের কাছেই শুনেছি।

—কেন, কারখানা করতে পারব না কেন?

মৃত্যুঞ্জয় হেসে বলল—কর্তা, কিছু কিছু কেন-র কোনও উত্তর হয় না। মেনে নিতে। হয়। এই তো দেখুন না, এখনও তো বর্ষা নামেনি, তবু ক'দিন তেমন আকাশ মেঘে ঢাকা আর বৃষ্টি হয়ে চলেছে। যদি প্রশ্ন করেন কেন হচ্ছে, কেউ কী তার উত্তর দিতে পারবে? কেবল দু'একজন বিশেষ মানুষ ছাড়া?

নির্মলবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার বললেন—বিশেষ মানুষ আবার কে? কী বলছ হে তুমি?

মৃত্যুঞ্জয় বলল—বিশেষ লোক বলতে যারা এসব ব্যাপার

ঠিকঠাক জানে আর কী। এই যেমন আমি

নির্মলবাবু বললেন—তুমি ধাঁধায় কথা বলছ কেন? কি জান তুমি?

মৃত্যুঞ্জয় বলল—এই যেমন বলে দিলাম এখানে আপনারা কাজ করতে পারবেন না। কারণ কী জানেন? কারণ হল পৃথিবীতে কিছু কিছু জায়গা মানুষের, কিছু কিছু জায়গা। মানুষের নয়। নিজের অধিকারের গণ্ডি পার হয়ে ওদিকে পা দিলে তাতে সব গোলমাল হয়ে যায়।

মেজকর্তা বললেন—এত সব কথা তুমি শিখলে কোথায়? এ তো টোলের পণ্ডিতমশাই-এর মত কথা।

মৃত্যুঞ্জয় বলল—আজ্ঞে, আমি জানতে পারি। স্বপ্ন দেখি কী না। তার পরে ধরুন। মাপজোক আছে, মাটি শোঁকা আছে। এসব মিলিয়ে আমি টের পেয়ে যাই–

আমি চমকে তার দিকে তাকালাম। মনে হল আমি তাকে চিনতে পেরেছ। তারানাথের মুখে শোনা সেই বাহিরগাছি গ্রামের গল্প। রামজয়পুরে সরসী চাটুজ্জের

বৈঠকখানা। কিন্তু যার কথা তারানাথ বলেছিল তার নাম তো মৃত্যুঞ্জয় নয়। কী যেন নামটা! আবছা আবছা মনে পড়লো। সে নামের অর্থও মৃত্যুঞ্জয় গোছের কিছু। অবশ্য মেজকর্তা বা নির্মলবাবুর সামনে এসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সঙ্গত মনে করলাম না।

মেজকর্তা বললেন তুমি ভারি অদ্ভুত কথা বলে তো! মাপজোক কীসের? মাটি শোকাই বা কাকে বলে?

—আজ্ঞে, সব বুঝতে পারবেন। আজকেই সব দেখিয়ে দেব। বেলা হয়েছে। একটু খাওয়াদাওয়া করে নিই, কেমন? তারপরে কাজ শুরু করা যাবে। আপনাদের আজকে মাছ-মাংস কিছু রান্না হয়নি তো? স্বপ্ন দেখতে আর মাটি শুকতে হলে সেদিন মাছ-মাংসটা

খাওয়াই ভাল। তাতে হিসেবের গোলমাল হয়ে যায়।

মৃত্যুঞ্জয়কে কেউ তখনও খাবার নিমন্ত্রণ করেনি। কিন্তু নিজে থেকেই সে এমনভাবে প্রসঙ্গটা তুললো যে, মনে হল এটা তার অত্যন্ত স্বাভাবিক অধিকার। এ মেজকর্তা বললেন— নিরামিষ খাবারই পাবে।

জলধর পণ্ডা সার্ভেয়ার সাহেব আর মেজকর্তার সঙ্গে জরুরি কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অসিতবাবু তাঁবুতে ফিরে গেলেন বোধকরি ভুলে যাওয়ার আগে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে ঠিকঠাক লিখে রাখার জন্য। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। যেখানে সেই বিরাট বৃদ্ধ নারিকেল গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেখানে মৃত্যুঞ্জয় চিন্তিত মুখে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাটিতে বিশাল পাথরটা হড়কে যাওয়ার চওড়া গভীর দাগ। যেন একটা রাজপথ তৈরি হতে আরম্ভ করে থেমে গিয়েছিলো। আমার পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে তাকিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বলল—এই যে!

আমি তার চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বাহিরগাছি গ্রাম চেনো?

তার মুখে বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। সে বলল-ওঃ, আপনি বুঝতে পেরেছেন তাহলে!

–বাহিরগাছিতে চক্রবর্তী পরিবারের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, তাই না? আদিনাথ চক্রবর্তীকে মনে পড়ে?

–পড়ে। কিন্তু সে তখন নিতান্তই বালক। তার পরে তাকে আর কখনও দেখিনি।

—সেই বালক আদিনাথ চক্রবর্তী বুড়ো হয়ে মারা গেছে আজ বহুদিন। শুনেছি তখন নাকি তোমার বয়স পঁয়ত্রিশ কী চল্লিশ ছিল। এখনও তোমার সেই বয়েস থাকে কী করে? হিসেবমত তোমার বয়েস তো একশ ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত–

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় একটু হাসল।

বললাম—আদিনাথ চক্রবর্তীর ছেলের সঙ্গেও তো তোমার দেখা হয়েছিল, তাই না? দেখা হয়েছিল না বলে আলাপ হয়েছিল বলাই ভাল। অন্ধকার রাত্তিরে মন্দিরের চাতালে শুয়ে কেউ কারো মুখ যখন দেখতে পায়নি–

মৃত্যুঞ্জয় মিষ্টি করে হেসে বলল—আপনি তো সব জানেন দেখছি। অবশ্য জানবেনই তো, আদিনাথ চক্রবর্তীর ছেলে তারানাথ চক্রবর্তী আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন আজ আমি আসব, ঠিক তো?

এখনও ভাবলে অবাক লাগে, কী করে সেদিন মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমি এত সহজ ভাবে নিয়েছিলাম। অলৌকিক ঘটনার কথা আমরা শুনি বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সীমানায় খুব বেশি একটা পাই না। কে জানে কী করে সেদিন মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলাম।

হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে মৃত্যুঞ্জয় যেখানে পাথরটা সরে যাওয়ার দাগ হয়ে রয়েছে সেখান থেকে একমুঠো মাটি হাতে তুলে নিয়ে গভীরভাবে শুকতে লাগলো। তার মুখচোখ গম্ভীর, মগ্নতায় আবিষ্ট।

বললাম—ও কী হচ্ছে?

—মাটি শুঁকছি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মাটি শুঁকে কী হবে?

আমার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বলল—মাটিই তো সব। মাটিতে সৃষ্টি, এই মাটিতে প্রতিষ্ঠা, মাটিতে মৃত্যু। মাটিতে মহাকাল মিশে থাকে। বৈদ্য যেমন রোগীর নাড়ি থেকে শরীরের গতিক বুঝতে পারে, তেমনি মাটি খুঁকে সবকিছু বলে

দেওয়া যায়–

—এখন কী বুঝতে পারলে?

–বুঝলাম এ জায়গা অন্যের অধিকারে।

এখানে কিছু না করাই ভাল। —অন্যের অধিকারে মানে? কার অধিকারে? মৃত্যুঞ্জয় প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল কী বলি বলুন তো, নাম তো কিছু নেই। শুধু বলতে পারি এ শক্তি জীবন আর স্থিতির বিরোধী–

–তার মানে অশুভ শক্তি?

—মোটেই নয়। আমাদের পক্ষে অসুবিধেজনক বলে অশুভ হতে যাবে কেন? যে কোনো একজন শান্ত, ভদ্র গৃহস্থ কি অশুভ শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে? কিন্তু তার বাড়ির উঠোনে নিজের প্রয়োজনে আপনি যদি গিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকেন, তাহলে সে নিশ্চয় লাঠি নিয়ে হৈ হৈ করে তেড়ে আসবে, যতরকম ভাবে বাধা দেওয়া যায় তার চেষ্টা করবে। তার জন্য তাকে কি খুব পাজি বা দুষ্টু লোক বলা উচিত হবে? নিজের স্বাভাবিক অধিকারে হাত পড়লে সবাই রেগে যায়—

বন থেকে বেরিয়ে আসা মানুষটি ভারি আশ্চর্য কথা বলে। পণ্ডিতের মত কথা। বললাম—কিন্তু এ শক্তির রূপ কী? পরিচয় কী?

—কিছু না। সৃষ্টির সময় থেকেই আলো আর অন্ধকারের মত বিরোধীশক্তি আর মিত্রশক্তির উদ্ভব। জাতি, ভাষা, ধর্ম অনুযায়ী এক এক জায়গায় এক এক নামে মানুষ ডাকে। পরিচয় আর কী থাকবে?

বললাম—তুমি তাহলে এখন কী করবে? এর থেকে রক্ষা পাবার উপায় কী?

মৃত্যুঞ্জয় বলল—যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেটে যায়, কারো প্রাণহানি না হয় সেজন্য আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি, মিত্রশক্তির দেবতার আশ্রয় নিচ্ছি। কিন্তু এ জায়গা থেকে আপনাদের। চলে যেতে হবে। কিছু জায়গায় কিছু কাজ করা যায় না।

—মিত্রশক্তির দেবতা কে?

—জানি না। দেবতার আবার নাম-গোত্র কী? তবে তার

আশ্রয় গ্রহণ করলে ভয় কেটে যায়। শাস্ত্রে বলেছে—

ভূতপ্রেতপিশাচশ্চ রাক্ষসা দুষ্টচেতসঃ।
সর্বেতে প্রলয়ং যান্তি বিশ্বমিত্রস্য প্রসাদতঃ ॥

একবিংশ

পাখির ডাক ভেসে এল

হঠাৎ পাশের একটা গাছ থেকে পাখির ডাক ভেসে এল। একটু আশ্চর্য হয়ে ওপরে। তাকালাম। গত কয়েকদিন বনের ভেতর পাখিদের শব্দ শুনতে পাইনি। সেই অপার্থিব স্তব্ধতা কাটিয়ে প্রথম এই ডাক পরিবেশের বিষণ্ণতা অনেকখানি দূর করে দিল। হ্যাঁ, ওই যে পাতার আড়ালে বসে রয়েছে পাখিটা, কী পাখি বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কিন্তু পাখি বটে। যাক্, তাহলে পাখিরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। ভাল।

মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম—বাহিরগাছিতে আর পরে জয়তলা গ্রামে তোমার নাম বলেছিলে অমরজীবন।

নামটা বদলে গেল কী করে?

—দুটো নামের মানেই তো এক, তাই না? নাম একটা যা হোক হলেই হল—

তারপর চারদিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গ বদলাবার ভঙ্গিতে বলল-ঝড়বৃষ্টি কিন্তু ধরে আসছে, দেখেছেন? আর বাড়বে না। বিকেলের দিকে সূর্যও বেরিয়ে আসবে।

বললাম তোমার বিষয়ে যে আমি আগে থেকেই জানি তা আর আমার কোম্পানির লোকেদের বললাম না, বুঝলে? এরা অবাক হয়ে যাবে, বুঝবে না। এটা গোপনই থাক।

আমরা ফিরে এলাম তাঁবুর কাছে। মেজকর্তা বললেন— আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে আসছে। কুলি পেলে একবার চেষ্টা করে দেখা যেত-

মৃত্যুঞ্জয় বলল—সেটা বোধহয় উচিত হত না। যিনি বাতাস কমিয়েছেন তার কাছে অবাধ্যতা করা ভাল নয়। তাহলে আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে, আমিও আর একই ব্যাপার নিয়ে দুবার বলতে পারব না—

মেজকর্তা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—আরে! তুমি কি পাগল নাকি? ঝড়বাদল তুমি কমালে?

—না, না! আমি কমাবো কেন? যে কমায় তাকে বললাম, সে যা করবার করল। নইলে আপনাদের খুব অসুবিধা হত।

মেজকর্তার মুখে ব্যঙ্গ আর অবিশ্বাস মেশানো হাসি ফুটে উঠল।

তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বলল—আপনার বিশ্বাস জন্মানোর দায়িত্ব আমার ওপরে নয়, আর ভেলকি দেখানো তো একেবারেই নিম্নমার্গের ব্যাপার। কিন্তু আপনি কর্তার ক্ষমতায় সংশয় প্রকাশ করছেন, আমার একটা কিছু তো করা উচিত–

মেজকর্তা বললেন–কর্তা কে?

—আমিও ঠিক জানি না। দেখিনি তো কখনও। তবে কর্তাই সব। আচ্ছা, আপনি। একটা সিগারেট ধরান না কেন —

—সিগারেট ধরাবো? কেন? হঠাৎ সিগারেট ধরাবো কেন?

মৃত্যুঞ্জয় বলল—কোন কারণ নেই। আপনি চেষ্টা করলেও পারবেন না, তাই বলছি–

—সে কী! সিগারেট ধরাতে পারবো না কেন?

—দেখুন চেষ্টা করে।

মেজকর্তা ধরেই নিয়েছেন তিনি পাগলের সঙ্গে কারবার করছেন। তার সঙ্গে কিছু কৌতূহলও এসে মিশেছে। পাগলকে খুশি রাখাই ভালো এই সাব্যস্ত করে তিনি পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বের করলেন। কিন্তু কিছুতেই ধরাতে পারলেন না।

ঠোটের ফাঁকে সিগারেট নিয়ে যতবার দেশলাই জ্বাললেন ততবারই একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা এসে কাঠিটা নিভিয়ে দিল। দুবার...তিনবার..চারবার...প্রতিবারই কেবলমাত্র দেশলাই-এর কাঠি জ্বলবার মুহূর্তে বাতাসের ঝাপটা আসছে,

পর মুহূর্তেই চারদিক আবার শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

মুখে বিস্ময় নিয়ে মেজকর্তা মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার মুখে আর অবিশ্বাসের চিহ্ন নেই।

মৃত্যুঞ্জয় বলল—চমকাবেন না, এর মধ্যে যাদুর খেলা কিছুই নেই। কর্তার কাছে ঠিকমতো প্রার্থনা করতে পারলে এসব আপনা আপনিই হয়ে যায়।

এবার আর মেজকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন না—কর্তা কে?

মৃত্যুঞ্জয় বলল—কাজে বাধা দিচ্ছি বলে আমাকে শত্রু ভাববেন না। এই যে আমার হাতের কাঠিটা দেখছেন, এটা হল ওই ওপরের বড়কর্তার সব কিছু মাপবার গজকাঠি। এ দিয়ে মাপলে যে কোন জায়গার ভালো-মন্দ দোষ-গুণ সব বলে দেওয়া যায়। তা আপনাদের কাজের জায়গা মাপতে গিয়ে দেখলাম মাপটা হারিয়ে যাচ্ছে। শুরু করছি এক। জায়গায়। কিন্তু কোথাও গিয়ে থামছে না। তাছাড়া এখানকার জমিও মানুষের কোলাহলকে বরদাস্ত করবে না।

মেজকর্তা বললেন—সেটা তুমি কী করে বুঝলে?

–বা রে, আমি মাটি শুকে দেখলাম যে! এ জায়গায় অতীতে কোন মানুষ কখনও বাস করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না। মাটি খুঁকে ওসব বোঝা যায়–

আমাদের খুব বেশি বোঝাবার দরকার ছিল না। ব্যাখ্যার অতীত ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। আশ্চর্য স্বপ্ন দেখা, বনস্পতির অন্তর্ধান, বিশুয়ার জীবন থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় হারিয়ে যাওয়া— এসব আমাদের মনের ওপর একটা কালো ছায়া বিস্তার করে রেখেই ছিল, তার ওপরে কুলিদের পলায়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব করে তুললো। এসব আবছা কথা কোম্পানিকে যে রিপোর্ট দেওয়া হবে তাতে লেখা যায় না। কিন্তু পুরনো এবং পাকা। কর্মচারীরা রিপোর্ট লেখার নানারকম কায়দা জানেন। বাস্তব অসুবিধেগুলোকে তুলে ধরে মেজকর্তা রিপোর্ট লিখে কাজ বন্ধ করে দিতে পারবেন, কিন্তু তার মুখ দেখে বড় মায়া লাগলো। দক্ষ ও বুদ্ধিমান মানুষ দুর্বোধ্য, ব্যাখ্যাহীন প্রহেলিকার মুখোমুখি হলে তার মুখভারের কী করুণ আর বিপন্ন অবস্থা হয় তা দেখলাম। মেজকর্তা নিজের তাবুতে ঢুকে গেলেন। আমরা আবার হাঁটা শুরু করে ওপাশের জঙ্গলে গিয়ে পড়লাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মৃত্যুঞ্জয়, এত পাখি মারা পড়ছিল কেন বলতে পারো? সিমডেগাতে, আসবার পথে সাম পাহাড়টোলির কাছে-কী ব্যাপার বল তো? এর কি কোনো মানে আছে?

মৃত্যুঞ্জয় আমার দিকে তাকালো, বলল—মানে তো আছেই। ঠিক সময় থেমে না গেলে পাসাং মারার অনুচরেরা সব একসঙ্গে বেরিয়ে আসতো, কেউ তাদের সামলাতে পারতো না। খামোখা কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ যেত। আমি কর্তার কাছে দরবার। করেছিলাম, আপনারাও কাজ বন্ধ করা ঠিক করলেন, তাই ব্যাপারটা মিটে গেল, পাখি মরাও বন্ধ হয়ে গেল। পাসাং মারার অনুচরেরা সব আবার ফিরে গেছে মাটির তলার অন্ধকারে। এখানে ওখানে মাটিতে গর্ত দেখলেই বুঝতে পারবেন।

আমি বললাম—গর্ত? গর্ত কী রকম!

—অশুভ শক্তির সাঙ্গো-পাঙ্গরা বাধা পেলে তাড়াতাড়ি অন্ধকার পাতালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। যেখান দিয়ে তারা মাটিতে ঢোকে সেখানে একটা করে সাপের গর্তের মত ছোট গর্ত তৈরি হয়। দেখলে অবিকল ছুঁচো বা সাপের গর্ত বলে

ভুল হবে—

সবই বুঝলাম, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিরাট ধাঁধা ধরিয়ে দিল। এরপর থেকে মাটিতে অত্যন্ত নিরীহ আর স্বাভাবিক গর্ত দেখলেও মনে হবে এইখান দিয়ে পাসাং মারার ছায়া-জগতের অনুচর মাটির তলায় প্রবেশ করেছে। বললাম—কিন্তু বিশুয়ার যে অনেকখানি সময় হারিয়ে গেল, তার কী হবে?

মৃত্যুঞ্জয় বলল—সময় হারায় না, তার চলার একটা নিত্য ছন্দ আছে। বিশুয়ার ব্যক্তিগত সময়টা একটু ধীর করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে অন্য সবার সময় যতটা কেটেছে, বিশুয়ার ততটা কাটেনি। একে কালস্তম্ভন বলে। এমন করা যায়–

—কিন্তু বিশুয়ার সময়ের গতি ধীর করে দিল কে?

—আবার সেই একই বিপদে ফেললেন। এর সঠিক উত্তর আমি জানি না। হয়তো পাসাং মারা, হয়তো বা অন্য কোন শক্তি, যে শক্তি এখানে মানুষের অনুপ্রবেশ চায় না। এখানে যা যা ঘটেছে সবই মানুষকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করবার জন্য।

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কিছু বলবার ছিল। ফাদার ও ব্রায়েন বলেছিলেন, পাখিকে ক্রিশ্চান বিশ্বাস অনুযায়ী কোথাও কোথাও ঈশ্বরের দূত বলে মনে করা হয়। পাখির মড়ক কোনো অমঙ্গলের আগাম সূচনা দেয়। কিন্তু সুদূর ইউরোপের মাটিতে জন্মানো এক লোকায়ত বিশ্বাসের সঙ্গে এই বিহার আর উড়িষ্যার প্রান্তবর্তী অরণ্যের কি যোগাযোগ আছে? কিংবা হয়তো প্রকৃতির কোনো কোনো নিয়ম পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই এক। সে জন্যই তারানাথের মুখে শোনা রাম গাঙ্গুলীর গল্পের মত এখানেও বিশাল বৃদ্ধ নারিকেল গাছ হঠাৎ হাওয়ায় উবে যায়।

মৃত্যুঞ্জয় তার হাতের ছড়িটা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তাবুর দিকে। মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে। কাঠিটা দিয়ে মাটিতে কী মেপে দেখছে। তার অপস্রিয়মাণ চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে হল এই বিশাল জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ তৃণখণ্ড থেকে অনাদ্যন্ত মহাকাশে জ্বলন্ত নক্ষত্রের দল পর্যন্ত একটা অদৃশ্য, কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত। প্রাত্যহিকতার। মায়ায় সত্যের এই অগ্নিময় জ্বলন্ত রূপ আমাদের চোখে পড়ে না। কলকাতা শহরের উপগলির এঁদো মেসের ঘর নয়, সমস্ত বিশ্বের বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ পরিধিই আমারও জীবনের পরিধি, জ্বলন্ত নক্ষত্রবেষ্টিত সত্যের অলাতচক্র। মৃত্যুঞ্জয় অনেকখানি

এগিয়ে গিয়েছে, এইবার সে ঝোপের ওধারে বাঁক ফিরবে। গলা একটু উঠিয়ে ডাকলাম—মৃত্যুঞ্জয়!

সে ফিরে তাকালো। বলল—কী?

বললাম—শুনে যাও! দরকার আছে।

মৃত্যুঞ্জয় এসে সামনে দাঁড়ালো। বললাম—একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই ডাকলাম।

—কী?

—সিমডেগা আসবার সময় রাউরকেল্লা এক্সপ্রেসে তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে, তাই? মাঝপথে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে? তোমার মুখ দেখতে পাইনি যদিও তবু আমি নিশ্চয় করে জানি সে অন্য কেউ নয়–

মৃত্যুঞ্জয় চুপ করে রইল।

মেঘ কেটে যাচ্ছে মাথার ওপরে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সামান্য এক ফালি মেঘভাঙা রোদুর

এসে পড়ল। এই অদ্ভুত আলোটা আমাকে ছোটবেলা থেকে ভারি। মুগ্ধ করে, যেন কোন্ রূপকথার দেশের ছবি ভেসে ওঠে মনের মধ্যে। সে এমন এক জগৎ যেখানে সবই সম্ভব, যেখানে যুক্তি-তর্কের বিচারে সত্যের নির্ণয় হয় না। সেই আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ।

আমার দিকে তাকিয়ে ছিল মৃত্যুঞ্জয়। এবার সে বলল– ঠিক ধরেছেন। জীবন আর জগৎ অনেক বড়, হিসেব কষে তার কূল খুঁজে পাবেন না। যুক্তি আর তর্ক তো সেই অনন্তকে মাপবার জন্য মানুষের একটা অসহায় প্রচেষ্টা। সত্যিকারের মাপকাঠি চাই–

—সে মাপকাঠি কী করে পাওয়া যায়?

–কারো কারো কাছে থাকে। যেমন এইটে–

মৃত্যুঞ্জয় তার হাতের লাঠিটা দেখাল। এইরকম সরু লাঠি বা কঞ্চি দিয়েই সে মাঝে মাঝে মাপ-জোক করে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে বটে। যেমন করেছিল বাহিরগাছি গ্রামে সেই কবে। বললাম—এটা কি বিশেষ কোনো গাছের ডাল?

মৃত্যুঞ্জয় হেসে বললনা না, তা কেন হবে! শাস্ত্রে ব্রহ্মাস্ত্রের কথা পড়েছেন তো? ঐ নামে আসলে কোন অস্ত্র ছিল না। ব্রহ্মাস্ত্র একটা তেজ বা শক্তির নাম। উপযুক্ত লোক প্রয়োজন হলে এক টুকরো ঘাস তুলে নিয়ে মন্ত্র পড়ে তাতে ব্রহ্মাস্ত্রের অধিষ্ঠান ঘটাতেন। সেই তৃণখণ্ড শত্রুর দিকে ছুঁড়ে দিলে নিমেষে তা সবকিছু ছারখার করে দিত। এও তাই।

আবছা আবছা কিছু বুঝলাম, অনেক কিছুই পরিষ্কার হল না। বললাম—তুমি কে

মৃত্যুঞ্জয়?

সে হেসে বলল—তা কি আমি নিজেই জানি? কী যেন একটা কাজ আছে আমার, সেটাই করে বেড়াই। কাজ হয়ে গেলে ফিরে যাবো।

–কোথায় ফিরে যাবে?

—বিশ্বাস করুন, তা আমি ঠিক করে জানি না। এই যে এত মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীতে, এরা কি জানে কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় ফিরে যাবে? আমিও তাদেরই

মতো। আচ্ছা, একটু ওদিকে যাই।

মুহূর্তে মুহূর্তে উন্নতি হচ্ছে আবহাওয়ার। এ যেন আরো বিস্ময়কর। মেঘ করে অন্ধকার ঘনিয়ে এসে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে দুর্যোগ শুরু হওয়াকে তবু কোনরকমে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু সেই ঘনঘোর দুর্যোগ কাটবার যে স্বাভাবিক ছন্দ আছে তাকে অগ্রাহ্য করে এই অলৌকিক উন্নতি ভয় ধরিয়ে দেয়।

তাঁবুতে ফিরে এলাম। মেজকর্তা একটা টেবিল টেনে বসে কী লিখে চলেছেন। পাশেই দুটো চেয়ারে অসিতবাবু আর নির্মলবাবু বসে। আমাকে দেখে অসিতবাবু বললেনওয়েদার কী দারুণভাবে ইম্প্রুভ করে গেল, না?

লিখতে লিখতেই মেজকর্তা বললেন—তা করল বটে, কিন্তু এখানে আমরা কাজ করব না, বুঝলেন? তারই রিপোর্ট লিখছি।

বললাম—সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন?

—সিদ্ধান্ত নেবে কোম্পানি, আমি আমার মতামত

জানাচ্ছি মাত্র। রিপোর্টে কী লেখা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আমি অধস্তন কর্মচারী, ওপরওয়ালার রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই। মেজকর্তা কিন্তু নিজেই বললেন—এখানকার সব অভিজ্ঞতার কথা লেখা যাবে না, লিখলাম এখানে জলের অসুবিধা, নদী আর ঝরনা প্রায়ই শুকিয়ে যায়, কাজের জন্য কুলি পাওয়া কঠিন—কথায় কথায় তারা কাজ ছেড়ে চলে যায়। ওইসঙ্গে জায়গাটার ভূপ্রকৃতির অসুবিধার কথা কিছু নির্মলবাবু ঢুকিয়ে দেবেন, যাতে রিপোর্ট বেশ মজবুত হয়। মোট কথা কাজ এখানে করা যাবে না।

সার্ভেয়ার সাহেব কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁবুর ঠিক বাইরে দ্রুত ধাবমান পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই বিশুয়া আর ডহরু লোহার একসঙ্গে তাঁবুতে ঢুকে হাঁপাতে লাগল। তাদের চোখমুখ রীতিমত উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

মেজকর্তা বললেন কী হয়েছে? এত দৌড়োদৌড়ি কীসের?

বিশুয়া বলল—জিপ স্টার্ট নিয়ে নিয়েছে!

ডহরু বলল—বড় পাথরটা আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে।

দুটোই জবর খবর। মেজকর্তা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—জিপ স্টার্ট নিয়েছে সেটা খুব ভাল খবর, কিন্তু তাতে আমি অবাক হচ্ছি না। যন্ত্রপাতি মাঝে মধ্যে এরকম অদ্ভুত আচরণ করে থাকে। তবে পাথরটা ফিরে এসে থাকলে—আচ্ছা, চল, দেখি গিয়ে ব্যাপারটা–

জলধর পণ্ডাও খবর পেয়ে আমাদের সঙ্গে এসে জুটল। আমরা দল বেঁধে চললাম পাথর দেখতে।

সত্যিই অবাক কাণ্ড। মাটির ওপরে যে ঘসটানো দাগ তৈরি করে সরে গিয়েছিল পাথরটা, আবার সেই দাগ বরাবর আগের জায়গায় ফিরে এসেছে!

বিপুলকায় জগদ্দল পাথর। কে এমন অনায়াসে খেলা করছে এটাকে নিয়ে?

মেজকর্তা বললেন কী জলধর, তুমি তো অভিজ্ঞ লোক, তোমার কী মনে হয়?

জলধর হাতজোড় করে বলল—আমার কিছু মনে হয় না কর্তা। কর্তা, চলুন আজই। আমরা এখান থেকে চলে যাই। ডহরু ঠাণ্ডা মাথার লোক, তারও অবস্থা দেখুন–

সত্যিই, বিপদে অবিচল ডহরু লোহারেরও মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

নির্মলবাবু বললেন—আজ বিকেলের মধ্যে তুমি রওনা হতে পারবে?

—নিশ্চয় পারব কর্তা। সিমডেগা যাবার সময় প্রায় সবকিছুই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। এ ক-টা তবু ভাঙতে আর কতটুকু সময় লাগবে?

তাই ঠিক হল শেষ পর্যন্ত। নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে আমাদের বেশিক্ষণ লাগল না। সব ঠিকঠাক করে আমরা খেতে বসলাম, খেয়ে উঠে পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে রওনা দেওয়া যাবে।

খেতে খেতে মেজকর্তা বললেন—এই পাহাড়-জঙ্গলের

মধ্যেই অন্য কোথাও আবার আমাদের জায়গা খুঁজে নিতে হবে কারখানার জন্য। অসুবিধার জন্য জায়গা বদলাচ্ছি। কাজ বন্ধ করছি না–

হঠাৎ তিনি থেমে গিয়ে বললেন সেই লোকটা কোথায় গেল? মৃত্যুঞ্জয়? সে খেতে বসল না আমাদের সঙ্গে?

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। সত্যিই তো! কোথায় গেল মৃত্যুঞ্জয়? তাকে তো দেখছি না।

অসিতবাবু বললেন-বোধহয় সে আলাদা খেতে বসেছে ডহরুদের সঙ্গে। যাবে আর কোথায়–

কিন্তু ডহরু তখনও খেতে বসেনি, জলধর আর বিশুয়াদের খেতে দিয়ে সে পরিবেশন করছিল। ডিমের ঝোল দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে আসতেই মেজকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ডহরু, মৃত্যুঞ্জয়কে খেতে দিয়েছ তো? ঐ যে, ঐ নতুন লোকটা–

—না বাবু। সে তত খেতে বসেনি। বনের মধ্যে বেড়াচ্ছে হয়তো। এরা উঠুক, সে ফিরে এলে আমি তার সঙ্গে বসবো।

, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় আর ফিরে এল না। সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল, অনেক দেরি হয়ে গেল আমাদের রওনা দিতে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে পাওয়া গেল না। যেমন রহস্যময় তার আবির্ভাব, তেমনই রহস্যময় তার অন্তর্ধান।

সিমডেগার দিকে যখন আমাদের লরি আর জীপ ছাড়ল, বনের ফাঁকে ফাঁকে তখন ঝিকিমিকি বেলা। যেন কার নির্দেশে আকাশ থেকে দুর্যোগের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গিয়ে বেশ ঝকঝকে নীল বেরিয়ে গিয়েছে। ভিজে মাটি এরই মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে অনেকখানি। যে কোন জায়গায় কিছুদিন বসবাস করলে, এমন কি সেখানে অনেক দুঃখজনক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে থাকলেও, সে জায়গাটা ছেড়ে চলে আসবার সময় মন কেমন করে। জিপ ছেড়ে দেওয়ার পর পেছন ফিরে শেষবার তাকিয়ে দেখলাম আমাদের কদিনের অস্থায়ী ঘর-গেরস্থালি।

জয় দেবতা পাসাং মারা! তুমি থাকো, আমরা চললাম।

দ্বাবিংশ

সেই আশ্চর্য পাখি

একটা ঘটনা চলাকালীন তার প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় না। সিমডেগা শহর আর রামরেখা পাহাড়ের জঙ্গলে থাকার সময়ে যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল তা যে কোনো মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে দেবার মত। কিন্তু তখন যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে চলেছিলাম, ঘটনার প্রবাহ আমার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, শেকড় উপড়ে ফেলে দিতে পারেনি। তবে একেবারে ভেতর থেকে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। এখন কোলকাতা ফিরে বুঝতে পারি কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হল! এই যে এই খাতায় এসব কথা লিখে রেখে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে এ বিবরণ পড়ে কেউ বিশ্বাস করবে কি? যা আমার কাজ আমি করি।

আমার এক বন্ধু বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করে, তার কাছে জঙ্গলের ভেতর তারানাথের আবির্ভাবের গল্পটা করেছিলাম—অবশ্য নাম না করে, বন্ধুটি গল্প শুনে একটু ভেবে বলল–তুমি নিশ্চিত যে, এই ভদ্রলোক তখন কোলকাতায় ছিলেন?

—আমি নিশ্চিত।

—কোনোমতেই তার পক্ষে বিহারের জঙ্গলে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না?

–ন্যায়শাস্ত্রের তকমতে হয়ত অসম্ভব বলা যাবে না। কিন্তু কার্যত সম্ভব ছিল না।

বন্ধুটি বলল—তাহলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তুমি ভুল দেখেছ। কারণ তোমার কথা বিশ্বাস করতে হলে বিজ্ঞানের একটা মূল সূত্রকে অগ্রাহ্য করতে হয়—

বললাম—কী সেটা?

—একই বস্তু একই সঙ্গে দু-জায়গায় থাকতে পারে না। থিওসফির ভাষায় একে বলে বাইলোকেশন। বিজ্ঞানে তা অসম্ভব।

—আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষকে কিন্তু একই সঙ্গে দু-জায়গায় দেখা গিয়েছে। অজস্র মানুষের সমানে যখন আশ্রমে বক্তৃতা করেছেন, একই সময়ে উপস্থিত রয়েছেন মৃত্যুশয্যাশায়ী গুরুভাইয়ের পাশে। এর বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে।

বন্ধু বলল—ভাই, আমি তোমার কথার সমর্থন বা বিরোধীতা কিছুই করছি না। আমি শুধু বলছি—বিজ্ঞান এ কথা মানবে না।

বললাম—বিজ্ঞানের যুক্তিই কি সব? তার বাইরে কি কিছুই নেই?

—থাকতে পারে, কিন্তু আমার জানা নেই। কারণ সেক্ষেত্রে এ আলোচনা যুক্তির সীমা পার হয়ে বিশ্বাসের রাজ্যে পৌঁছবে। আমি বিজ্ঞানী, বিশ্বাস নিয়ে কথা বলার অধিকার আমার নেই। মোট কথা, আমার মতে বাইলোকেশন সম্ভব

নয়।

তারানাথকেও এ বিষয়ে বেশ চেপে ধরেছিলাম। কিন্তু সে কায়দা করে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। কোলকাতায় ফিরে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—রামরেখার জঙ্গলে ঐ দুর্যোগের রাত্তিরে আপনি কী করে হাজির হলেন বলুন তো?

তারানাথ উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেছে বাইললাকেশন—মানে, একই বস্তু বা মানুষের একই সঙ্গে দু-জায়গায় অবস্থিতি সম্ভব নয়।

তারানাথ সিগারেটে টান দিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলল—ও।

তারানাথের সামান্য ব্যঙ্গমিশ্রিত উপেক্ষার জন্য রাগ করতে পারলাম না। কারণ বিজ্ঞানী বন্ধু যাই বলুক না কেন, ঘটনাটা তো আমি নিজের চোখে দেখেছি।

দেখলাম তারানাথ ভেতরের কথা ভাঙবে না। বললাম—আজ একটু গল্প হবে না? অনেকদিন পরে এলাম—

তারানাথ বলল—আজ এসো আমরা এমনি কথাবার্তা বলি। কিশোরী আসেনি। আজ গল্প জমবে না।

কথাটা ঠিক। কিশোরী না থাকলে আমারও একা গল্প শুনতে ভালো লাগবে না। বললাম–ঠিক আছে, তাই হোক।

একটু বাদে তারানাথের মেয়ে চারি ভেতর থেকে আমাদের জন্য চা নিয়ে এল। তার ভাল নাম বোধহয় চারুলতা বা চারুপ্রভা ওইরকম কিছু। অনেক ছোটবেলা থেকে তাকে দেখছি। আমাদের সামনে সে লজ্জা করে না। চা নামিয়ে রেখে সে হেসে বলল—ভাল আছেন কাকাবাবু? অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম–

—আমরা তো নিয়মিত তোর বাবার কাছে গল্প শুনতে আসি, তুই বিয়ে হয়ে অবধি আমাদের ভুলে গেলি—তার কি হবে?

দু-তিনবছর আগে চারির বিয়ে হয়েছে। জামাই মানুষটি

ভাল, সেদিক দিয়ে তারানাথ সুখী। সম্প্রতি চারির একটি খোকাও হয়েছে, তাকে কোলে করে একবার দেখিয়ে নিয়ে গেল চারি। ভারি ফুটফুটে খোকা।

এটা ওটা গল্প করে চা খেয়ে সেদিন বিদায় নিলাম।

পরের রবিবার দুপুরে খেয়ে ওঠবার একটু পরেই কিশোরী সেন এসে হাজির।

—চল হে, আজ আর দেরি নয়, তারানাথকে চেপে ধরি গিয়ে।

একটা জামা গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। বললাম—এটুকুর জন্য আর ট্রামে চেপে লাভ নেই, চল হেঁটেই মেরে দিই-

রামরেখা পাহাড়ের অভিজ্ঞতা ফিরে এসে কিশোরীকে বলেছি। এ ধরনের কাহিনী কারুকে বলার বিপদ হল বক্তার উপহাসের পাত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কিশোরী

এবং আমিও-প্রথম শ্রেণীর গল্পখোর। গল্প যদি ভাল হয়

তাহলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। সমস্ত গল্পটা তাকে বলতে দু-দিন সময় লেগেছিল। শোনার পর সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল—এ কাহিনী বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ যদিও তুমি ইদানিং তারানাথের কিছু গল্প লিখে পাঠকদের চমকাবার চেষ্টা করছ, তবুও এ রকম প্রথম শ্রেণীর গল্প বানাবার ক্ষমতা তোমার নেই। তাহলে তো একটা বড়মাপের লেখক হয়ে যেতে–

বাঁকা চোখে কিশোরীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে খুব সরল মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভারি ইয়ে তোক কিশোরী।

মাসের প্রথম। কাজেই এক প্যাকেট পাসিং শশা, তেলেভাজা এবং একঠোঙা জিলিপি নিয়ে তারানাথের বাড়ি হাজির হলাম। আমাদের দেখে সে খুশি হয়ে বলল-আরে, এস, এস, তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। তবে এত তাড়াতাড়ি আসবে বুঝতে পারিনি–

কিশোরী বলল—একটু অসময় হয়ে গেল, না? অনেকদিন গল্পের আসর তেমন করে জমেনি, আজ আর দেরি সইছিল না—

-না, অসময় আবার কী? এত সকাল সকাল তেলেভাজা পেলে কোথায়? বাঃ, এ যে দেখছি বেশ গরম রয়েছে! নাও, শুরু কর। ভেতরে চা বলে আসি–

মট্ লেনের মোড়ে উড়িয়া তেলেভাজাওয়ালা গরম ভাজার ওপরে ভারি সুগন্ধি একধরনের মশলা ছড়িয়ে দেয়। বোধহয় এই জন্যেই তার দোকানে অত ভিড়। লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কেনে। কড়াই থেকে নামতে না নামতে বিক্রি হয়ে যায়। তারনাথের,ভাষায় ভোলা থেকে নোলা। তেলেভাজা চিবোনো চলছে, এমন সময়ে বাড়ির ভেতরে যাবার দরজার কড়া নড়ে উঠল। তারানাথ হেসে বলল—ওই চা এসেছে।

সে উঠে গিয়ে পেতলের থালায় সাজানো তিনকাপ চা নিয়ে এল। আমাদের সামনে। খাটের ওপর নামিয়ে রেখে হেসে বলল–তোমাদের বউদিদি এখনও একেবারেই সেকেলে মানুষ। শেকল নেড়ে জানান দেয়।

বললাম—আপনি কষ্ট করলেন কেন? চারি নেই?

তারানাথের মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়ল। সন্তান বড়

মায়ার জিনিস। কন্যাকে বিবাহ দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হয় এ তো চিরকালের সত্য। ভালো ঘরে চারির বিয়ে হয়েছে। সে সুখে আছে। তার খোকাটিও হয়েছে নাদুন-নুদুস, বড় বড় ঝকঝকে চোখ। তারানাথের তো এসব নিয়ে সুখেই থাকা উচিৎ। কিন্তু প্রতিবারই মেয়ে চলে গেলে সে বেশ কয়েকদিন মুখ গম্ভীর করে থাকে। বিশেষ করে নাতিটি হবার পর তার এই দশা।

তারানাথ বলল—না, চারি গতকাল শ্বশুরবাড়ি ফিরে গিয়েছে। জামাই এসেছিল নিতে।

আমি বললাম—মন খারাপ করবেন না, এই তো সামনেই পূজো, পূজোয় তো আবার তারা আসবে। এখন বরং জমিয়ে একটা গল্প বলুন আমাদের। মনের ভার কেটে যাবে।

তারানাথ বলল-জয়তলা গ্রামের দেবদর্শন মুখুজ্যের গল্পটা তখন শেষ করা হয়নি। সেটাই আজ বরং বলি। তারপর আবার নতুন পর্বে নতুন গল্প শুরু করা যাবে। শেষ হবে না, বুঝেছ? গল্পের প্রবাহ বইছে জীবনে–

সিগারেট ধরিয়ে তারানাথ বলতে শুরু করল।

–জয়তলা গ্রাম থেকে তো বিদায় নিয়ে চলে এলাম। বড় ভাল লেগেছিল মুখুজ্জেবাড়ির আতিথ্য, স্বয়ং মুখুজ্জেমশাইকে। বেশ কিছুদিন তাদের কথা প্রায়ই মনে পড়ত। তারপরে যা হয়, একটামাত্র জিনিস নিয়ে মানুষের মন ব্যাপৃত থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে অন্য সাম্প্রতিক ঘটনা এসে সে জায়গা দখল করল। কত জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ালাম, কত অদ্ভুত চরিত্র দেখলাম। বছর কেটে গেল অনেক।

একদিন ঘরের ভেতর বসে কোষ্ঠী তৈরি করছি, সময়টা সকাল দশটা মত হবে, বাইরে থেকে কে যেন ডাকল– ঠাকুরমশাই।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। সে আবার কী! স্পষ্ট ডাকটা শুনলাম, কী রকম হল ব্যাপারটা।

অবাক হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বসতে না বসতেই আবার সেই ডাক–ঠাকুরমশাই।

এবার আর বাইরে বেরোলাম না। আমি বুঝতে পেরে গিয়েছি বেরিয়ে কাউকে দেখতে পাবো না। তার চেয়ে বড়

কথা, যে ডাকছে তার গলার স্বরটা আমার খুব চেনা, যদিও সে সময় কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না কার গলা সেটা।

সেদিন রাত্তিরে শুয়ে স্বপ্ন দেখলাম আমি যেন আবার জয়তলা গ্রামে গিয়েছি। রঘু ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করছে— আরে! ঠাকুরমশাই যে! আসুন, আসুন–

রঘুর চুল আর গোঁফ প্রায় সবই পেকে গিয়েছে। বাঁ গালে একটা লম্বা কাটা দাগ। এটা তো আগে দেখিনি।

আরো কী যেন সব বলতে লাগল রঘু। তার ঠোট নড়ছে, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে সে কী বলছে তা আমি বুঝতে পারছি না। সেকালের সাইলেন্ট ছবির মত। কথা বলতে বলতে রঘু একবার হাত তুলে চোখ মুছল। কী বলছে রঘু?

ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলাম। ঝিমঝিম করছে নিশুতি রাত। ততক্ষণে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পেরেছি সেদিন কার গলা আমি শুনেছিলাম।

দেবদর্শন মুখুজ্জে আমাকে ডাকছেন। জয়তলা থেকে চলে আসবার সময় ওঁকে বলে এসেছিলাম কোন কারণে

আমাকে দরকার হলে কী করে ডাকতে হবে। সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এত বছর পরে আমাকে কেন ডাকছেন দেবদর্শন? যে কারণেই ডাকুন না কেন, তার মধ্যে একটা অসহায় আকুতি ফুটে উঠেছিল।

পরের দিন একটা ঝুলিতে দু-চারটে জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে জয়তলায় রওনা হয়ে গেলাম। মাঝখানে অনেক সময় কেটেছে বটে, কিন্তু জয়তলা পৌঁছতে হলে এখনো শেষ চার মাইল মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হয়। সুন্দর রোদে ভরা এক বিকেলে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার ওপর বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। বেশ বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছে গেলাম দেবদর্শনের গ্রামে। প্রায় বারো-তেরো বছর পরে এখানে এলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন গিয়েছি এখান থেকে। ভালোও লাগছিল, আবার আশঙ্কাও হচ্ছিল। কে জানে কেন ডেকেছেন দেবদর্শন। যাক, এখুনি তো জানতে পারবো।

মুখুজ্জে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ বাড়ি আগেও পুরনোই ছিল বটে, কিন্তু তার ভেতর একটা আভিজাত্যভরা গৌরব ছিল। সে জিনিষটা যেন একদম চলে গিয়েছে। রোয়াকে ওঠবার সিঁড়িগুলো বহু জায়গায় ভাঙা।

যেখানে দেবদর্শনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, সেই দালানের পঙ্খের কাজের চটা উঠে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, দালানের কড়িবরগার ফাঁক থেকে পায়রার দল উধাও হয়েছে। ফলে দালানে একধরনের বিচিত্র নীরবতা বিরাজ করছে। পায়রার দল চলে যাওয়া কোন গৃহের পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়।

আর একটা কী যেন এ বাড়িতে ঘটেছে। খুব খারাপ কিছু।

দালানে ওঠবার সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি কাকে ডাকা যায়, দেবদর্শনের ছেলেদের নামও ঠিকঠাক মনে পড়ছে না। এমন সময় ভেতর বাড়ি থেকে রঘু বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেল।

–আরে! ঠাকুরমশাই যে! আসুন, আসুন—

একেবারে স্বপ্নের সেই সংলাপ হুবহু।

খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছে রঘু। চুল, ভুরু, গোঁফসব পাকা। কপালে আর মুখে জরার কুঞ্চন। তার বাঁ-গালে স্বপ্নে যেমন দেখেছি ঠিক তেমন একটা কাটা দাগ। আসলে ভবিষ্যতের

এই দৃশ্যটা স্বপ্নের মধ্যে আমার মনের পটে প্রতিফলিত হয়েছিল।

বললাম–কেমন আছ রঘু? এখানকার সব খবর ভালো তো?

রঘু বলল—না ঠাকুরমশাই, খবর ভালো না।

—কেন, কী হয়েছে?

রঘুর বিশ্বস্ত, প্রবীণ চোখে বেদনা ঘনিয়ে এল। সে বলল —কর্তার খুব অসুখ। আজ মাসখানেক বিছানা থেকেও উঠতে পারছেন না। গত বছরেও একবার শরীর অসুস্থ হয়েছিল। ব্রজমাধব কবিরাজের চিকিৎসায় সেরে উঠেছিলেন। কর্তা তো ইংরিজি ওষুধ খান না। কিন্তু এবারে অবস্থা খুবই কঠিন। সেবা করবার ভালো লোক না থাকলে রোগী সারে না—

—কেন, গিন্নীমা?

—তিনি নেই।

আমি মৃত্যু অনেক দেখেছি, অনেক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়েছি, শব সাধনা করেছি—মন আমার শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মুখুজ্জেগিন্নীর মৃত্যুসংবাদ শুনে। বুকের ভিতরটা কষ্টে মুচড়ে উঠল। মনে পড়ে গেল খেতে বসে সেই মুখ তুলে হঠাৎ গিন্নীমাকে দেখে ফেলা। সেই পদ্মপলাশের মত চোখ, চওড়া লালপাড় শাড়ি, মন্দিরের দরজার সামনে সেই লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। তিনি চলে গিয়েছেন, তাই বুঝি এ বাড়ির ঘরদোর, দেউড়িতে, সমস্ত পরিবেশে বিষণ্ণতার ছায়া।

বললাম—তুমি তো অনেক বুড়ো হয়ে গেছ রঘু। তোমার গালে ও কীসের কাটা দাগ?

রঘু বলল—তা তো বুড়ো হয়েছি ঠাকুরমশাই, বয়স তো কম হল না। ও দাগটা হল কী, দা দিয়ে একটা বাঁশ চেঁছে খুঁটি বানাচ্ছিলাম—হঠাৎ হাত ফসূকে বাঁশটা গালের ওপর এসে পড়েছিল। বেশি লাগেনি। কিন্তু দাগটা থেকে গেল। সে যাক ঠাকুরমশাই, আমার এখন ভগবানের কাছে শুধু এইটুকু কামনা কর্তা কষ্ট না পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান। পেছন পেছন আমিও যাই। আমার আগে গেলে চলবে না ঠাকুরমশাই। কর্তাকে দেখার আর কেউ নেই।

কথা বলতে বলতে রঘু হাত তুলে চোখের জল মুছল। ঠিক স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলাম, সেই দৃশ্য। আমি জয়তলা ছেড়ে চলে যাওয়ার অনেক পরে রঘুর গালের ওই কাটা দাগ হয়েছে, অথচ তা আমি স্বপ্নে স্পষ্ট দেখেছি। তার এই হাত তুলে চোখ মোছর ছোট্ট ঘটনাটা।

বললাম—চল রঘু, মুখুজ্জেমশাইয়ের কাছে যাই।

রঘু আমাকে নিয়ে চলল ভেতরবাড়িতে। সেই দেউড়ি, সেই বারান্দা—যেখানে বসে আমরা খেতাম। দালান পার হয়ে ভেতর বাড়ি। এর আগে জয়তলা থাকার সময়েও একেবারে অন্দর মহলে কখনও ঢুকিনি। চওড়া বারান্দা পার হয়ে বাঁদিকের একটা বড়ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অনুচ্চ গলায় রঘু ডাকল—কর্তা, কর্তা—

কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে ক্লান্ত, স্তিমিত গলায় কথা ভেসে এল—কে?

-কর্তা, ঠাকুরমশাই এসেছেন। সেই যে, সেই ঠাকুরমশাই-

–ভেতরে নিয়ে আয়।

ঘরে ঢুকলাম। প্রায় কোমর ছাড়িয়ে উঁচু বিশাল খাটে দেবদর্শন শুয়ে আছেন। কাছে এগিয়ে গিয়ে তার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে বললাম—কী মুখুজ্জে মশাই, চিনতে পারেন?

—পারি। কেমন আছেন আপনি?

—আমি তো ভাল আছি। আপনি আবার অসুখ বাধিয়ে বসলেন কেন? সেরে উঠুন। দেখি চটপট করে।

দেবদর্শনের চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। শরীর প্রায় অর্ধেক, বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। গায়ের রঙ মলিন হয়ে গিয়েছে। অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে তার। কিন্তু। একটি জিনিস মহাকাল হরণ করে নিতে পারেনি। সেটি হচ্ছে তার চোখ। বড় বড় উজ্জ্বল দুই চোখের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ করে তিনি বললেন—সবই তো বুঝতে পারছেন। ঠাকুরমশাই। এবার সংসার গুটিয়ে নেবার সময় হল। আর সংসারই বা কোথায়? এ. বাড়ির গিন্নীমা চলে গিয়েছেন রঘু বলে দিয়েছে বোধহয়। ছেলেরাও নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত। সেটাই স্বাভাবিক। বড় একা হয়ে গেছি ঠাকুরমশাই-একা থাকা বড়

কষ্টের।

একটা জিনিস দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। দেবদর্শনের খাড়া বাঁশির মত নাক ঈষৎ বেঁকে আছে। অসুস্থ শয্যাশায়ী রোগীর নাক বেঁকে গেলে সে আর বেশিদিন বাঁচে না। তাছাড়া ঘরে ঢুকেই আমি মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছি। তোমাদের তো আগেই বলেছি এটা আমি পাই, এবং আমার এই পূর্বধারণা আজ পর্যন্ত কখনও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়নি।

ক্ষীণস্বরে দেবদর্শন আবার বললেন—বসুন ঠাকুরমশাই, আমার এই বিছানার পাশেই বসুন। রঘু, তুই যা- ঠাকুরমশাইয়ের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা কর।

রঘু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—শুনতে পেয়েছেন তাহলে?

বললাম-তা পেয়েছি? নইলে এলাম কেন?

—আপনাকে কষ্ট দিলাম ঠাকুরমশাই, কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না। আপনাকে আর একবার না দেখে আমি শান্তিতে মরতে পারতাম না। কী যে সম্পর্ক আপনি তৈরি

করে দিয়ে গিয়েছিলেন! যেদিন নিশ্চিত করে বুঝতে পারলাম এবারে আর বিছানা ছেড়ে উঠবো না সেদিনই দুপুরবেলা শুয়ে শুয়েই মধুসুন্দরীদেবীর শ্লোক উচ্চারণ করে মনে মনে আপনাকে ডাকলাম।

—সঙ্গে সঙ্গেই আমি আপনার ডাক শুনতে পেয়েছি। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু সেদিন রাত্তিরেই এই বাড়ি আর রঘুকে স্বপ্নে দেখলাম। সময় নষ্ট করিনি মুখুজ্জে মশাই, আমি বুঝতে পেরেছিলাম হাতে বেশি সময় নেই। তাই তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়েছি।

দেবদর্শন রোগা, শীর্ণ মুখে ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন। তার চোখের দৃষ্টির মত হাসিটুকু এখনও অম্লান আছে। তিনি বললেন—খুব ভালো করেছেন। সময় যে আর নেই সে আমিও বুঝতে পেরেছি। আমি কবে যাবো ঠাকুরমশাই?

বললাম—এখনো কিছু দেরি আছে, সম্ভবত সামনের মাসের শুক্লপক্ষের কোনো দিন। অন্য কেউ হলে বলতাম না, কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী শোনবার যোগ্যতা আপনি লাভ করেছেন। মনকে মুক্ত করে দিন, নিয়ত ইষ্টচিন্তা করুন।

দেবদর্শন বললেন—মন আমার মুক্তই আছে। সেই কবে হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, আবার অগ্নিশুদ্ধি করে নিজেকে ফিরিয়ে দেব ঈশ্বরের হাতে। এপারের যা কিছু সঞ্চয় তা এপারেই থেকে যাবে। বরং এখন তো ওপারটাই বেশি টানে। না, ধর্মকর্ম বা ওইরকম অর্থে বলছি না। মনে হয় এবাড়ির সেই মানুষটি অপেক্ষা। করে রয়েছেন ওপারে—আমার জন্য। তার কাছেই তো যাচ্ছি, তাহলে আর ভয় কী?

একটু থেমে আবার বললেন—অনেকদিন তাকে দেখিনি, কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই তিনি এসে সামনে দাঁড়ান। যাক, একটু জল খেয়ে আবার আসুন, আপনাকে একটা কথা বলবার আছে।

এবার আর অতিথিশালা নয়, পুরনো কাছারিবাড়ির একখানা ঘরে জায়গা পেলাম। রঘু বুড়ো হয়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার কর্মদক্ষতা একটুও কমেনি। পশমের আসন পেতে বসিয়ে মর্তমান কলা আর একথাবা সর দিয়ে সে আমাকে পরিতোষ করে জলখাবার খাওয়ালো। সবই ঠিক, কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছিল–কঃগতোত্তরকোশলা?

আবার দেবদর্শনের ঘরে এসে বসলাম। ভদ্রলোক খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন, বেশি ভূমিকা না করে বললেন– ঠাকুরমশাই, সে আবার এসেছিল—

বললাম—কে?

—সেই যে, সে। অমরজীবন। বলে গিয়েছিল আবার দেখা হবে। দেখা হল। এক আশ্চর্য জিনিস সে আমাকে দেখাল। সে কথা বলবার জন্যই আপনাকে ডেকেছি। আর কেউ তো ঠিক বুঝবে না, সময় থাকতে বলে যাই–

—আপনার কষ্ট হবে না? এত কথা বলছেন।

—কিছু হবে না। আপনি আসায় আমি নতুন শক্তি পেয়েছি মনে। শুনুন, গত শুক্রবারের আগের শুক্রবার, মানে দিনদশেক আগে হঠাৎ রঘু এসে উত্তেজিত গলায়। বলল— কর্তা, সেই পাগলমত লোকটাকে মনে আছে? সে কী যেন ছড়া বলে লটারির। টিকিটের নম্বরের হদিশ দিয়েছিল? সে এসেছে–

প্রথমটা খেয়াল করতে পারিনি, মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ

জীব। এই কয়েকবছরের ব্যবধান ভুলিয়ে দিয়েছিল তার কথা। তারপর একসঙ্গে সব মনে পড়ে গেল।

বললাম—কোথায় সে?

–দালানে বসিয়ে রেখে এসেছি কর্তা। ডাকব?

—ডাক। নিয়ে আয় এখানে—

যেতে গিয়ে রঘু একটা ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে গেল। বললাম কীরে, কিছু বলবি?

—হ্যাঁ কর্তা। একটা ব্যাপার একটু কেমন যেন লাগছে।

—কী ব্যাপার?

—এই লোকটা এর আগে যে এসেছিল, সে কতদিন আগেকার কথা?

একটু ভেবে বললাম—তা, বছর বারো-চোদ্দ হবে। কেন রে?

–কর্তা, এই সময়ের ভেতর আমরা তো সব বুড়ো হয়ে গেলাম, চুল-দাড়ি পেকে গেল, চামড়া কুঁচকে গেল। এই লোকটার চেহারা কিন্তু একদম বদলায় নি, একেবারে সেইরকম আছে। এ আবার কী ব্যাপার কর্তা?

বললাম—তাই? আচ্ছা, আগে নিয়ে তো আয় দেখি।

একটু পরেই রঘুর পেছন পেছন অমরজীবন এসে ঘরে ঢুকল।

আশ্চর্য! রঘু একটুও বাড়িয়ে বলেনি, এ তো অবিকল সেই বারো বছর আগে দেখা মানুষটা। বরং যেন আরো তরুণ আর সতেজ হয়েছে তার চেহারা। এ কী করে হয়!

সে এগিয়ে এসে খাটের ধারে দাঁড়িয়ে বলল—মুখুজ্জেমশাই বলেছিলাম আসব? এলাম।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সত্যিই একটুও চেহারা বদলায়নি তার। এমন কী করে হতে পারে আমি ভেবে পেলাম না।

সে বলল—বসি একটু আপনার পাশে?

আগের বার কী সম্বোধন করেছিলাম তা ঠিকঠাক মনে পড়ল না।

এখন আমার বয়েস অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু কোন অলৌকিক উপায়ে অমরজীবন আটকে আছে চল্লিশের কোটাতেই। কাজেই কোন সঙ্কোচ না করে বললাম—বোস। তারপর এতদিন পরে হঠাৎ?

সে বলল–আসবার সময় হয়েছিল তাই এলাম! আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। কিংবা এইভাবেও বলা যেতে পারে—আপনারও দরকার আছে আমাকে। কিন্তু সে তো আজকে হবে না, কাল সকালে হবে।

কিছুই বুঝতে পারলাম না, তবু বললাম—কেন? আজ হবে না কেন?

—আজ রাত্তিরে আমি স্বপ্ন দেখব, কালকের দরকারটা একটু গুছিয়ে নেব কিনা। আপনার দরকারটা কী তা ভাল

করে জেনে নিতে হবে।

গতবার যখন এসেছিল অমরজীবন, তখনও এইরকম নানা পাগলাটে কথা বলেছিল। কিন্তু তার কথা অনুযায়ী আমি তো লটারির প্রাইজ পেয়েছিলাম, তাই না? তার কথাবার্তা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বললাম—বেশ তো, থাকো।

–আমাকে কেবল রাত্তিরে শোবার জন্য একটু জায়গা দেবেন। খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না, স্বপ্ন দেখার রাত্তিরে আমি কিছু খাই না।

যাই হোক, পরের দিন সকালে অমরজীবন আমার বিছানার পাশে এসে বসল। আমি কিছু বলবার আগেই বলল আপনার কী চাই সেটা স্বপ্নে জানতে পারলাম!

বললাম—কী সেটা?

—এমন কেউ আছে যাকে আপনার খুব দেখতে ইচ্ছা করে? অনেকদিন দেখেনি নি এমন কেউ?

আজ কয়েকদিন হল বাবাকে খুব মনে পড়ছে। সেই কবে মারা গিয়েছেন বাবা। আমার কৈশোরে। কী ভালই না বাসতেন আমাকে! তাঁর চরিত্রে উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি ছিল না, শুধু কাছে গিয়ে বসলে বুকের উষ্ণতাটুকু টের পেতাম। মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে বলেছিলেন পশ্চিমের মাঠে কোথায় নাকি তেঁতুলগাছের ডালে কী এক অদ্ভুত পাখি বাসা করেছে। সবাই দেখতে যাচ্ছে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারছে না কী পাখি। আমাকে দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। যাওয়া হয়নি। তার আগেই বাবা অসুখে পড়লেন এবং সে অসুখ থেকে আর উঠলেন না। বয়স হলে মানুষের কেবলই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে কথা আমি অমরজীবনকে বললাম না। দেখি ও কী করে।

অমরজীবন বলল—মুখুজ্জেমশাই, আমি জানি। আচ্ছা, আপনি একবার একটু চোখ বুজুন তো। এক থেকে পাঁচ গুনতে যতক্ষণ সময় লাগে, তারপর আবার তাকান। বন্ধ করুন চোখ।

আমি চোখ বন্ধ করে মনে মনে এক থেকে ধীরে ধীরে পাঁচ অবধি গুনলাম। তারপর তাকালাম।

অমরজীবন যেখানে বসেছিল, বিছানার পাশে সেই জায়গাটায় আমার বাবা বসে আছেন!

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল আমার হৃদপিণ্ড বুঝি থেমে যাবে। মায়া নয়। মতিভ্রম নয়। সত্যি সত্যিই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া বাবা। এমনকি তার কপালের বাঁদিকের রগটাও টিটি করতে দেখলাম, যেমনটি জীবদ্দশায় বাবার করত।

বাবা মৃদু হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি আকুল হয়ে বাবার হাত জড়িয়ে ধরলাম। একেবারে বাস্তব রক্তমাংসের দেহ, কোন ফাঁকি নেই। আঃ, কতদিন পরে বাবাকে দেখছি! আমার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। বাবা বললেন—দেবু, আমি তোকে সেই যেখানে যাবার কথা ছিল, সেইখানে বেড়াতে নিয়ে যাবো বলে এসেছি। চল, আমার সঙ্গে যাবি–

আমি বললাম—পাখি দেখতে বাবা? পশ্চিমের মাঠে?

—না, অন্য জায়গায়। আমার সঙ্গে যেতে ভয় করবে না

তো?

আমি কেঁদে ফেলে বললাম—আমি যে আর চলতে পারি না বাবা, বিছানা থেকে উঠতে পারি না-

—তোকে উঠতেও হবে না। হাঁটতেও হবে না। আমি তোকে কোলে করে নিয়ে যাবো। তুই তার জন্য তৈরি হ—

তারপর আবার মিষ্টি হেসে বললেন—দেবু, সেই অদ্ভুত পাখিটা তোর তাহলে এখনো দেখতে ইচ্ছে করে?

আমি যেন আবার শিশু হয়ে গিয়েছি। বললাম—করে।

বাবা বললেন—বেশ, দেখাচ্ছি তোকে। জানালার দিকে তাকা।

বাবার হাত ধরে থেকেই ডানদিকের জানলাটার দিকে তাকালাম। ডানা ঝাপটানোর শব্দ করে জানালার ঠিক বাইরে বাতাবি লেবু গাছের ডালে আশ্চর্য এক পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে বসল। কী অপূর্ব রং-এর বাহার তার! কেমন চুনির মত লাল চোখ! অমন পাখি কেউ কখনো দেখেনি ঠাকুরমশাই,

স্বর্গের এই বিচিত্র পাখি বাবাই তো আমায় দেখালেন। আমি খুশি হয়ে বাবার দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম।

বাবা নেই। আমি অমরজীবনের হাত ধরে রয়েছি।

এই আমার কাহিনী ঠাকুরমশাই। এই কথা বলবার জন্যই আমি আপনাকে ডাক পাঠিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছি আমার যাবার দিন কাছে এসে গিয়েছে। কিন্তু বাবা যখন নিয়ে যাবেন বলেছেন তখন আর ভয় কি?

আমি চুপ করে বসে রইলাম?

দেবদর্শন বললেন—আপনাকে আমি পুরো চিনতে পারিনি ঠাকুরমশাই। যেমন অমরজীবনকেও না। কিন্তু এই ঘটনা আপনাকে না বলে গেলে আমি শান্তি পেতাম না। অমরজীবন কে ঠাকুরমশাই? আপনিই বা কে?

বললাম—আমি খুব সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। সাধনা করে কিছু শক্তি পেয়েছিলাম, এইমাত্র। কিন্তু অমরজীবনের প্রকৃত পরিচয় আমিও জানি না। না জানাই বোধহয় ভালো। আমরা বুঝতে পারবো না, কেবলমাত্র বিভ্রান্ত হবো। যদি

পরজন্ম বলে কিছু থাকে। তবে হয়ত আবার সঙ্গে দেখা হবে।

দেবদর্শন চুপ করে আছেন। জানালার বাইরে বাতাবিলেবুর গাছটা, যার ডালে সেই আশ্চর্য পাখি এসে বসেছিল। এই বাড়ি জীবনদেবতার আশীর্বাদপূত, বোধহয় তাই সে পাখি কেবল এখানেই আসে। লক্ষ্মীর বাস ছিল এ বাড়িতে, এর প্রতিটি অলিন্দে দেবীর অধিষ্ঠান। মৃত্যু আসছে, কিন্তু সে আসছে শিউলিঝরা স্নিগ্ধতায়।

বাকি দিনটা ঘুরে বেড়ালাম জয়তলা গ্রামের পথে পথে। আর হয়ত কোনদিন এখানে। আসা হবে না—বিদায় চাইলাম গ্রামের মাটির কাছে। রাত্তিরবেলা বারান্দায় খেতে বসলাম। একা, দেবদর্শন চলতে পারেন না বলে আজকাল তার খাবার ঘরেই দেওয়া হয়। থালায় তুলাইপাঞ্জি চালের ভাত, ছোট্ট বাটিতে বাড়ির তৈরি গাওয়া ঘি, মৃগেল মাছের ঝোল। আজ আর গিন্নিমা দাঁড়িয়ে তদারক করছেন না, বুড়ো রঘু যত্ন করে খাওয়াচ্ছে। শেষ পাতে ঘন দুধ আর সুপক মর্তমান কলা।

জয়তলা গ্রাম সুখে থাকো। সুখে থাকো বাঙালী।

পরের দিন খুব ভোরে জয়তলা ছেড়ে চলে এলাম। রঘু

গ্রামের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বলল–কর্তার খাওয়া ইদানিং একেবারে কমে গিয়েছিল। আপনি এসেছিলেন বলে ওঁর মন খুব খুশি, কাল দুবেলাই পেট ভরে খেয়েছেন।

আলপথে হেঁটে অর্ধেক মাঠ পার হয়ে একবার পেছন ফিরে দেখি তখনও বিশ্বস্ত, বৃদ্ধ মানুষটি তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

* * *

গল্প শেষ করে তারানাথ বলল—এ কাহিনীর এখানেই ইতি।

কিশোরী বলল—যাঃ, গল্প শেষ হয়ে গেল।

তারানাথ হেসে বলল—না, এই গল্পটা শেষ হয়ে গেল। আমি রইলাম, পৃথিবী রইল তার বৈচিত্র্যে নিয়ে, অমরজীবন রইল। সবচেয়ে বড় কথা—তোমরা রইলে আমাকে দিয়ে। গল্প বলিয়ে নেবার জন্য। অবিলম্বে আবার শুরু করব।

একটু চুপ করে থেকে আমাদের দিকে তার উজ্জ্বল দুই

চোখ তুলে বলল—তারপর একসময় তো থামতেই হবে। যখন আমার জানালায় এসে বসবে সেই আশ্চর্য পাখি।

–সমাপ্ত–

সমাপ্ত

বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই
কিনবেন
অথবা
অন্যকে উপহার দিবেন

Contributor

Ahmed Nazir